র বি - র শ্মি

দ্বিতীয় খণ্ড

পশ্চিম ভাগে

রবি-রশ্মি

পশ্চিম ভাগে

[ক্ষণিকা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ.
কর্তৃক বিশ্লেষিত

স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ.
কর্তৃক সম্পাদিত

এম

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
ও. সি. গাঙ্গুলী

দ্বিতীয় খণ্ড : মূল্য ৭৲

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ পাল
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৪, বাসবারী রোড : কলিকাতা-১১

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

রবি-রশ্মি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার ইহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিগত ১লা পৌষ তিনি সাহিত্য-সেবার মধ্যেই নশ্বর জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, "সকলের চেষ্টা ও সাহায্য সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরে মাত্র অর্ধেক বই ছাপা হইল। বাকী অর্ধেক আমার জীবদ্দশায় ছাপা হইবে কি না বিধাতাই জানেন।" কে জানিত যে তাঁহার সেই কথা এমন নির্মম ভাবে সত্য হইবে?

চারুচন্দ্রের ও আমার সাহিত্য-জীবন প্রায় সমকালেই আরম্ভ হইয়াছিল। আজ তাঁহার পুত্রের অনুরোধে এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি অত্যন্ত দুঃখের সহিত। আমার বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। বন্ধুবরের অক্লান্ত সাধনার ফল তাঁহার অবর্তমানে শ্রদ্ধার সহিত সাহিত্যামোদীর করে তুলিয়া দিবার উপলক্ষ্যে দুই-একটি কথা মাত্র বলিব।

রবি-রশ্মি Browning Encyclopaedia শ্রেণীর গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৬০-খানি কাব্য ও গীতিনাট্য এবং ৩৬০০-টি কবিতার ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। কবির প্রায় সকল বিখ্যাত কাব্য ও কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রবি-রশ্মিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বঙ্গসাহিত্যের এক মূল্যবান্ সম্পদ্। এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবি তাঁহার প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে ভালরূপে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্য ও ভাবধারার উৎস অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাঁহার কাব্য ও কবিতার পারম্পর্য—তাঁহার চিত্ত-বিকাশের স্তরগুলি বুঝিবার পক্ষে রবি-রশ্মি অনেক সহায়তা করিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। চারুচন্দ্র যে ভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-কাব্যের আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ কাব্যানুরাগের ফল। তিনি একাধারে কবি, রসজ্ঞ ও সমালোচক ছিলেন। কাজেই রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভা বুঝিবার এবং বুঝাইবার যোগ্যতা তাঁহার যেমন ছিল তেমন আর অধিক লোকের নাই। তিনি যে প্রণালীতে এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা অন্য অনেকের পক্ষে পথ-প্রদর্শক হইবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় তাঁহার আরও সুযোগ হইয়াছিল কবির নিকট হইতে অনেক বিষয় যাচাই করিয়া

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
ও. সি. গাঙ্গুলী

দ্বিতীয় খণ্ড : মূল্য ৭৲

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ পাল
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৪, বাগমারী রোড : কলিকাতা-১১

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

রবি-রশ্মি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার ইহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিগত ১লা পৌষ তিনি সাহিত্য-সেবার মধ্যেই নশ্বর জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, "সকলের চেষ্টা ও সাহায্য সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরে মাত্র অর্ধেক বই ছাপা হইল। বাকী অর্ধেক আমার জীবদ্দশায় ছাপা হইবে কি না বিধাতাই জানেন।" কে জানিত যে তাঁহার সেই কথা এমন নির্মম ভাবে সত্য হইবে?

চারুচন্দ্রের ও আমার সাহিত্য-জীবন প্রায় সমকালেই আরম্ভ হইয়াছিল। আজ তাঁহার পুত্রের অনুরোধে এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি অত্যন্ত দুঃখের সহিত। আমার বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। বন্ধুবরের অক্লান্ত সাধনার ফল তাঁহার অবর্তমানে শ্রদ্ধার সহিত সাহিত্যামোদীর করে তুলিয়া দিবার উপলক্ষ্যে দুই-একটি কথা মাত্র বলিব।

রবি-রশ্মি Browning Encyclopaedia শ্রেণীর গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৬০-খানি কাব্য ও গীতিনাট্য এবং ৩৬০-টি কবিতার ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। কবির প্রায় সকল বিখ্যাত কাব্য ও কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রবি-রশ্মিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বঙ্গসাহিত্যের এক মূল্যবান্ সম্পদ্। এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবি তাঁহার প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে ভালরূপে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্য ও ভাবধারার উৎস অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাঁহার কাব্য ও কবিতার পারম্পর্য—তাঁহার চিত্ত-বিকাশের স্তরগুলি বুঝিবার পক্ষে রবি-রশ্মি অনেক সহায়তা করিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। চারুচন্দ্র যে ভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-কাব্যের আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ কাব্যানুরাগের ফল। তিনি একাধারে কবি, রসজ্ঞ ও সমালোচক ছিলেন। কাজেই রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভা বুঝিবার এবং বুঝাইবার যোগ্যতা তাঁহার যেমন ছিল তেমন আর অধিক লোকের নাই। তিনি যে প্রণালীতে এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা অন্য অনেকের পক্ষে পথ-প্রদর্শক হইবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় তাঁহার আরও সুযোগ হইয়াছিল কবির নিকট হইতে অনেক বিষয় যাচাই করিয়া

লইবার। কাজেই রবি-রশ্মিকে নানা দিক্‌ হইতে প্রামাণিক মনে করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না ; কারণ আমরা জানি যে গ্রন্থকার যে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন অপরের পক্ষে তাহা সুলভ নহে। চারুচন্দ্র বিশ্বস্ত বন্ধু, সহযোগী সাহিত্যসেবী এবং অনুরাগী ভক্ত-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ব্যতীতও তিনি বহু সাহিত্যিকের রচনা হইতে তাঁহার গ্রন্থের মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন :—

"রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যাখ্যা বহু লোকে বহু বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সকলের উক্তির সার-সংগ্রহ করিয়াছি এবং অনেক স্থলে কবির নিজের অভিমতের দ্বারা যাচাই করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত আমার বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।"

কোনও কোনও কবিতার ব্যাখ্যায় তাঁহার সহিত মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে। এমন কি কবির সহিতও তাঁহার কবিতার ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু ইহা অসংকোচে বলিতে পারি যে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার অনুশীলনে চারুচন্দ্র যে নিরলস সাধনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে অচিরকালে মুছিয়া যাইবে না।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে গ্রন্থকার রবি-রশ্মির পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন। পরিশিষ্টের আলোচনাগুলি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্‌ কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ. কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্পাদকের নিবেদন

রবি-রশ্মি দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রায় এক বৎসরকাল পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা যেমন উহার পূর্ববর্তী সংস্করণ সকলের মত কেবল পুনর্মুদ্রণ হয় নাই, তেমনি এই খণ্ডটিও ইহার পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির মত কেবল পুনর্মুদ্রণ নহে। ইহাতে কবির বলাকা ও পরিশেষ কাব্যের সম্বন্ধে কিছু নূতন আলোচনা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং বলাকা, পলাতকা ও পরিশেষ কাব্যের নিম্নলিখিত কবিতাগুলির আলোচনা সংযোজনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বলাকা—২১ নম্বর : ৪৪ নম্বর (যৌবন)।

পলাতকা—মালা।

পরিশেষ—প্রণাম। বিচিত্রা। জন্মদিন। পান্থ। আছি। বালক। বর্ষশেষ। শ্রীবিজয়লক্ষ্মী।

পরিশিষ্টে 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' উপন্যাস সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং 'মিসটিসিজম্' সম্বন্ধীয় আলোচনা এই সংস্করণে নূতন সংযোজনা।

আশা করি ইহাতে গ্রন্থখানির মূল্য ও উপযোগিতা বর্ধিত হইবে।

২৫শে বৈশাখ
১৩৬০

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি-রশ্মি :: বর্ণচ্ছত্র

প্রার্থনা

কবি মানব-জীবনকে ভালবাসেন। তাই তিনি তাহার বিকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন। আচার সংস্কার প্রথা রীতি যেখানে জীবনের স্বচ্ছন্দ মহিমাকে খর্ব করে সেখানে কবি তাহাকে নির্মম আঘাত করেন। এই কবিতায় কবি যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সর্বসংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ আত্মার প্রার্থনা, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সত্যসন্ধ বিগতভীঃ সমদর্শী ভারতবর্ষের বাণীমূর্তির প্রার্থনা।

স্মরণ

১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ কবিবরের পত্নীবিয়োগ হয়। সেই শোকে কবি যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি স্মরণ নামে মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে।

এই কবিতাগুলি কবির ব্যক্তিগত ক্ষতির ক্ষতমুখ হইতে নির্গলিত হৃদয়-শোণিতে অভিষিক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে একটি সার্বজনীন বিরহব্যথা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি কবিজীবনে, অথবা কি ধর্মজীবনে, কোথাও ভাবাবেগে বিহ্বল হওয়াকে প্রশ্রয় দেন নাই, উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসকে তিনি সর্বক্ষেত্রে নিন্দা করিয়াছেন। এই-জন্য এই বিষম ক্ষতির কবিতাগুলির মধ্যেও একটি অসামান্য সংযম ও আত্মদমন আছে। এখানে কবির শোক হইয়াছে মিতবাক্।

মৃত্যুমাধুরী

এই কবিতাটি ১৩০৯ সালের মাঘ মাসে বঙ্গদর্শনে ৫৬৭ পৃষ্ঠায় সার্থকতা নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্মরণ সম্বন্ধীয় অনেক কবিতা ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কখনও ভয়ংকর বা শোকাবহ মনে করেন নাই। মৃত্যুসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি তাহা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

জগৎ-রচনাকে যদি কাব্যহিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেইখানেই অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধি-মন্দিরের মতো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুরূহ হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে, এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যে দিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ধর্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড় অন্বেষণে

উড়িয়া চলিয়াছে।—একে যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বর্তমান, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল,—আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত তবে তাহার একেশ্বর দৌরাত্ম্যের আর শেষ থাকিত না—তবে তাহার উপরে আর আপীল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দেশ করিয়া দিত ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে? অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত?

মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোন মর্যাদাই থাকিত না। এখন জগৎশুদ্ধ লোকে যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত।

জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেই জন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব সেইখানে। যে-সব জিনিস আমাদের এত প্রিয় যে কখনও তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই, সুবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিষ্ফল হয়, সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, আমাদের অমরতা-অসীমতাকে অপ্রমাণ করে—জগতের যে-সীমায় মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার, আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনার কোন প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্মশানবাসী—আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুনিকেতনে।

জগতের নশ্বরতাই জগৎকে সুন্দর করিয়াছে; এই জন্য মানুষের দেবলোকেও মৃত্যুর কল্পনা।

—পঞ্চভূত, অপূর্ব রামায়ণ।

কবি এই কবিতায় বলিতেছেন যে বিচ্ছেদে মানুষের গুণের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়। প্রিয়া-বিরহে প্রিয়ার মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া কবি মনে করিতেছেন—মৃত্যু তাঁহার নিকটে অমৃতরস বহন করিয়া আনিয়াছে। কবির গৃহলক্ষ্মী এখন বিশ্ব-লক্ষ্মীতে পরিণত হইয়াছেন।

কবি বলিতেছেন যে তাঁহার প্রিয়া মরণের সিংহদ্বার দিয়া বিজয়িনী-রূপে তাঁহার জীবনে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছেন। এই মৃত্যু-ঘটনাকে সেইজন্য কবি দুঃখজনক বোধ করিতেছেন না। কবির প্রেয়সী জন্ম-মরণের মাঝে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, যেমন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ তাঁহার প্রিয়াকে দেখিয়াছিলেন—A traveller between life and death।

কবি স্মরণের মধ্যে প্রেমকে যেমন জীবনের অতিথি-রূপে দেখিয়াছেন, তেমনি মরণকেও অন্য অতিথি-রূপে দেখিয়াছেন। কবি তাঁহার প্রিয়াকে

তাঁহার জীবনের মধ্যে জীবিত দেখিতেছেন। এই ভাবটি বলাকার 'ছবি' কবিতায় স্পষ্ট হইয়াছে।

এই কবিতাগুলির সঙ্গে কবি শেলীর Adonais তুলনীয়; এবং কবিরই নিজের লেখা অন্যান্য মৃত্যু-সম্বন্ধীয় কবিতা তুলনীয়।

চিঠি

১৩০৯ সালে মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে ৫৬৮ পৃষ্ঠায় 'সঞ্চয়' নামে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

কবি বলিতেছেন যে একটি চিঠি দেখিয়া অতীত কালের কত কথাই মনে পড়ে; ঐ চিঠিটুকু অতীতকালের স্মৃতির ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়ায়। ঐ চিঠির নিজস্ব কোনো মূল্য নাই, কেবল উহার মধ্যে আমার অতীত কাল প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই উহার এত সমাদর।

শিশু

কবিবরের পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রকে ও পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রাণীকে লইয়া আলমোড়া পাহাড়ে গিয়াছিলেন। সেখানে মাতৃহীন পুত্রকন্যাকে ও নিজেকেও প্রফুল্ল রাখিবার জন্য, নিজেকে শৈশবের অশোক আনন্দের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য, শিশুতোষ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই শিশুতোষ কবিতাগুলি কবির নূতন সৃষ্টি নয়, তিনি কড়ি ও কোমল এবং সোনার তরী পুস্তকের মধ্যে যে-সব শিশু-সম্বন্ধীয় কবিতা লিখিয়াছিলেন, এগুলি যেন তাহাদেরই অনুবৃত্তি ও প্রপূর্তি। কবি যখনই কোনো দুঃখ অনুভব করেন, তখনই তিনি সেই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য শৈশবের সর্বভোলা আনন্দের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহেন। ইহার অল্পদিন পরে কবির এই কন্যার ও পুত্রের মৃত্যু হয়।

শিশুর কবিতাগুলি কবি যেমন যেমন লিখিতেছিলেন অমনি সেগুলিকে মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়া দিতেছিলেন, মোহিতবাবু তখন কবির কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই কবিতাগুলি সেই গ্রন্থাবলীর মধ্যেই ১৩১০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

শিশুর কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি শিশুর মনের উপভোগ্য, নানা রঙ্গভরা কল্পনাপ্রবণ শিশু-হৃদয়ের সুখদুঃখের স্মৃতিতে পূর্ণ। এগুলি শিশু-জীবনের আনন্দ-লোককে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। আর কতকগুলি কবির দার্শনিকতায় ভরা; সেগুলি শিশু কেন, শিশুর অনেক ঠাকুরদাদার মনের পক্ষেও গুরুপাক। কিন্তু সব কবিতাই যে সুস্বাদু ও সরস তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই-সব কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পাঠক ও শ্রোতা কবিতার ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া যান। যেখানে কবি কথা দিয়া ছবির পর ছবি আঁকিয়া বা রঙ্গভঙ্গ করিয়া চলিয়াছেন সেখানে শিশুরা অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু যেখানে কবি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করিয়াছেন সেখানে শিশুর মন কোনো সাড়া দেয় না, শিশুর পিতামাতার মনও যে সব সময়ে সাড়া দিতে পারে তাহা মনে হয় না। কবি এক দিকে যেমন শিশুচিত্তের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি শিশুর পিতামাতার

মনস্তত্ত্বও ধরিয়া দেখাইয়াছেন। এই ক্ষমতায় তিনি বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেশবিদেশের কোনো কবি এমন নিপুণতার সহিত শিশুর মনস্তত্ত্ব চিত্রিত করিতে পারেন নাই। অন্য কবিরা বয়স্ক লোকে শিশুকে কেমন চোখে দেখে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছেন শিশুর চোখে বিশ্ব-সংসার কেমন লাগে। যোগী কবির কাছে শিশু বিরাট্ অনন্ত-রহস্যময় বিধাতারই যেন এক একটি রহস্য-কণা। বৈষ্ণব সাধকদের মতো আমাদের কবিও বাৎসল্য রসের ভিতর জগৎপিতার সহিত মানবের সম্বন্ধের মধুরত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। এইসব কারণে শিশু-কাব্য রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

দ্রষ্টব্য—শিশু-সাহিত্য—শান্তা দেবী, উদয়ন, ভাদ্র ১৩৪০। শিশু ও রবীন্দ্রনাথ—সুধাময়ী দেবী, শান্তিনিকেতন-পত্রিকা। আর্নেষ্ট্ রীস্ প্রণীত রবীন্দ্রনাথ।

শিশুলীলা

মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে 'শিশু'-বিভাগের প্রবেশক-কবিতা।

কবি রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া সম্বন্ধে যে-কথা লিখিয়াছিলেন সে-কথার দ্বারাই তাঁহার শিশু-সম্পর্কীয় কবিতাগুলিকে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া এখানে কিছু উদ্ধার করিতেছি।

বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎ সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্য-কারণ-সূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস-জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না—কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাববশতই বাল্য-স্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মুহূর্তের মধ্যেই মুঠা মুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূম করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ী ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক সেখানে কর্তাকেও অবিলম্বে কাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সম্প্রতি মাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত

হয় নাই, এই জন্ত সে ক্ষুদ্র শক্তি-অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামতো রচনা করিয়া মর্ত্যলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে।

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে; কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন স্থকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই চির নবীনত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।

—ছেলেভুলানো ছড়া

শিশু চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন। এইজন্য সে পরিবর্তনকে অর্থাৎ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে।

তুলনীয়—

John Earle তাঁহার Microcosmographie পুস্তকে 'The Eternal Child' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"....We laugh at his foolish sports, but his game is our earnest: and his drums, rattles, and hobby-horses are but the emblems and mockings of men's business."

এই সঙ্গে তুলনীয়—

"Hence, in a season of calm weather,
Though inland far we be,
Our souls have sight of that immortal sea
Which brought us hither;
Can in a moment travel thither,—
And see the children sport upon the shore,
And hear the mighty waters rolling evermore."
—Wordsworth, *Ode on Immortality.*

[ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তাঁহার কবিতায় এই ভাবটি কবি ভ্যনের (Vaughan) প্রসিদ্ধ কবিতা 'The Retreat' হইতে পাইয়াছিলেন এমন অনুমান অনেকে করেন।]

মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড্‌ নাটকে কবি দেখাইয়াছেন যে অনন্তের মধ্যে শিশুরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে।

ফ্র্যান্‌সিস্‌ টম্‌সন্‌ তাঁহার Daisy and Poppy, Hound of Heaven প্রভৃতি কবিতাতে শিশুর মধ্যে দেবভাব স্বীকার করিয়াছেন।

জন্মকথা

কবি বলিতেছেন যে যে-শিশুটি জন্মে সে আকস্মিক নয়। বিশ্বের সমস্ত রহস্যের মধ্য হইতে শিশুর আবির্ভাব হয়। শিশু যে বংশে জন্মগ্রহণ করে সেই বংশের সকলের আজীবনের তপস্যার ধন সে! ভগবানই প্রত্যেক সন্তানকে তাহার পিতৃপিতামহের ও মাতৃমাতামহের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধিয়া সংসারে প্রেরণ করেন; তিনিই সন্তানের মধ্যে তাহার পিতৃপুরুষের সমস্ত সাধনার মুক্তি ও সিদ্ধি লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। কোনো মানবই বিচ্ছিন্ন নয়, স্বতন্ত্র নয়; সকলেই তাহার পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সহিত সংযুক্ত। মানবের কোনো সম্পর্কই আকস্মিক বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র নহে, তাহার সহিত সমস্ত বিশ্বের সম্পর্ক আছে। তাহার কোনো সম্পর্কই কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ বা সীমাবদ্ধ সম্বন্ধ নয়, সেই সম্বন্ধ অনাদি কালের ও জন্মজন্মান্তরের। তাই সমস্ত সম্বন্ধই পরমদেবতার রহস্যসম্বন্ধকেই প্রকাশ করে।

এই কবিতার মধ্যে কবি তিনটি সূত্র একত্র বুনিয়াছেন—কবিত্ব, বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রমবাদ বা হেরেডিটি, এবং আত্মার অমরতা ও জন্মান্তরবাদ। কবি বলিতেছেন যে, শিশু অনন্ত অসীম হইতে আবির্ভূত হয় এবং দেশ কাল এবং বংশের সমস্ত বাহ্য ও মানসিক প্রভাব তাহার স্বভাবকে গঠন করে।

এই কবিতাটির সহিত কবি টেনিসনের 'ডি প্রোফাণ্ডিস' কবিতাটি বিশেষ ভাবে তুলনীয়।

যাস্ক তাঁহার নিরুক্তের মধ্যে পুত্র-সম্বন্ধে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই বলিয়া গিয়াছিলেন—

অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সম্ভবসি, হৃদয়াদ্ অধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্র-নামাসি, স জীব শরদঃ শতম্।

ঐ কথাটিকেই কবি রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে অসামান্য কবিত্ব মিলাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যুত্তম রচনা।

কেন মধুর

বিশ্বের আনন্দ-উৎস বাৎসল্য-রসের ভিতর দিয়া মাতার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করে। শিশুর হাতে রঙীন খেলনা দিলে শিশুর হৃদয়ে ও মুখে যে আনন্দ-

হাস্ত ফুটিয়া উঠে তাহা দেখিয়া মনে হয় এই আনন্দের সুরের সঙ্গে বিশ্বের আনন্দ-ধারার অখণ্ড সংযোগ আছে; ছেলের মুখের হাসি মেঘের রঙ, জলের রঙ, ফুলের রঙ প্রভৃতির সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া যায়—ছেলের হাসি দেখিয়াই বুঝিতে পারি বিশ্বসৌন্দর্য কোথায় কোথায় কি কি রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। শিশু-হৃদয়ের আনন্দধারার সহিত বিশ্বপ্রকৃতির মিল আছে বলিয়াই শিশুর আনন্দের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দের রূপলীলাও মাতার নয়নে মূর্ত হইয়া উঠে। শিশুর নৃত্য বিশ্বছন্দেরই অঙ্গ; তাহার নৃত্যের সঙ্গে বিশ্বসঙ্গীত সুর দেয় ও বিশ্বছন্দ তাল মিলায়। বিশ্বসঙ্গীত যেন শিশুর আনন্দের প্রতিধ্বনি, অথবা বিশ্বসঙ্গীতেরই প্রতিধ্বনি শিশুর আনন্দ-কাকলি।

শিশু যে ভোজনানন্দ উপভোগ করে তাহা দেখিয়াই উপলব্ধি হয় বিশ্বের উপভোগ্য পদার্থ কত মধুর। পুত্র-স্পর্শ-সুখ বিশ্বের আলোক-বাতাসের স্পর্শের আনন্দ হৃদয়ে সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। মাতা সন্তান-বাৎসল্যের ভিতর দিয়া জগৎ-শোভার অর্থ উপলব্ধি করেন; আপনার অন্তরের আনন্দ-ভাতিতে জগতের শোভায় আনন্দময়ের ও সুন্দরের সত্তা সন্দর্শন করেন। মানুষের মনে প্রেম ও আনন্দ উদয় হইলে সে সমস্ত-কিছুকে সুন্দর দেখে!

শিশুই নারীকে মাতৃত্বের আনন্দ অনুভব করায়। নারী মা হইলেই বিশ্বপ্রকৃতি তাহার কাছে নূতন রূপে প্রতিভাত হয়। শিশুর আনন্দে মাতৃহৃদয়ও আনন্দিত হয়। অন্তরে আনন্দ না থাকিলে কেহই প্রাকৃতিক আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং অন্তরে আনন্দ থাকিলে সেই আনন্দের দ্বারাই সুন্দর সুন্দরতর রূপে উপলব্ধ হয়।

মাতা অপত্যস্নেহ দ্বারা আনন্দময়ী বিশ্বমাতার স্নেহ উপলব্ধি করেন। এই-জন্য কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা।......বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।

—পঞ্চভূত, মনুষ্য

এই কথা 'গোরা' উপন্যাসের মধ্যেও হরিমোহিনীর মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—

ও আমার গোপীবল্লভ, আমার জীবননাথ, আমার গোপাল, আমার নীলমণি।......বাবা তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, এ দুটিকে—রাধারাণী আর সতীশকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পুজো আমি মনের সঙ্গে করতে পেরেছি—এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর তখনি কঠিন পাথর হ'য়ে যাবে।

কবি বলিতেছেন যে ভালবাসাই স্বর্গ—স্বর্গ ভালবাসায় পূর্ণ। শিশুদের মুখে স্বর্গের ছবি, তাহাদের সরল আনন্দে ভগবানের আনন্দমূর্তি প্রতিফলিত হয়—শিশুর হাসিতে ভগবানের প্রশান্ত সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে। মাতা সন্তানের স্নেহে তাহার সৌন্দর্য ও সরলতা দেখিতে পান এবং মুগ্ধ হইয়া সেই ভাবে বিশ্বকেও উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। যখন শিশু হাসে তখন মা মনে করেন প্রকৃতিও হাসিতেছে—এবং শিশুর হাসির ছটাতেই সূর্য কিরণশালী। শিশুর হাতের রঙীন খেলনাই বিশ্বে বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ এবং শিশুর ভোজনানন্দই বিশ্বসামগ্রীকে জননীর কাছে স্বাদুতা দান করে। মায়ের ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি সমস্তই তাঁহার সন্তানের স্নেহমূলক।

যিনি দান করেন তিনি যেমন সুখ পাইয়া থাকেন, তেমনি সুখ পাইয়া থাকেন যিনি দান গ্রহণ করেন। মাতা যখন সন্তানকে রঙীন খেলনা দেন, তখন সন্তান আনন্দিত হয়, আবার মাতাও সন্তানের আনন্দে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তখনই মাতা বুঝিতে পারেন যে আমরাও যখন প্রকৃতি-মাতার প্রতিপাল্য তখন প্রকৃতিও আমাদের সুখের জন্যই এবং নিজেরও সুখের জন্যই এত বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া-থাকেন। আবার মাতা যখন আপন সন্তানকে মিষ্ট কিছু খাইতে দেন, তখন তিনিও আনন্দিত হন—এখানেও দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সুখী। প্রিয়কে কিছু দান করিয়া যেমন সুখ, প্রিয়কে স্পর্শ করিয়াও সেইরূপ সুখানুভব করা যায়—এই ব্যাপারেও স্পৃষ্ট ও স্পর্শক উভয়েই সুখী। সুতরাং ঈশ্বর বা প্রকৃতি আমাদের ভালবাসেন বলিয়াই আমাদের কাছে প্রকৃতি এত সুন্দর ও মধুর রূপে প্রতিভাত হন।

নিজের শিশু কন্যাকে যখন ভাল লাগে তখন সে বিশ্বের মূল রহস্য মূল সৌন্দর্যের অন্তর্বর্তী হ'য়ে পড়ে—এবং স্নেহ-উচ্ছ্বাস উপাসকের মতো হ'য়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রীতি মাত্রই রহস্যময়ের পূজা ; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব,—যে আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্রমিক উপলব্ধি।

—ছিন্নপত্র, শিলাইদা, ১৩ই আগষ্ট, ১৮৯৪

অনন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে আপনার অপরূপ প্রকাশ সমস্ত সৌন্দর্যকে ও মানব-সম্বন্ধকে রন্ধ্র করিয়া মানবের মানস-গোচর করেন। প্রেমের আবেগে মানুষ যে-পরিমাণে নিজেকে ভুলিতে পারে সেই পরিমাণে তাহার কাছে অনন্ত প্রকাশিত হন। এই প্রেম-সাধনার কথাই বৈষ্ণব দার্শনিকেরা বলিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিতায় বালক কৃষ্ণের নবনীত ভক্ষণ করা ও রঙীন খেলনা লইয়া খেলা করা দেখিয়া মাতা যশোদার আনন্দ-প্রকাশের কথা আছে—

অরুণ অধরী উরে নবনী লাগিয়াছে রে,
মরি মরি বাছনি কানাই।
হেরি যশোমতি প্রেমেতে পুরিত আঁখি,
আয় কোলে বলিহারি যাই॥

—অজ্ঞাত

রাণী দিল পুরি কর খাইতে রক্তিমাধর,
অতি সুশোভিত ভেল রায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে,
হেরি' হরষিত ভেল মায়॥

—ঘনরাম দাস

কৃষ্ণচন্দ্র ফল হাতে খাইতে খাইতে পথে
আসি' নিজ-গৃহে উপনীত।
ফল দেখি যশোমতি আনন্দে না জানে কতি
খাওয়াইয়া প্রেম-সুখে ভাসে॥

—ঘনরাম দাস

রাঙা লাঠি দিব হাতে, খেলাইও শ্রীদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী।

—নরসিংহ দাস

এই কবিতাটির মধ্যে চারিটি কলিতে মাতা দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় রসনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা নিজের আনন্দানুভব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়—

Womanliness means only motherhood:
All love begins and ends there,.....roams through.
But, having run the circle, rests at home.

—Robert Browning, *The Inn Album*.

He (Rabindranath) knows that the figurative delight of the child points the mode of representing the wonder of the earth that philosophy finds it so hard to reduce to order...............

Herbert Spencer saw in the appetites of the child only the insatiable hunger of the beast-innate at a lower stage. Rabindranath has learnt to divine in them the first putting forth of the desires, which, being repeated in the other plane of intelligence, seek out the path to heaven itself.........He has, in truth, known how to see the child with the mother's eyes and the mother with the child's;.........

—Ernest Rhys.

The poet, a grown up man, looks at the child with the same wonder and sense of new discovery as a child experiences in its daily life. The child's ways are so innocent and mysterious, so foolish and wise, so preposterous and lovable. The poet shows in these poems a regard, at once joyous and tender, for the changing moods and wayward desires of a child. Every poem gives us a picture touched in with the fond life-like detail of a sympathetic child-lover.

—Ernest Rhys.

লুকোচুরি ও বিদায়

প্রপঞ্চ-রূপী খোকা পঞ্চভূতে বিলয় প্রাপ্ত হইলেও তাহার একেবারে বিনাশ ঘটে না, সে ভাব-রূপে পরিণত হয়। অতএব খোকার মৃত্যু একেবারে তাহার নির্ব্বাণ নহে, তাহা তাহার রূপান্তর-প্রাপ্তি ও সর্বত্র-ব্যাপ্তি। খোকা হাওয়া জল আলো ফুল হইয়া মাকে স্পর্শ করিতে আসিবে, এবং ভাবরূপে স্বপ্ন হইয়া সে মাতার মনের মধ্যেও আসা-যাওয়া করিবে।

তুলনীয়—শাজাহান কবিতা। এবং—

He is made one with Nature. There is heard
    His voice in all her music, from the moan
Of thunder to the song of night's sweet bird.
    He is a presence to be felt and known
    In darkness and in light, from herb and stone;
Spreading itself where'er that Power may move
Which has withdrawn his being to its own,
Which wields the world with never-wearied love,
Sustains it from beneath, and kindles it above.
He is a portion of the loveliness
    Which once he made lovely.

—Shelley, *Adonais*.

Where art thou, my gentle child?
    Let me think thy spirit feeds,
With its life intense and mild,
    The love of living leaves and weeds

Among these tombs and ruins wild;.........
    Let me think that through low seeds
Of the sweet flowers and sunny grass
    Into their hues and scents pass
A portion............

—Shelley, *To William Shelley.*

Three years she grew in sun and shower.
Then Nature said, "A lovelier flower
    On Earth was never sown;
This child I to myself will take;
She shall be mine, and I will make
    A lady of my own.
She shall be sportive as the fawn,
That wild with glee across the lawn
    Or up the mountain springs:
And hers shall be the breathing balm,
And hers the silence and the calm
    Of mute insensate things.

—Wordsworth, *A Memory.*

You will bury me my mother,
    Just beneath the hawthorn shade,
And you'll come sometimes
    And see me where I am lowly laid.
I shall not forget you mother,
    I shall hear you when you pass,
With your feet above my head
    In the long and pleasant grass.
If I can I'll come again, mother,
    From out my resting place;
Tho' you'll not see me mother,
    I shall look upon your face;
Tho' I cannot speak a word,
    I shall harken what you say,
And be often, often with you,
    When you think I'm far away.

—Tennyson, *New Year's Eve.*

উৎসর্গ

মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় কবিবরের কবিতাগুলিকে বিষয়-অনুসারে বিভাগ করিয়া একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩১০ সালে। সেই বিভাগগুলির নাম ছিল—যাত্রা, হৃদয়ারণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, লোকালয়, নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক, যৌবনস্বপ্ন, প্রেম, কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য, সংকল্প, স্বদেশ, রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা, মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ, শিশু, গান, নাট্য। এই প্রত্যেক বিভাগের কবিতাগুলির মোট তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক বিভাগের প্রথমে এক-একটি প্রবেশক কবিতা কবি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। পরে যখন এই কাব্য-সংস্করণের আর পুনর্মুদ্রণ হইল না, তখন কবির কবিতাগুলি প্রথমে যে যে পুস্তকে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন এই প্রবেশক কবিতাগুলি নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল, এবং এইগুলিকে একখানি নূতন পুস্তকের মধ্যে স্থান দেওয়া আবশ্যক হইল। যখন এই কবিতাগুলি ছাপার কল্পনা হইতেছিল তখন একদিন কবি এই কবিতা-সংগ্রহের কি নাম রাখা যায় তাহার আলোচনা আমার সহিত করিয়াছিলেন। আমি ঐ পুস্তকের নাম রাখিতে বলিলাম—উঞ্ছিতা। ঐ নাম কবির মনঃপূত হইল না, তিনি বলিলেন—ঐ নামের সঙ্গে উঞ্ছবৃত্তি এবং বাংলা 'উঁছা' শব্দের গন্ধ জড়াইয়া থাকিবে। তিনি বলিলেন—নামটা ঠিক হইত উচ্ছিষ্ট, কিন্তু তাহাও বাংলায় কদর্থ ধারণ করিয়াছে। আমি বলিলাম—তাহা হইলে সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া উৎশিষ্ট রাখিলে হয়। কবি অল্পক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—না, নাম থাক 'উৎসর্গ'—ইহার মধ্যে অবশিষ্টতার ভাবও থাকিল এবং নিবেদনের ধ্বনিও রহিল।

'উৎসর্গে'র কবিতাগুলি কবির বিশেষ বিশেষ ভাবপর্যায়ের কবিতার মুখবন্ধ বা উপক্রমণিকা, অথবা ব্যাখ্যা-স্বরূপ বলিয়া কবিতাগুলি গভীর ভাবে সমৃদ্ধ এবং সরস কবিতা হিসাবেও অত্যুত্তম। ইহার অনেকগুলির মধ্যেই জীবনদেবতার ভাব আছে; এবং কবিতাগুলি কবির পরিণত প্রতিভার ছাপ ধারণ করিয়া মহামূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে।

এই কাব্যের কবিতাগুলি ১৩০৮ হইতে ১৩১০ সালের মধ্যে রচিত।

অপরূপ

এই কবিতাটি 'সোনার তরী' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৬ নম্বর কবিতা।

যিনি কবির জীবনদেবতা ও অন্তর্যামী, তিনিই আবার বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া তাঁহার বুদ্ধি চিন্তা হৃদয় ধর্ম স্পর্শ করেন। যিনি ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রসব করেন, তিনিই আবার আমাদের ধীশক্তিকে প্রেরণ ও উদ্রেক করিয়া থাকেন। সেই যিনি অরূপ হইয়াও বহুরূপ, যিনি রূপং রূপং বহুরূপং বিভাতি, তিনিই অপরূপ। তিনিই অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ। তাই তাঁহাকে চিনি বলাও যায় না, চিনি না বলাও যায় না। এই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্ তদ্ বেদ তদ্ বেদ, নো ন বেদেতি বেদ চ ॥

আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি; আমি যে তাঁহাকে জানি না এমনও নহে। 'আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে'—এই বাক্যের অর্থ—আমাদিগের মধ্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্ ॥

যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন; এবং যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকটে ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাঁহাদের এই চেতনা আছে যে তাঁহারা ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ জানিতে পারেন নাই; কিন্তু অসম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তিদিগের নিকটে তিনি বিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাহারা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে যে তাহারা ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপেই জানিতে পারিয়াছে।

পাগল

এই কবিতাটি 'যৌবন-স্বপ্ন' পর্যায়ের কবিতার প্রবেশক। 'সঞ্চয়িতা' পুস্তকে কবি ইহার নাম রাখিয়াছেন 'মরীচিকা'। 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৭ নম্বর কবিতা।

বিত্তহীন ও শক্তিহীন পরদুঃখকাতর কোনো মহাপ্রাণ ব্যক্তি কোনো

দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে গেলে যেমন নিজের অক্ষমতায় ও অপরের ব্যথায় পাগল হইয়া উঠেন, তেমনি কবিও যখন স্বীয় অন্তরলোকের সৌন্দর্য প্রকাশ করার উপযোগী ভাষা ও সুর খুঁজিয়া না পান তখন তিনিও পাগল হইয়া উঠেন। কবির সব চেয়ে বড় ব্যথাই তাঁহার অন্তরলোকের ভাবসত্তার প্রকাশ করার ব্যথা—সে যেন গর্ভিণীর প্রসব-বেদনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্তান গর্ভ ছাড়িয়া বাহিরে আসে ততক্ষণ প্রসূতির স্বস্তি নাই। অন্তরের ভাবসম্পদ্‌কে সকলের গোচর করার উপযোগী কথা খোঁজাই কবিজীবনের সাধনা।

কবি নিজের শক্তি ও মাধুর্যের আভাস মাত্র উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না; সেইজন্য আপন নাভিগন্ধে পাগল কস্তুরীমৃগের সহিত কবি নিজের তুলনা করিয়াছেন।

মানুষ অনুক্ষণ মিথ্যা প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়, সুন্দর মনে করিয়া অসুন্দরকে ধরিয়া ভুল করে। তাই কবি বলিয়াছেন—

যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

ঠিক এমনি কথাই কবি শেলী বলিয়াছেন—

We look before and after,
And pine for what is not:
Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
—Shelley, *Skylark.*

সুদূর

এই কবিতাটি 'বিশ্ব' নামক কবিতা-পর্যায়ের প্রবেশক। 'সঞ্চয়িতা' পুস্তকে কবি ইহার শিরোনামা রাখিয়াছেন 'আমি চঞ্চল হে'। এটি 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৮ নম্বর কবিতা।

অনন্তের উপলব্ধি আকাঙ্ক্ষা, ক্রমাগত সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া অসীমের অভিমুখে যাত্রা করিবার উদগ্র বাসনা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে একটা অদৃশ্য শক্তি—যাহাকে জীবনী-শক্তি বলা যায়—ক্রিয়া করিতেছে। এই জীবনী-শক্তি- যাহাকে কবি 'সুদূর' আখ্যা দিয়াছেন—সর্বদাই জগৎটাকে

ওলট-পালট করিয়া নূতন ভাবে গড়িতেছে। ইহাকে unendlichkeitsdrang (endless urgency, impulse or impetus) বলা যাইতে পারে—অসীমের একটা আকর্ষণ। গেটে ইহাকে das ewig Weibliche (the eternal feminine) বলিয়াছেন। এইরূপ একটি শক্তি জগতের গতির মূল কারণ। বিজ্ঞান এই শক্তিকে দেখিতে পায় না। সেই জন্যই বিজ্ঞান কেবল নিয়মের রাজ্য ঘোষণা করে। কিন্তু বিজ্ঞান-কল্পিত নিয়মের জালকে ভাঙিয়া এই শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে।

—ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, রক্তকরবী, উত্তরা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

কবি নিজেকে অসীমে প্রসারিত করিতে চাহিতেছেন, কারণ তাঁহার মন তাঁহার কল্পনা অসীম-প্রসারী, এমন কি জীব মাত্রই অনন্তের অসীমের অংশ মাত্র। সেই জন্য কবি নিজেকে প্রবাসী বলিতেছেন। এই যে স্থানে কালে এবং বিশেষ দেহে আবদ্ধ আত্মা ও মন তাহাই মানুষের প্রকৃত অবস্থান নহে। মন উধাও হইয়া উড়িতে চায়, কিন্তু দেহ ও সংস্কার মানুষকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কবির মহাপ্রাণ ইহার জন্য ব্যথা অনুভব করিতেছে।

এই কবিতার সহিত কবির 'মানসভ্রমণ' বা 'বসুন্ধরা' কবিতা তুলনীয়।

কবি নিজেকে যেমন প্রবাসী বলিয়াছেন, তেমনি কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ও বলিয়াছেন—

The soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar;
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come,
From God, who is our home.

—Wordsworth, *Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood.*

তুলনীয়-

Ever let the Fancy roam,
Pleasure never is at home.

—Keats, *Fancy.*

I cannot rest from travel: I will drink
Life to the lees:

—Tennyson, *Ulysses.*

I am a part of all that I have met;
Yet all experience is an arch wherethro'
Gleams that untravell'd world, whose margin fades
For ever and for ever when I move.

—Tennyson, *Ulysses.*

প্রবাসী

মোহিতচন্দ্র সেনের কাব্য-সংস্করণের 'বিশ্ব' নামক বিভাগের প্রথম কবিতা। 'উৎসর্গ' পুস্তকের ১৪ নম্বর কবিতা।

এইজন্য ইহার সহিত ঐ বিভাগের প্রবেশক কবিতা 'সুদূরে'র ভাবগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতাটির সহিতও ইহার কিছু মিল আছে।

এই কবিতার মর্মকথা হইতেছে কবি জল-স্থল-আকাশের সহিত একাত্মভাব অনুভব করিতেছেন, সর্বানুভূতির জন্য তিনি নিজের সঙ্কীর্ণ পরিবেশকে প্রবাস-স্বরূপ মনে করিতেছেন। কবি দেশ-কালাতীত হইয়া সর্বদেশে ও সর্বমানবে—এমন কি সর্ব-জীবে সর্ব পদার্থে নিজেকে পরিব্যাপ্ত দেখিতেছেন। ইহা বৈদান্তিক আইডিয়ার সহিত নিও-প্লেটোনিক ডক্‌ট্রিনের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। কবি যে জড় উদ্ভিদ্ এবং নানা জীবের ভিতর দিয়া উদ্‌ভিন্ন ও অভিব্যক্ত হইতে হইতে এই বর্তমান শরীর লাভ করিয়া মহাকবির মননশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় পূর্বেই বলিয়াছেন।

তৃণে পুলকিত মাটির ধরা দেখিয়া কবি যে পুলকিত, তাহা কবি অন্য কবিতাতেও প্রকাশ করিয়াছেন।

> তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
> আশ্বিনে নব আলোকে
> চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
> প্রাণ ভরি' উঠে পুলকে। —উৎসর্গ, ১৩ নম্বর

পৃথিবীকে মাতা-রূপে সম্বোধন অতি প্রাচীন—

> মাতা ভূমিঃ, পুত্রো অহম্ পৃথিব্যাঃ। স্বস্তি নিষীদেম ভূমে।
> —অথর্ববেদ, ১২।১

'উৎসর্গ' পুস্তকের ৯ নম্বর কবিতা। মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'হৃদয়-অরণ্য' বিভাগের প্রবেশক।

ক্ষুদ্র জীবনের কারাগারে বন্দী হইয়া থাকার বেদনা এই কবিতায়

প্রকাশ পাইয়াছে। কবির বিরাট্‌ আত্মা সংসারে পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কবি যে একাকী নিজের মনে রস-সম্ভোগ করিতেন সেই জীবনেরও একটা মোহ আছে, সেই মোহ কাটাইতেও তাঁহার মনে ব্যথা বাজিতেছে, অথচ কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আকাঙ্ক্ষাও যথেষ্ট প্রবল। না-ফোটার কারাগারে রুদ্ধ থাকাতে কুসুমের যে আনন্দ-বিষাদ সেই উভয় অনুভূতিই কবি-চিত্ত অনুভব করিতেছে।

জগতে কিছুই বৃথা ও নিষ্ফল নয়, প্রত্যেক পদার্থের একটা-না-একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবার আদেশ আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য তখনই সংসাধিত হয় যখন সে জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজেকে পরিচালিত করিতে পারে।

যে অস্ফুট মন বিশ্বকর্মের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে নাই, যে আত্মা বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বমিলনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাহারই বিলাপে কবি তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন যে সকলকেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতেই হইবে, এবং কাল ও দেশ অনন্ত অসীম বলিয়া কাহারও অসম্পূর্ণতার জন্য আক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই, একদিন-না-একদিন সে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া ধন্য হইবেই।

অনেক সময়ে মানুষ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে, এবং জগতের নশ্বরতা দেখিয়া নিজের স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের অক্ষমতা ও বিফলতার জন্য বিলাপ করে। কিন্তু কবি-প্রতিভা যখন নিজের উদ্দেশ্য খুঁজিয়া না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তখন তাঁহারই মন হইতে এই অভয়বাণী উচ্চারিত হইতেছে—জগতের সহিত মিলিত হইয়া জগৎ-স্রোতে ভাসিয়া চলিতে পারিলেই তাঁহার জীবন ও প্রতিভা সার্থক হইবে—অতএব—

জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো যে যেথা আছো ভাই।

—প্রভাতসঙ্গীত, স্রোত

এখনও যাহা পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয় নাই, শুধু ফুটিবার আগ্রহে দিন কাটাইতেছে, তাহার নানা ধরণের অধীরতা ও দুশ্চিন্তা কবি এই কবিতার তিনটি স্তবকে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অভয়ও দিয়াছেন।

প্রথম স্তবকে কুঁড়ি বলিতেছে যে, ফাল্গুন অর্থাৎ সুসময় চলিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহার ফোটা হইল না। কবি বলিতেছেন,—হে অস্ফুট কুঁড়ি, তুমি ব্যস্ত হইও

না, ফাল্গুন অর্থাৎ সুসময় কখনো একেবারে চলিয়া যায় না, সকল সময়ই সুসময়।

দ্বিতীয় স্তবকে কুঁড়ি বলিতেছে,—তাহার গন্ধ তাহার অন্তরের কারাগারে বন্দী হইয়া আছে; সেই গন্ধ কেমন করিয়া বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করিবে ও তাহার পরিণতিই বা কী হইবে তাহা জানিতে না পারিয়া সে দুঃখিত বিচঞ্চল। কবি বলিতেছেন,—হে কুঁড়ি, ব্যস্ত হইও না, তোমার অভ্যন্তরে যে গন্ধ বন্দী হইয়া আছে তাহা একদিন-না-একদিন বহির্জগতে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিবে ও আপনাকে সার্থকতা দান করিবে। জগৎ-বিধান এমনই যে তাহার ফলে তুমি যখনই চাহিবে তখনই দেখিবে তোমাকে সার্থক করিবার আয়োজন ও সুযোগ জগতে পূর্ব হইতেই পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত রহিয়াছে।

তৃতীয় স্তবকে কুঁড়ি বলিতেছে,—তাহার সার্থকতার পথ যে কী তাহা সে জানে না, এবং সেইজন্য তাহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল। কবি বলিতেছেন,—জগতে সকলের সার্থকতার যে পথ, কুঁড়িরও সেই পথ। এ জগতে যাহা একাকী, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহা অনর্থক, তাহা ব্যর্থ; এ জগতে তাহাই সার্থক যাহা জগতের অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সংযুক্ত, অর্থাৎ কুঁড়ি যদি আপনার সৌন্দর্য সৌরভ ও মাধুর্যের গর্ব দেখাইবার জন্যই কেবল প্রস্ফুটিত হইতে চায়, তাহা হইলে সে ব্যর্থ হইবে। কিন্তু সে যদি তাহার সৌন্দর্যে সৌরভে মাধুর্যে জগৎকে সুন্দর, পরিতুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করে, তবেই সে দেখিবে তাহার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী কবি—জন্ম ও জীবন ক্রমাগত সার্থকতার পথে চলিতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। এখানে তাঁহার সেই মনোভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

বিশ্বদেব

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর 'স্বদেশ' বিভাগের প্রবেশক-রূপে লিখিত হইয়াছিল এবং ১৩০৯ সালের পৌষ মাসের বঙ্গদর্শন পত্রে 'স্বদেশ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা 'উৎসর্গ' পুস্তকের ১৬ নম্বর কবিতা।

এই কবিতায় কবি ভারতবর্ষের মধ্যে বিশ্ববাসীর মিলনস্থান এবং বিশ্বধর্মের

বিশ্ববোধের বিকাশ দেখিয়া স্বয়ং বিশ্বদেবকেই নিজের স্বদেশের মধ্যে আবির্ভূত দেখিতেছেন। যে একের ও বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্র ভারতের তপোবনে উদ্‌গীত হইয়াছিল, সেই গায়ত্রী-গাথাই বিশ্বত্রাণের মহামন্ত্র। কবি ধ্যান-নেত্রে দেখিতেছেন যে সুদূর ভবিষ্যতে এই ভারতের শিক্ষার ফলে দিগ্‌বিজয়ী পরদেশ-লোলুপ যোদ্ধার রণ-হুঙ্কার অথবা অর্থগৃধ্নু বণিকের পরদেশ-লুণ্ঠন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং বিশ্ববাসী সকলে ভারতের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে—

ঈশা বাস্যম্‌ ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ ধনম্‌॥

ভারতের পবিত্র নির্মল হৃদি-শতদলে ভারতের ভারতী অধিষ্ঠিত হইয়া অপূর্ব মহাবাণী ঘোষণা করিতেছেন। ইহাকেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'কবিকণ্ঠহার' পুস্তকে 'অধিভারতী' নাম দিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। কবির মনে স্বদেশপ্রীতি বিশ্বমৈত্রীতে পরিণত হইয়াছে।

আবর্তন

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'রূপক' বিভাগের প্রবেশক-রূপে এবং আমার সম্পাদিত প্রথম প্রকাশিত 'চয়নিকা'র মধ্যে কবীন্দ্রের সমগ্র কাব্যের প্রবেশক-রূপে ছাপা হইয়াছিল। ইহা ১৩০৯ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা 'উৎসর্গ' পুস্তকের ১৭ নম্বর কবিতা।

বিশ্ব-কাব্যের যিনি অনাদি-কবি তাঁহার সৃষ্টি-লীলায় আমরা দেখিতে পাই তিনি অ-ধরাকে ধরার মধ্যে, ethereal-কে tangible-এর মধ্যে, প্রাণকে জড়ের মধ্যে, spirit-কে matter-এর মধ্যে, অসীমকে সীমার মধ্যে ধরিয়া প্রকাশ করিতেছেন। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যেও আমরা সেই বিশ্ব-কাব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই ও প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই।

অসীম অনন্ত এবং সসীম সান্ত পরস্পরের বন্ধনের মাঝে মুক্তি খুঁজিয়া সৃষ্টির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। অব্যক্ত অব্যয় নিজেকে পলে পলে ভাব হইতে রূপে এবং রূপ হইতে ভাবে ব্যক্ত করিতেছে।

Absolute ও Concrete পরস্পরকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, নতুবা তাহাদের প্রকাশই সম্ভব হয় না। তাই কবি পরে বলিয়াছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

ইহারও অনেক আগে কবির প্রথম যৌবনে কবি এই তত্ত্বটি প্রকাশ করিয়াছিলেন—

এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
অসীম হতেছে ব্যক্ত—সীমা-রূপ ধরি'
যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা—সেও অসীম অপার—
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ
কে আছে কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে।
বড় ছোট কিছু নাই; সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু।
সীমা তো কোথাও নাই—সীমা সে তো ভ্রম।

—প্রকৃতির প্রতিশোধ, সন্ন্যাসীর উক্তি

রবীন্দ্রনাথের 'আবর্তন' কবিতাটির হুবহু অনুরূপ একটি কবিতা আছে ভক্তকবি দাদূর—

বাস কহে হম্ ফুল কো পাউঁ,
ফুল কহে হম্ বাস।
ভাব কহে হম্ সত্-কো পাউঁ,
সত্ কহে হম্ ভাব॥
রূপ কহে হম্ ভাব-কো পাউঁ,
ভাব কহে হম্ রূপ।
আপস্-মেঁ দউ পূজন চাহে—
পূজা অগাধ অনুপ॥

সুগন্ধ বলে—আমি ফুলকে না পাইলে তো আমার প্রকাশেরই কোনো সম্ভাবনা নাই; আমি সূক্ষ্ম, স্থূল ফুলকে পাইলেই তবে আমি আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারি। আবার ফুল বলিতেছে—আমি স্থূল, আমি যদি গন্ধকে না পাই তবে আমার জীবন নিরর্থক হয়। ভাবা বলে—আমি যদি সত্যকে না পাই তবে আমি মিথ্যা। আবার সত্য বলে—আমি যদি ভাবাকে না পাই তবে তো আমার প্রকাশই অসম্ভব। রূপ বলে—আমি ভাবকে যদি না পাই তবে

তো আমি জড় মাত্র। আবার ভাব বলে—রূপকে না পাইলে আমি তো কেবল মাত্র ফাঁকা হাওয়া। অতএব সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ে উভয়কে পূজা করিতে এবং পাইতে চাহিতেছে, এবং এই পূজার রহস্য অগাধ ও অনুপম।

অতীত

'কথা কও কথা কও'

মোহিত-সংস্করণের কাব্যগ্রন্থাবলীর 'কথা' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। ইহা 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৩৫ নম্বর কবিতা।

কবি অতীত ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিবেন, তাই তিনি অতীতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—অতীতকাল তো অনাদি অনন্ত, তাহা রাত্রির মতন রহস্যান্ধকারে অজানার দ্বারা আবৃত। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কত কত ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, তাহার কতটুকু ভগ্নাংশ ইতিহাস জীবনচরিত কিংবদন্তী জনশ্রুতি ধরিয়া জীবিত রাখিতে পারে। অধিকাংশই অতীতের গর্ভে হারাইয়া গোপন হইয়া যায়, সে-সব সংবাদ আর পরিব্যক্ত হয় না। হে অতীত, তুমি আপনাকে কবির কাছে প্রকাশিত করো।

কিন্তু অতীত কালপ্রবাহে বিলীন হইলেও তাহার পলি পড়িয়া মন উর্বর হইয়া উঠে। জগতের সমস্ত কাহিনী ঘটনা অতীতের কুক্ষিতে লুক্কায়িত হইয়া গেলেও, তাহা লুক্কায়িত হয় মাত্র, বিনষ্ট হয় না। পূর্ববর্তীদের কর্ম ও জীবনের প্রভাব বর্তমানের উপর পড়িয়া বর্তমানকে গঠন করে।

এই কবিতার সহিত তুলনীয়—'কাহিনী' বিভাগের প্রবেশক-কবিতা—

'কত কি যে আসে কত কি যে যায় বাহিয়া চেতনা বাহিনী।'

Thou hoary giant Time,
Render thou up the half-devoured babes ;—
And from the cradles of eternity,
Where millions lie lulled to their potioned sleep
By the deep murmuring stream of passing things,
Tear thou up that gloomy shroud.

Shelley, *The Daemon of the World.*

কত কি যে আসে, কত কি যে যায়

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'কাহিনী' বিভাগের প্রবেশক। ইহা 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৩৪ নম্বর কবিতা।

চেতনা-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া বোধের বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কত কি যে আসে যায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সেইসব আগন্তুক ভাবাবলীর ভগ্নাংশ খণ্ড মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে পড়িয়া থাকে; মন সেইসব টুক্‌রা একত্র সংগ্রহ করিয়া কত কাহিনী রচনা করে। সেই মন একমনা অর্থাৎ একাগ্র, সে অদর্শন, সে কেবলমাত্র স্মৃতি-সমাশ্রিত। মন হৃদয়ের সঙ্গী, তাহার ভাণ্ডারে সব-কিছুই সঞ্চিত হইয়া থাকে; সেই সঞ্চিত নানা উপকরণ একত্র করিয়া মন ও হৃদয় মিলিয়া নানা অপূর্ব বস্তু সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টি-কর্ম গোপনে অন্তরের অন্তরালে স্মৃতির সাহায্যে সম্পাদিত হয়। যতক্ষণ না সেই সৃষ্টি শেষ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায় ততক্ষণ কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। এই যে মন তাহা তো কেবল ইহ-জন্মের অভিজ্ঞতা লইয়া কাজ করে না, কেবল তাহার নিজের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়েই পূর্ণ থাকে না। পূর্বপুরুষদের পিতৃ-পিতামহদের সমস্ত মননশক্তি ও অভিজ্ঞতার এবং নিজেরও জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী সে। যে প্রাণ-বিন্দু মাতা-পিতা হইতে—দীপ হইতে দীপান্তরে অগ্নিশিখা-সংক্রমণের মতন—ভ্রূণ রূপে পরিণত হয়, সে তো তাহার দেহকোষে, মনোময়কোষে ও প্রাণময়কোষে পৈতৃক ও মাতৃক সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লইয়াই শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় এবং আপনার পরিবেশের সমস্ত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে করিতে সে মানুষ হইয়া উঠে। সেই-সমস্ত আপাতবিস্মৃত কাহিনী তাহার স্মৃতির মধ্যে মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে সুপ্ত-চৈতন্যের মধ্যে subliminal self-এর মধ্যে সঞ্চিত থাকে; যখন দরকার পড়ে তখন মহাজন মন তাহার ভাণ্ডারী ব্যাঙ্কারের কাছে চেক্ কাটে হুণ্ডী পাঠায় আর গচ্ছিত আমানত্ ধন স্মৃতির খাজনাখানা হইতে আদায় করিয়া আনে।

মরণ-দোলা

এই কবিতাটি ১৩০৯ সালের পৌষ মাসের বঙ্গদর্শনে ৪১৭ পৃষ্ঠায় 'বিশ্বদোল' নামে প্রকাশিত হয়।

ইহা মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'মরণ' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৪১ নম্বর কবিতা।

কবি জীবন ও মৃত্যুকে দোলার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কোনো অন্ধকার ঘরের দরজার চৌকাঠে যদি দোলা টাঙাইয়া কেউ দোল খায়, তবে সে একবার বাহিরের আলোকে দুলিয়া আসে এবং পরক্ষণেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে চলিয়া দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া যায়। অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া এ-কথা যেমন বলা সঙ্গত নয় যে সেই দোল-খাওয়া লোকটি আর নাই, তেমনি মৃত্যুর অন্ধকারে প্রাণী আবৃত হইলে বলা সঙ্গত নয় যে সেই প্রাণী আর নাই। মানুষ একই জীবনে একই চেতনার মধ্যে ও একই অভিজ্ঞতার মধ্যে জাগ্রত অবস্থা হইতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং পুনরায় জাগরিত হয়, সেইজন্য কেহ নিদ্রাকে ভয়ংকর মনে করে না। কিন্তু মৃত্যুর পরে জন্মান্তর লাভ করিলে মানুষের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না; তাহার মৃত্যু ও নবজন্ম একই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে থাকে না বলিয়াই মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, মনে করে এই বুঝি সব-শেষ। কিন্তু কবিরা মৃত্যুকে নিদ্রার সহোদর বলিয়াই জানিয়াছেন—

How wonderful is Death...
Death and his brother Sleep!

—Shelley, *Queen Mab.*

অনেক কবি মৃত্যুকে নিদ্রার সহিত তুলনা করিয়াছেন—মৃত্যুর এক নাম মহানিদ্রা।

To die,...to sleep;...
To sleep: perchance to dream;...ah, there's the rub.

—Hamlet's Soliloquy

মানুষ অজ্ঞাতকে ভয় করে, তাই চিরপরিচিত জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়া অজ্ঞাত 'মৃত্যু-মাধুরী' উপলব্ধি করিতে পারে না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলিয়াছেন—মৃত্যু নবজীবনের দ্বার—

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়!
জয় অজানার জয়।

মৃত্যু জীবনেরই পরিণতি। মৃত্যু বিশ্বজননীর কোল, সেখানে কিছুই নষ্ট হয় না, কেহই দুঃখ পায় না।

স্তন হ'তে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে।
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥

…………সে যে মাতৃপাণি
স্তন হ'তে স্তনান্তরে লইতেছে টানি' ॥

—নৈবেদ্য

কবি রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মৃত্যুকে পাশাখেলার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাকে তিনি বল খেলার সঙ্গেও তুলনা করিয়াছেন। সিন্ধুদেশের ভক্ত কবি বেকসও বল-লোফালুফি খেলার সঙ্গে জন্ম ও মৃত্যুকে তুলনা করিয়াছেন। বেকস অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সিন্ধুদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি মাত্র ২২ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তাঁহার মাতা খেদ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া কবি বেকস তাঁহার মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—জগজ্জননী ও পার্থিব জননী এই উভয়ের মধ্যে বল-লোফালুফির খেলা চলে—একজন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন এবং অপরে লুফিয়া ধরিয়া নেন, সেইরূপেই তো আমার জন্ম আরম্ভ হইয়াছিল—জগজ্জননী আমার জীবনকে ছুঁড়িয়া তোমার কোলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এখন আবার আমাকে ছুঁড়িয়া তাঁহার কোলে ফেলিয়া দিয়া তুমি খেলা শেষ করো।—

উভয় মাতু বীচ খেল চলে—
গেঁদ জ্যূঁ মোকো দেঈ লেঈ ॥
তেই তো জনম মোকে সুরু হৈ,
খেল্ আজু মোকু দেঈ ॥

রবীন্দ্রনাথ জন্ম-মৃত্যুকে যেমন দোলার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, ভক্ত কবি কবীরও তেমনি মৃত্যুকে ঝুলনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, এবং তিনিও বলিয়াছেন যে জন্ম-মরণ যেন বিধাতার দক্ষিণ ও বাম হাতে অদল-বদলের খেলা—

জনম-মরণ-বীচ দেখো অন্তর নহী—
দচ্ছ ঔর বাম য়ূঁ এক আহী।
জনম মরণ জহাঁ তারী পরত হৈ
হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ।
উঠত ঝনকার তহঁ নাদ অনহদ ঘরৈ,
তিরলোক-মহলকে প্রেম বাজৈ ॥
চন্দ্র তপন কোটি দীপ বরত হৈ,
তুর বাজৈ তহাঁ সন্ত ঝালৈ।
প্যার ঝনকার তহঁ, নূর বরষত রহৈ,
রস পীবৈ তহঁ ভক্ত ভুলৈ ॥

—কবীর

গগন সেথা মগন সদা নবীন চির আনন্দে
জন্ম আর মরণ, তাঁর বাজিছে তালি দুই হাতে ;
রাগিণী উঠে ঝঙ্কারিয়া কী মূর্ছনা কী ছন্দে !
ত্রিলোক হ'তে রসের ধারা মিলিছে আসি' দিন রাতে ।
সূর্য শশী লক্ষ কোটি প্রদীপ সেথা সমুজ্জ্বল,
বাজিছে তূরী ভুবন ভরি', প্রেমিক দুলে হিন্দোলে ;
পিরীতি সেথা মর্মরিছে, ঝরিছে আলো অনর্গল,
আপনা ভুলি' ভকত হিয়া অমৃত পিয়ে বিহ্বলে
জন্ম আর মরণে কোনো তফাৎ নাই—নাই তফাৎ—
নাই তফাৎ যেমনতর দক্ষিণে ও বামে গো ;
কবীর কহে সেয়ানা যেবা হয় সে বোবা অকস্মাৎ—
কোরান-বেদ-অতীত বাণী—অতল যেথা নামে গো ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণি-মঞ্জুষা

Our life is a succession of deaths and resurrections; we die, Christopher, to be born again.

—Romain Rolland.

......and still depart
From death to death thro' life and life, and find
Nearer and ever nearer Him, who wrought
Not matter, nor the finite-infinite......

—Robert Browning.

Earth knows no desolation.
She smells regeneration
In the moist breath of decay.

—Meredith.

মরণ

এই কবিতাটি ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে ২৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সঞ্চয়িতা' পুস্তকে কবি ইহার শিরোনামা রাখিয়াছিলেন 'মরণ-মিলন'। ইহা 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৪৮ নম্বর কবিতা।

জীবনকে সত্য বলিয়া জানিতে হইলে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া চাই। যে মানুষ ভয় পাইয়া মৃত্যুকে এড়াইয়া জীবনকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, জীবনের উপরে তাহার যথার্থ শ্রদ্ধা নাই বলিয়া সে জীবনকে পায়



নাই। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করিয়াও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে আগাইয়া গিয়া মৃত্যুকে বন্দী করিতে ছুটিয়াছে সে দেখিতে পায়—যাহাকে সে ধরিয়াছে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। 'ফাল্গুনী' নাট্যকাব্যের অন্তরের কথা ইহাই।

যাহাদের অন্তরের মিল হইয়া যায় তাহারা আর বাহিরের রূপ দেখিয়া ভ্রান্ত হয় না। তাই রুদ্রবেশী প্রিয়তমকে দেখিয়াও প্রণয়িনীর আঁখি সুখে ছলছল করে। যাহারা অন্তরের পরিচয় পায় না, তাহারাই বাহ্য কদাকার মূর্তিকে সমাদর করিতে পারে না। তুলনীয়—কবির নাট্যকাব্য 'শাপ-মোচন', এবং 'পুনশ্চ' পুস্তকে 'শাপমোচন' কবিতা।

তুলনীয়—

যতটুকু বর্তমান তারেই কি বলো প্রাণ,
সে তো শুধু পলক নিমেষ।
মৃত্যুকে হেরিয়া কেন কাঁদি—
জীবন তো মৃত্যুর সমাধি।
—প্রভাত-সঙ্গীত, অনন্ত মরণ

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে বর বলিয়াছেন, এবং জীবনকে বলিয়াছেন তাহার বধূ।

মিলন হবে তোমার সাথে,

জীবন-বধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা॥
বরণ-মালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত-মাঝে।
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে!
সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা। —গীতাঞ্জলি

আমাদের ওই ক্ষ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগ্‌লামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অনির্বচনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।.........জীবনে এই বিপদ-দুঃখ-বিরোধ-মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।

—রবীন্দ্রনাথ, আমার ধর্ম, প্রবাসী ১৩২৪ পৌষ

ভক্ত কবি কবীর মৃত্যুকে জীবনের সহিত জীবন-স্বামীর বিবাহ-মিলন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—ওগো গায়িকারা তোমরা বধূর বিবাহে মঙ্গলাচার গান করো, আমার গৃহে আমার স্বামী রাজা আনন্দময় আসিয়াছেন। কবীর বলেন, আমি এক অবিনাশী পুরুষের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছি।—

গাউ গাউরী দুলহনী মঙ্গলাচারা।
মেরে গৃহ আয়ে রাজা রাম ভতারা॥
কহৈ কবীর, হম্ ব্যাহ চলে হৈ
পুরুষ এক অবিনাশী।

তুলনীয়—

There is no Death! What seems so is transition;
The life of mortal breath
Is but a suburb of the life elysian,
Whose portal we call death.

—Longfellow.

We should be colonists, not home-dwellers in the world, perpetually dreaming of the voyage home.

—Emerson, ***Essay on Over-Soul***

It is at life's door that Death knocks.

—Maeterlinck, ***The Princess Maleine***

মেটারলিঙ্কের Intruder এবং Les Aveugles-ও ইহার সহিত তুলনীয়।

The fear of Death is universal among mankind, and depends not only on the pain that often accompanies dissolution, but also on the consequences affecting the survivors, *i.e,* the cessation of all old familiar relations between them and the decomposition of the body.

The ordinary process of Death is the separation of the soul from the body as in dreams, the only difference being that in the latter case the separation is for the time being, but in the former it is permanent and final.

The belief in continued life has undergone various stages of evolution which glide imperceptibly one into another.

—C. E. Vulliamy, ***Immortal Man***

হিমাদ্রি

এই কবিতাটি 'হিমালয়' নামে ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 'উৎসর্গ' পুস্তকে ২৪ নম্বর হইতে ২৯ নম্বর পর্যন্ত হিমালয়-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি একত্র পঠিতব্য। শিলালিপি, তপোমূর্তি প্রভৃতি কবিতাও বঙ্গদর্শনে ঐ মাসে প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীতের প্রধানতঃ দুইটি অংশ আছে—একটি অংশ তাহার সুর বা তান; এবং দ্বিতীয় অংশ তাহার বাণী বা ভাষা। গায়ক যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কোনো ভাষা থাকে না, কিন্তু তাহা কখনও উদাত্ত কখনও অনুদাত্ত এবং কখনও বা স্বরিত হয়, এবং সমস্ত সুরটি উচ্চানুচ্চতা-হেতু যেন তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে মনে হয়। তরঙ্গায়িত-দেহ হিমালয়ও যেন এইরূপ একটি পবিত্র সাম-গীতের সুর পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে বাণীর সন্ধানে ছুটিয়াছে।

আবার কোনো গায়কের সুর খুব উচ্চ গ্রামে উঠিয়া আরও উঠিতে অক্ষম হইলে যেমন হঠাৎ থামিয়া যায়, এবং তখন গায়ক কেবল হাঁ করিয়া নিশ্চলভাবে থাকে ও তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে, সেইরূপ হিমালয়েরও সুর যেন অতি উচ্চে উঠিয়া শব্দহারা হইয়া গিয়াছে, এবং দুঃখে তাহার চোখ দিয়া প্রস্রবণ-রূপ অশ্রুধারা পড়িতেছে।

প্রকৃত পক্ষে, এক শ্রেণীর পর্বত আছে যাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে পৃথিবীর অগ্ন্যুত্তাপের জন্য। যে অগ্ন্যুত্তাপের বেগে হিমালয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান হওয়ায় হিমালয় আর ঊর্ধ্বে বাড়িতে পারিতেছে না, এবং তাহার বৃদ্ধি বন্ধ হওয়াতে সে সসীম পাষাণ হইয়া সীমাবিহীন আকাশের তলে স্তব্ধ হইয়া আছে।

কবি হিমালয়কে এমন এক গায়কের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন যিনি সুর সংযুক্ত করিয়া আপনার কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে বীণা বাজাইতেছেন, অথচ কোন্ বিশিষ্ট গান এই সুরে গাহিবেন তাহার ভাষা এখনও স্থির করিতে পারিতেছেন না।

কবি হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, সে বিস্ময়-স্তম্ভিত বিশ্ববাসীর নিকট কোন্ মহতী বাণী—মেসেজ্—প্রচার করিতে চাহিতেছে? তাহার এই অভ্রভেদী বিরাট্ আকারের মধ্যে কোন সত্য ব্যক্ত হইতেছে?

সঙ্গীতের গ্রাফ্ অঙ্কিত করিলে বাস্তবিক পর্বত-শৃঙ্গের তরঙ্গের ন্যায়ই দেখায়।

কবি হিমালয়কে এক প্রশান্ত আত্ম-সমাহিত ধ্যান-নিমগ্ন বৃদ্ধ তপস্বী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, যিনি যৌবনের দুর্দমনীয় উৎসাহে ও আত্মশক্তিতে অসীম বিশ্বাসের বলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে যৌবন-সুলভ মাদকতা অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার শক্তির পরিসর সীমাবদ্ধ উপলব্ধি করিয়া শান্ত সমাহিত হইয়া ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। মানুষ যতদিন পর্যন্ত আপনার শক্তির এই নির্দিষ্ট গণ্ডি বুঝিতে না-পারে ততদিন পর্যন্ত আপনার আকাঙ্ক্ষারও অন্ত পায় না, ততদিন পর্যন্ত তাহার আকুলি-

ঝিকুলিরও শেষ হয় না। তাহার পর যখন যৌবনের মত্ততা চলিয়া যায়; তখন সে হানাহানি ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং স্বভাবতই সে সংসারের প্রতি অনাসক্ত হইয়া পড়ে। তখন মানব-জীবনের অপূর্ণত্ব ও সসীমত্ব উপলব্ধি করিয়া পূর্ণাৎপূর্ণ অসীমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কবি সেই জন্য বলিয়াছেন—

তাই আজি মোর মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছে সঁপিয়া!

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যের বর্ণনা করেন না, তিনি প্রকৃতির রহস্য ও তন্মধ্যে যে বিশ্ব-চৈতন্য অন্তর্গূঢ় হইয়া আছে তাহারই বর্ণনা করেন। কোনো দৃশ্য কবির মনে যে ভাবের উদ্রেক করে, উহার মধ্যে তিনি যে সত্যের সন্ধান পান, তাহাকেই ভাষার ও ছন্দের ভিতর দিয়া তিনি আকার দান করিতে চেষ্টা করেন। সেই ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের আহ্বান আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠে, প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে। হিমালয়ের গাম্ভীর্য মহত্ত্ব ও বিরাটত্বের ছবি কবি তাঁহার ভাবানুরূপ ভাষায় গম্ভীর ছন্দের সাহায্যে আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন।

এই কবিতার সহিত শিলালিপি, তপোমূর্তি প্রভৃতি কবিতা মিলাইয়া একত্র পাঠ করিলে ইহাদের সকলেরই অর্থ সুস্পষ্ট হইবে।

এই কবিতায় প্রভাতের দ্বার বলিতে কবি 'পূর্বদিক্' বুঝাইয়াছেন।

তুলনীয়—

ফুলকুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্বাশার হৈমদ্বার পদ্মকর দিয়া।

—মাইকেল মধুসূদন, মেঘনাদবধ কাব্য, দ্বিতীয় সর্গ

যবে ফুলকুল-সখী হৈমবতী উষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্র রথ, খুলি' সুকমল-করে
পূর্বাশার হৈমদ্বার।

—তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য

প্রচ্ছন্ন

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'কল্পনা'-বিভাগের প্রবেশক ছিল। 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৩ নম্বর কবিতা।

কবি বলিতেছেন যে—'মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকি সব ধন স্বপনে।'

অর্থাৎ, কবির জীবন-মনের যত কিছু অভিজ্ঞতা তাহার কতক অংশ বাস্তব এবং কতক অংশ কাল্পনিক, কবি সামান্য অভিজ্ঞতাকেও নিজের কল্পনা ও মনন-শক্তির দ্বারা পূর্ণ করিয়া অতীন্দ্রিয় ব্যাপারও প্রকাশ করিতে পারেন। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিকেই কবি আহ্বান করিতেছেন।

তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল?

এই কবিতাকে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের কাছে সংগোপন-প্রয়াসী প্রেমের লীলা বলা যাইতে পারে। অথবা কবির যে কবিত্ব-শক্তি কবির জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী, যিনি কবিকে দিয়া কথা বলাইতেছেন, যিনি কবিকে ধরা দিয়াও ধরা দেন না,—এ কবিতায় তাঁহার ছলের কথাই, রহস্য-লীলার কথাই বলা হইয়াছে। কবির মনের মধ্যে তিনি ভাব উদ্রেক করিয়া দেন কিন্তু ঠিক সেই রকম তাহার প্রকাশ হয় না, এবং কবিকে দিয়া যাহা প্রকাশ করান তাহাতে বিশ্ববাসী পরিতৃপ্ত হইয়া বাহবা দিলেও কবির নিজের অন্তর তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না।

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'লীলা'-নামক বিভাগের প্রবেশক। 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৪ নম্বর কবিতা।

চেনা

আপনারে তুমি করিবে গোপন কি করি?

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'কৌতুক' নামক বিভাগের প্রবেশক ছিল। 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৫ নম্বর কবিতা। ইহার সহিত 'ছল' কবিতাটির বিশেষ ভাব-সমতা আছে। বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাছে কতক রহস্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করেন; কখনো তিনি আনন্দ দেন, আবার কখনো দুঃখও দেন; কিন্তু সেই দুঃখ যে রস-রহস্যেরই রূপান্তর তাহা কবি বুঝিয়া মনে সান্ত্বনা অনুভব করেন।

প্রসাদ

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'কণিকা'-বিভাগের প্রবেশক, এবং 'উৎসর্গে'র ১২ নম্বর। 'সঞ্চয়িতা'য় কবি ইহার নাম রাখিয়াছেন 'প্রসাদ'।

অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই প্রকাশ পান। তিনি যে বিরাট্ হইয়াও ক্ষুদ্রের মধ্যে নিজেকে ধরা দেন ইহা তাঁহার পরম প্রসাদ, বিশেষ অনুগ্রহ। কবির ভাব অসীম ব্যঞ্জনায় ভরা, কিন্তু ভাষা সীমাবদ্ধ; সেই সীমাবদ্ধ ভাষার মধ্যে ভাব যে ধরা দিয়া আত্মপ্রকাশ করে ইহা ভাবময়ের লীলা। সূর্য অমিততেজ, একমাত্র আকাশই তাহাকে ধারণক্ষম; কিন্তু সেই সূর্যও অতি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর মধ্যে নিজেকে ধরা দেয়।

নব বেশ

ইহা 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৪২ নম্বর কবিতা। ইহা মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'সংকল্প' নামক বিভাগের প্রবেশক ছিল।

কবি প্রথম জীবনে রসের চর্চা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জীবন-দেবতার হাতে ছিল বাঁশী, তার সুর ছিল মধুর ঘুম-পাড়ানো, সেই সুরে হৃদয়ের রক্ত কমলের ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া উঠিত। তখন কবির জীবনের বসন্তকাল। কিন্তু শেষ জীবনে কবি দেখিতেছেন যে তাঁহার সেই রসের পালা শেষ করিয়া ভরা ভাদ্রের ঘনবর্ষা নামিয়া আসিয়াছে, দুর্দিন-বাদল ঘনাইয়া আসিয়াছে, এবং জীবনদেবতা এখন রুদ্রবেশে আসিয়া কবিকে দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহার বাঁশী এখন বিষাণে পরিণত হইয়াছে।

এই কবিতাটির সহিত 'এবার ফিরাও মোরে' ও 'আবির্ভাব' কবিতার ভাব সাদৃশ্য আছে।

জন্ম ও মরণ

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'মরণ'-বিভাগে "প্রয়াসের প্রেম' নামে ছাপা হইয়াছিল। ইহা 'উৎসর্গ' পুস্তকের ৪৯ নম্বর ও শেষ কবিতা। ইহা দুইটি সনেটের একত্র গ্রন্থনে গঠিত।

কবি জন্ম-জন্মান্তরবাদী। তিনি যেমন অনেক কবিতায় আগে বলিয়া আসিয়াছেন তেমনি এই কবিতাতেও বলিতেছেন যে তিনি কবি-রূপে মানব-রূপে প্রাণী রূপে জন্ম হইতে জন্মান্তরে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন—এই যাত্রা অনাদি ও অনন্ত। তিনি রূপ-রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে লোক-লোকান্তরে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছেন। তিনি এইজন্য নিজেকে প্রবাসী বলিতেছেন—এই যে মর্ত্যবাস ইহা তো সামান্য কয়েক বৎসরের জন্য পান্থশালায় বাস, তাহার পরে মেয়াদ ফুরাইলে পরলোকে যাত্রা করিতে হইবে। যে লোকে যখনই তিনি থাকেন তখনই তিনি বিশ্বেশ্বরের প্রেমে বাঁধা পড়েন এবং যিনি পূর্ণাৎপূর্ণ তাঁহার প্রণয়ী হইয়া কবিও ক্রমশ পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া উঠিবেন ; এবং তাঁহার সঙ্গীতও পূর্ণতার সুরে সমৃদ্ধতর হইতে হইতে লোক-লোকান্তরে ধ্বনিত হইয়া চলিবে।

চিঠি

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।

এই কবিতাটি 'চিঠি'-নামে ১৩১০ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি কবির অত্যুত্তম কবিতাগুলির অন্যতম। ইহা 'উৎসর্গ' পুস্তকের ১১ নম্বর কবিতা।

ইহা মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'রূপক'-বিভাগে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে রূপক মনে না করিয়া সাধারণ নর-নারীর প্রণয়ের দিক্ হইতেও দেখা যাইতে পারে। 'আবেদন' কবিতার মতন ইহাতে যে মনুষ্য-হৃদয়ের রসপরিচয় পাওয়া যায় তাহা মহামূল্য।

মনে করা যাক—একটি নিরক্ষরা মুগ্ধা রমণী বহু দিনের প্রতীক্ষার পরে একদিন সকালে উঠিয়া তাহার প্রিয়তমের পত্র পাইয়াছে। কিন্তু সেতো পড়িতে জানে না। কোন্ পণ্ডিতের কাছে সে এই চিঠি পড়াইতে যাইবে ? ইহাতে তো তাহার একান্ত আপনার হৃদয়পুরের গোপন প্রণয়-সম্ভাষণ অপরের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আর সে তাহার প্রিয়তমের কথা যে-রকম ভাবে বুঝিতে পারিবে, সামান্য কোনো কথার মধ্যে যে অনন্ত মাধুরী সে ধরিতে পারিবে, সেই পণ্ডিত তাহা কেমন করিয়া পারিবে—

তাহার তো প্রেমের দৃষ্টি নাই? প্রিয়তমের পত্র পাইয়াছি, এই বোধের আনন্দে তো জগৎ মধুময় হইয়া গিয়াছে; এবং এই না-বোঝা লিপি সে মাথায় কোলে বুকে লইয়া যে অনির্বচনীয় অননুভূতপূর্ব আনন্দ বোধ করিবে, তাহারই আভাস সে বিশ্বচরাচরে প্রতিফলিত দেখিয়া ভরপুর হইয়া থাকিবে। সে নিজের মনের কল্পনা ও মাধুরী মিলাইয়া এই লিপিতে যে ভাবরস সঞ্চার করিয়াছে, তাহা যদি সেই লিপির মধ্যে বাস্তবিক না থাকে, তবে তো তাহার সুখস্বপ্ন নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব এই লিপি পড়িয়া বুঝিবার কাজ কি? তাহার প্রিয়তম তাহাকে পত্র লিখিয়াছেন, এই লাভটুকুই তাহার পরম ও চরম লাভ।

এই কবিতাকে রূপক মনে করিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিশ্বেশ্বরের সৌন্দর্যলিপি আমাদের কাছে নিত্য-নিরন্তর আসিতেছে, আমাদের প্রত্যেকের রসানুভূতির মধ্যে তাহার তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। সেই সহজ অনুভবকে আমরা যদি গুরু পুরোহিত মোল্লা পয়গম্বর ইত্যাদির ব্যাখ্যা দিয়া এবং শাস্ত্রের নির্দেশ-অনুসারে বুঝিতে চাই, তবে তো তাহা পরের মুখে রসাস্বাদ করা হইল, তাহাতে আমার নিজের পরিতৃপ্তি কোথায়? অতএব গুরু মোল্লা কোরান পুরাণ সব মাথায় থাকুন, আমার হৃদয়েশ্বরের সহিত কেবল আমারই প্রেমের যোগ যথেষ্ট।

এই রূপক ব্যাখ্যা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে 'পূরবী' কাব্যের 'লিপি' নামক কবিতা এবং Robert Browning-এর 'Fears and Scruples' নামক কবিতা দ্রষ্টব্য।

তুলনীয়—

ফজরমে জব্ আয়া রজচী
পুশাক সুনহলী তেরী।
মক-ভর জব্ খাস লাগায়া,
চিত জায়গা মেরী ॥
প্রেমে হম্‌কো কিয়া উদাসা,
ক্যা পীড় দুর সময়া।
গায়া গেরুয়া সুর মগরবী,
মরণ সা রৈন আয়া ॥
কাগজ কালা হরফ উজালা
ক্যা ভারী খত পায়া।

ইতী রৌনক কৌ রে কাচী,
তুহি যাদ ভুলায়া ॥
থলক্ থলক্-মেঁ থত হৈ কৈলী,
যথ্‌রুর হম্ করমান্ ॥
—জ্ঞানদাস বধেলী

'সকালবেলা যখন আসিলে, হে দূত, পোশাক তোমার সোনালি। একটুকু যখন গন্ধের নিঃশ্বাস লাগাইলে, চিত্ত জাগাইয়া তুলিলে আমার। রবিরশ্মিতে আমাকে করিল উদাস, কী পীড়া দূর অন্তরে প্রবেশ করিল। গাহিল গেরুয়া সুর—বৈরাগ্যের সুর—পশ্চিম দিক্, মরণের ন্যায় রজনী আসিল। কাগজ কালো, হরফ উজ্জ্বল, কী সুন্দর লিপি পাইলাম। এত জাঁকজমক কেন রে দূত, তুমিই যে স্মৃতিবিভ্রম ঘটাইলে!' দূত উত্তর দিতেছেন—'ভারী উজ্জ্বল সভা, বিরাট্ উৎসব, তুমিই একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি। বিশ্বচরাচরে এই লিপি প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, গর্বিত আমি এই বার্তাবহ বলিয়া!'

উৎসর্গ—২ নম্বর

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া

মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম বিভাগ হইতেছে 'যাত্রা' এই কবিতাটি সেই 'যাত্রা'-বিভাগের প্রবেশক ছিল।

কবি তাঁহার কাব্যজীবনে যাত্রা করিতেছেন। এই যাত্রার আরম্ভ অত্যন্ত শুভ-সূচনা করিতেছে, কিন্তু চিরকাল যদি ইহা শুভকর নাও হয় তথাপি তিনি সমস্ত নিরাশা ও অনাদর অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র জীবনদেবতার নির্দেশ-অনুসারে চলিবেন, এবং নিজের জীবনের বিফলতার জন্য কাহারও কাছে কোনো অভিযোগ করিবেন না।

উৎসর্গ—৬ নম্বর

তোমার চিনি ব'লে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে।

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'সোনার তরী' বিভাগের প্রবেশক ছিল।

ভুবন-সুন্দর অখিল রসামৃত-মূর্তি যিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—আমি আমার রচনার মধ্য দিয়া তোমাকে লোক সমাজে প্রকাশ করিবার অনেক প্রয়াস করিয়াছি। সেইজন্য লোকে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি যাহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছি সে কে। কিন্তু তুমি তো অনির্বচনীয়, তোমার পরিচয় আমি কেমন করিয়া দিব? আমার অক্ষমতা দেখিয়া লোকে আমাকে দোষী করে, আর তুমি তাহা দেখিয়া হাস্য করো যে আমার দোষ কি, আমি কেমন করিয়া ভুবন-সুন্দরকে অখিল-রসামৃত মূর্তিকে লোকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে পারিব।

আমি তোমাকে প্রকাশ করিবার জন্য যত ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছি, তাহার দ্বারা তোমার কতটুকু পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছি? তোমার অসীম অনন্ত রহস্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে আমি তো পারি নাই। কাজেই আমার রচনার মধ্যে একটি অস্পষ্ট আভাস মাত্র দিতে পারিয়াছি। লোকে তাহার স্পষ্ট অর্থ ধরিতে না পারিয়া আমাকে উপহাস করে। কিন্তু তুমি তো আমার প্রয়াসের মূল্য জানো, তাই তুমি লোকের দূষণ দেখিয়া হাস্য করো।

তোমাকে চিনি বলাও যেমন যায় না, তেমনি তোমাকে চিনি নাই বলাও যায় না। তোমাকে তো আমি ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বশোভার মধ্যে দেখিয়াছি, এবং তোমার সেই অপরূপ আবির্ভাবকে কথার বন্ধনে ও গানের সুরে ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছি, কত কত নব নব সুন্দর সুন্দর ছন্দ রচনা করিয়া তোমাকে অলঙ্কারের বন্ধনে ধরিতে চাহিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে ধরা দিলে কি না সে-সম্বন্ধে সংশয় তো ঘোচে না! যে দূরাপনা, যে অ-ধরা, তাহাকে ধরিব কেমন করিয়া? অতএব—

কাজ নাই, তুমি যা খুশী তা করো,
ধরা নাই দাও, মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি, প্রাণ উঠে যেন
পুলকি' !

উৎসর্গ—১৩ নম্বর

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি।

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'জীবনদেবতা'-বিভাগের

প্রবেশক। এই কবিতাটির সহিত মানসীর 'অনন্ত প্রেম' কবিতার বিশেষ ভাব-সাদৃশ্য আছে। এই কবিতা সম্বন্ধে স্বয়ং কবি বলিয়াছেন—

যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি আমার কাব্যে জীবনদেবতা নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া, বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি, জানি অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন,—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎস্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেই জন্য এত বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না। —আত্মপরিচয়

তাই কবি নিজেকে নির্লিপ্ত হইয়া সংসার-লীলা দেখিয়া বিশ্ববিধানের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে বলিতেছেন।

উৎসর্গ—১৫ নম্বর

আকাশ-সিন্ধু-মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে,—
জগৎ-ঘূর্ণী জেগেছে!

ইহা মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলী 'প্রেম'-নামক বিভাগের প্রবেশক কবিতা।

কবি বলিতেছেন যে জগৎ গতিশীল, সমস্ত সৃষ্টি চক্রাবর্তে কুণ্ডলী আকারে ঘূর্ণিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু চক্রের নেমিই ঘোরে, তাহার নাভি ও ধুরার মধ্য-বিন্দু স্থির হইয়া থাকে। সৃষ্টির সেই মধ্যবিন্দু হইতেছে জগৎ-লক্ষ্মীর আসন-শতদল। যিনি সকল সুন্দরের সৌন্দর্যরূপিণী, যিনি উর্বশী, তিনি অচপল অপরিবর্তনীয়, তাঁহার প্রকাশ প্রেমে। জগতের সব কিছু অনিত্য, কেবল প্রেমই নিত্য পদার্থ, তাহারই দ্বারা অসীমের আভাস মনে সঞ্চারিত হয়। প্রেমে প্রশান্তি, প্রেমেই কল্যাণ।

প্রেম যে অবিনাশী তাহা কবি তাঁহার 'শাজাহান' কবিতায় বলিয়াছেন, ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

উৎসর্গ—১৮ নম্বর

তোমার বীণায় কত তার আছে।

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণের গ্রন্থাবলীতে 'প্রকৃতিগাথা' বিভাগের প্রবেশক ছিল।

কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য মাধুর্য বৈচিত্র্য হইতে নিজের কাব্যপ্রেরণা লাভ করেন, এবং প্রকৃতির সুরের সঙ্গে নিজের সুর মিলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃতি যেমন এক দিকে কবিকে অনুপ্রেরণা দান করেন, অপর দিকে কবি তেমনি আবার প্রকৃতিকে নিজের বর্ণনার দ্বারা সুন্দরতর ও সুস্পষ্টতর করিয়া পরিব্যক্ত করেন। কবি প্রকৃতিকে বলিতেছেন—তোমার বীণার সঙ্গে আমার মনোবীণার সুর মিলাইয়া লইব; আমার হৃদয়-দীপ জ্বালিয়া আমি তোমার যে আরতি করিব, সেই আলোকের দীপ্তি তোমার মুখে পড়িয়া তোমার মুখ উজ্জ্বল ও প্রসন্ন করিয়া তুলিবে।

উৎসর্গ—১৯ নম্বর

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহদুয়ারে—

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'লোকালয়' বিভাগের প্রবেশক।

বিশ্বেশ্বর কবিকে তাঁহার বিশ্বভবনের সিংহদুয়ারে বাঁশী বাজাইবার ভার দিয়া পাঠাইয়াছেন। কবি সমস্ত মানবের মুখপাত্র হইয়া সকলের মনের কথা বলিবার ভার পাইয়াছেন—বিশ্বভুবনেশ্বর তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা।

কবিও সেই আদেশ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে,
সুরের ভিতর লুকাইয়া কহি তাহারে।

যাহারা সাধারণ লোক, যাহারা সংসার-হাটে কেবল বোঝা বহিয়া চলে,

যাহারা বিশ্বশোভার দিকে দৃকপাত করিবার মতো মন ও অবসর পায় নাই, তাহারা কবির বাঁশীর সুর শুনিয়া বোঝা ফেলিয়া হাটের কথা ভুলিয়া সেই গান শুনিতে বসে। তাহাদের তখন চেতনা হয়, তাহারা ভাবে—আমাদের জন্যই তো ফুল ফুটিতেছে, পাখী গাহিতেছে, জগতে আনন্দমেলা বসিয়াছে।

কবি এই আনন্দ-বার্তা বহন করিয়া লোকালয়ের দ্বারে দ্বারে বিরামহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে চাহেন। যাহারা নিজেরা নিজেদের মনোভাব পরিব্যক্ত করিতে পারে না, তাহাদের সকলের হইয়া কবি সুখ-দুঃখ-আনন্দ-সৌন্দর্যবোধ প্রণয়কথা প্রকাশ করিয়া চলিবেন। কবি হইতেছেন সত্য-শিব-সৌন্দর্যের আনন্দ-দূত।

উৎসর্গ—২০ নম্বর

দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'কবিকথা' বিভাগের প্রবেশক। এই কবিতায় কবি তাঁহার আরাধ্যা জীবনদেবতা বা সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির কাছে কবি নিজেকে সমর্পণ করিয়া কেবল আনন্দের রসে সৌন্দর্যের সাধনা করিতে চাহেন। এই কবিতার সহিত 'চিত্রা' পুস্তকের 'আবেদন' কবিতার ভাব-সাদৃশ্য আছে। 'আবেদন' কবিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

উৎসর্গ—৪০ নম্বর

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।

মহাকবি সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন—

All the world's a stage,
And all the men and women merely players :
They have their exits and entrances ;
And one man in his time plays many parts
His acts being seven ages.

—*Merchant of Venice, As You Like It,* Act II, Scene, VII
Act I, Sc. I

আমাদের মহাকবি রবীন্দ্রনাথও বলিতেছেন যে, এই বিশ্বসংসারে মানবেরা সব নট ও নটী মাত্র। বিশ্বসংসার তাহাদের রঙ্গমঞ্চ, তাহারা বিধাতার রচিত বিশ্বনাট্যের অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। কবি নিজেও একজন অভিনেতা। যে তন্ময় হইয়া অভিনয় করে, সে অনেক সময় ভুলিয়া যায় যে সে অভিনয় করিতেছে, অভিনীত বিষয় তাহার কাছে তখন সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু যাহারা দর্শকমাত্র, যাহারা নির্লিপ্তভাবে কেবল অভিনয় দেখিতেছে, তাহারা সমস্ত অভিনয়কে অভিনয় বলিয়া বুঝিতে পারে, এবং অভিনয়ের বিষয়ের তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাই কবি নিজেকে সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারলীলা দেখিয়া বিশ্ববিধানের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে বলিতেছেন। এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্য-গ্রন্থাবলীর 'নাট্য'-বিভাগের প্রবেশক ছিল।

———

উৎসর্গ—৪৪ নম্বর

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো ওগো সেই ভালো।

ইহা মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'হতভাগ্য' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। জগতে মানুষ পদে পদে নিরাশ হয়, কত বিপদে পড়ে। কবি বলিতেছেন যে, যত বড়ই বিপদ ও লাঞ্ছনা হউক না কেন, তাহার কাছে নত হইয়া পরাজয় স্বীকার করা মনুষ্যত্বের অপমান। অতএব —

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

মানুষকে বিধাতার বিধান মঙ্গলময় বলিয়া মানিয়া লইয়া স্ব-শক্তিতে সকল আঘাত সহ্য করিয়া অজেয়ভাবে জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইতে হইবে।

উৎসর্গ—৪৬ নম্বর

সাঙ্গ হয়েছে রণ

ইহা মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীতে 'নারী'-বিভাগের প্রবেশক ছিল। কবি বলিতেছেন যে, পুরুষ জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়া অনেক উপকরণ কেবল সংগ্রহই করে, কিন্তু সেইসব উপকরণকে যথাবিন্যস্ত করিয়া সুন্দর

শোভন করিতে পারে একমাত্র নারী। পুরুষের রণক্ষত নিজের করুণাধারায় ধৌত করিয়া কেবল নারীই পুরুষের রণক্লান্তি অপনোদন করিতে পারে। নারী পুরুষের গৃহিণী সেবিকা কল্যাণদায়িনী প্রণয়িনী। নারী পবিত্র নির্মল মঙ্গলময়ী। জীবননাট্যের শেষে পুরুষের যখন সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইবার সময় আসে তখন নারীই তাহাকে চোখের জলে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় দেয়, এবং মরণান্তকালেও সেই নারী পুরুষের স্মৃতি বক্ষে বহন করিয়া বিধবাবেশে অশ্রুধারা সেচন করিয়া পুরুষের তর্পণ করে।

আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জ্বেলেছিনু যতগুলি—

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'নিষ্ক্রমণ' বিভাগের প্রবেশক, কিন্তু ইহা 'উৎসর্গে' স্থান পায় নাই কেন জানি না।

কবি অন্ধকার রজনীতে কৃত্রিম আলোক জ্বালিয়া ক্ষুদ্র গৃহ উজ্জ্বল করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু দিবসের আগমনে তিনি দেখিলেন যে বাহিরে আলোকের বন্যাপ্রবাহ বহিয়া চলিতেছে। তাই তিনি রজনীর দীপ নিভাইয়া বাহিরে বৃহৎ উন্মুক্ত ক্ষেত্রে আসিতে চাহিতেছেন, নিজের সঙ্কীর্ণ মানস-ক্ষেত্রে তিনি যে ছিন্নতন্ত্রী বীণা বাজাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা ফেলিয়া সমস্ত বিশ্বচরাচরের সুরে সুর মিলাইতে চাহিতেছেন।

খেয়া

পুস্তক-প্রকাশের তারিখ পুস্তকের পরিচয়পত্রে নাই। কবি যে উৎসর্গ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে তারিখ আছে ১৮ই আষাঢ় ১৩১৩। ইহার অধিকাংশ কবিতাই শান্তিনিকেতনে কবির যে বাড়ী আমাদের কাছে 'টং' নামে পরিচিত ছিল ও পরে যাহার নাম হইয়াছে 'দেহলী'—সেই ছোট বাড়ীতে বসিয়া লেখা। কবিতাগুলি অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত।

এই কাব্যখানি একটি কবিতা—'কোকিল'—ছাড়া আর সমস্ত কবিতাই ভগবৎ-অনুভূতি অথবা ভগবৎ-ভক্তির কথা। যে ভগবৎ-অনুভূতি 'নৈবেদ্যে'র কবিতার মধ্যে বুদ্ধির ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিল, তাহা এই 'খেয়া'র কবিতায় হৃদয়ের ক্ষেত্রে এবং ভক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ইহার পরিণতি পরে দেখিতে পাওয়া যায় গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গিতালির কবিতায় ও গানে।

এই পুস্তকের সমালোচনা ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহাতে সমালোচক এই বই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

সমালোচ্য কবিতাগুলি যে সকলের কাছে তেমন স্পষ্ট হইবে না, কবি তাহা নিজেই বুঝিয়াছেন; এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই উৎসর্গপত্রে এই কাব্যকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

যত্ন ভরে খুঁজে খুঁজে তোমায় নিতে হবে বুঝে;
ভেঙে দিতে হবে যে তার নীরব ব্যাকুলতা!

…ঠিক 'পারের ঘাটের কিনারায়' না আসুন, কিন্তু 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে' অথবা 'দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্বলল না', তাঁহারা এই কাব্যের রস বেশী অনুভব করিতে পারিবেন। যাহাদের তরী অনেকের তরীর সঙ্গে একত্র ছিল, এক বন্দরে অনেক কাল ছিল, তাহারা যখন দেখিবে যে এখন কত তরী অস্তাচলে তীরের তলে, ঘন গাছের কোল ঘেঁষে, ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়, তাহাদের প্রাণে একটু বেশী রকম বাধিবে। যাহাদের 'শেষ হ'য়ে গেছে জলভরা আজ', তাহারাই 'ঘাটের পথ' তাকাইয়া কাঁদিবে।

এই কাব্যের মধ্যে যে একটি বিশেষ রস আছে তাহা অতি মধুর, হৃদয়গ্রাহী। কবির ভক্তির মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য নাই, অথচ অনুভূতি আছে গভীর। সেই জন্য এই কবিতাগুলি মনকে মুগ্ধ করে।

আধ্যাত্মিক রসবোধের প্রকাশ কবির যে যে কাব্যে হইয়াছে তাহাদের সকলের মধ্যে কবিত্ব-হিসাবে 'খেয়া' কাব্যই শ্রেষ্ঠ। ইহার লিরিক রূপটি অন্য সমস্ত কাব্য হইতে ইহাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' 'গান' 'নৈবেদ্য' তত্ত্ব, কিন্তু 'খেয়া' কবিতা এবং উচ্চশ্রেণীর কবিতা। ইহার মধ্যেই কবির গূঢ়বাদ বা মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। এই জন্য অনেকের মতে—

খেয়া এক অপূর্ব কাব্য। নৈবেদ্যে যা তত্ত্ব ও ভাবরূপে অভিব্যক্ত হয়েছিল, সেই ভগবৎপ্রেম ও ভগবানের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা খেয়ায় বিচিত্র রসমাধুর্যে পরিণত হয়েছে। ক্ষণিকায় দেখেছি কবির চিত্তে পরমসুন্দরের প্রতি অনুরাগ জেগে উঠেছে। নৈবেদ্যে দেখেছি, তিনি যে তাঁরই এ প্রত্যয় কবির ভিতর দৃঢ় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখি খেয়াতে। বৈষ্ণব কবির রাধার প্রতীক্ষার চাইতে এক হিসাবে নিবিড়তর এই খেয়ার প্রতীক্ষা।

—রবীন্দ্রকাব্যপাঠ

রবীন্দ্রনাথ কর্মকে অতিক্রম করিয়া জীবনকে অন্তরের আনন্দময় রসসমুদ্রে বিলীন করিয়া দিবার জন্য এই খেয়ার ঘাটে উপনীত হইয়াছেন। কবি 'সব পেয়েছির দেশে' তাঁহার কুটীর বাঁধিতে চলিয়াছেন। 'নৈবেদ্যে' কবির নিকটে ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ প্রকাশিত—সেখানে ভগবান্‌ কবির প্রভু দেবতা স্বামী। খেয়ায় ভগবান্‌ কবির কাছে বর, ভিখারী। এখন প্রকৃতি বিশ্বেশ্বরের লীলার ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমের ক্ষেত্র।

রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যখানি তাঁহার বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন। জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতী লতার গায়ে তড়িৎ স্পর্শ করাইয়া প্রমাণ করেন যে আপাত-প্রতীয়মান জড়ধর্মী উদ্‌ভিদের মধ্যেও প্রাণচৈতন্য আছে। তাই কবি নিজের কবিতা-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা!

বাস্তবিক প্রত্যেক কবির কাব্যই লজ্জাবতী লতার মতন, বিশ্বানুভবের ভিতর দিয়া কবি যাহা চিত্তে আহরণ করেন তাহাই সেই লতার পত্রে পুষ্পে রঙে গন্ধে রসে বৈচিত্র্যে পরিণত হয়। যিনি পাঠক তিনি যদি দরদ দিয়া উহার মর্মকথা বুঝিতে চেষ্টা করেন তবেই উহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়। তাই কবি বন্ধু-পাঠককে বলিতেছেন—

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ-পরশ
হরষ দিয়ে দাও,—
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মম পানে চাও
.. ..
তুমি জানো ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

'খেয়া'র কবিতাগুলিতে গূঢ়বাদ থাকাতে অনেকগুলি কবিতা রূপক হইয়া উঠিয়াছে।

শেষ খেয়া

এই কবিতাটি ১৩১২ সালের আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে ১৪২ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অন্তর্নিহিত ভাব

কবি ভগবানের চরণে তাঁহার আকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন—আমি এত-দিন সংসারে যে সব কাজের নেশায় মত্ত ছিলাম, আমার সে নেশা কাটিয়া গিয়াছে। হে ভগবান্, আজ আমি তোমার চরণে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু তোমাকে পাইতে হইলে আমাকে এই বাসনাসঙ্কুল জীবনের পরপারে যাইতে হইবে। কিন্তু হায়, আমি তো সে পথ চিনি না। ইহার আগে যে-সব মনীষী পরলোকের—বাসনার পরপারের—পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ যদি দয়া করিয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া যান, তাহা হইলে হয়তো আমি যাইতে পারি। কিন্তু তোমার দয়া ভিন্ন সেই উপায়ও পাওয়া দুষ্কর। সংসারের আশা উদ্যম সব আমার ফুরাইয়া গিয়াছে; এখন সংসার আমার কাছে একটা বিরাট্ অন্ধকার কারাগার বলিয়া মনে হইতেছে; আমি আর এই অন্ধকারে থাকিতে চাই না। আমায় লইয়া চলো, হে প্রভু, তোমার চির-আলোকের রাজ্যে,—প্রভু, লইয়া চলো আমার হাত ধরিয়া।

প্রথম কলি

ঘুমের দেশ পরলোক। মানুষ যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন তাহার মনে হিংসা দ্বেষ প্রীতি অনুরাগ বাসনা বৈরাগ্য প্রভৃতি কোনো চিন্তাই থাকে না;

সাংসারিক কাজের ব্যস্ততা, সফলতার আনন্দ, বিফলতার দুঃখ প্রভৃতি কোনো উদ্বেগ থাকে না ; একটা শান্ত স্থির নির্বিকার ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকে ; কবির কল্পিত পরলোকও সেইরূপ—সেখানে কোন চিন্তা নাই, শোক নাই, আনন্দ নাই, উদ্বেগ নাই। আছে কেবল অনাবিল শান্তি ও বিপুল বিরতি।

এখানে কবি তাঁহার হৃদয়ের পরলোক-বিষয়ক চিন্তাকে প্রাণ-মাতানো সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আমরা যখন মধুর কণ্ঠে মধুরভাবপূর্ণ গান শুনি, তখন আমরা আত্মহারা হইয়া নিজের নিজের কর্তব্যের কথা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। কবির মনে পরলোকের চিন্তা জাগিয়াছে, সেই চিন্তায় তাঁহার সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহলোকের কাজ তাঁহার আর ভালো লাগিতেছে না। তাই তিনি বলিতেছেন—আজ পরলোকের চিন্তা আমাকে আমার আরব্ধ যাবতীয় সাংসারিক কাজ হইতে বিরত করিতেছে।

দিনের শেষে কাজ-ভাঙানো গান আমার জীবনের গণনা-করা দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। আজ কর্মব্যস্ত জগতের কোলাহল ভেদ করিয়া শান্ত স্থির এক সঙ্গীতের ধারা পরলোক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে এবং আমার শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিতেছে। কী প্রাণস্পর্শী কী মধুর সেই সঙ্গীত! সেই সঙ্গীত শুনিয়া আমি সকল কাজ—যাহাতে এতদিন লিপ্ত ছিলাম সেইসব কাজ—ভুলিয়া গিয়াছি।

দ্বিতীয় কলি

আমি দেখিতেছি সংসারের কর্তব্য যথাযথ সমাপন করিয়া জীবন-সায়াহ্নে দুই-একজন করিয়া অনেক মহাপুরুষ পরলোকের পথে চলিয়াছেন। তাঁহাদের গতি কী দ্রুত, কেমন বাধাহীন। এই মহাপুরুষগণের মধ্যে হয়তো অনেকেই আমার স্বদেশবাসী, এমন কি আমার আত্মীয়, আমার স্বজন, এবং আমারই সমানধর্মা আছেন! কিন্তু আমি তো দূর হইতে তাঁহাদের চিনিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এরূপ সহজে স্বচ্ছন্দে অবাধ গতিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহাও তো আমার চিন্তায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতেছে না। হে ভগবান্, তুমি এসো, আমার জীবনের শেষক্ষণে তুমি আমাকে তোমার করুণার রাজ্যে লইয়া চলো।

তৃতীয় কলি

যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে। আমি পথের মাঝে পড়িয়া আছি। আমাকে কে আশ্রয় দিবে? আমি আমার ক্ষমতা প্রতিপত্তি বৃথা

নষ্ট করিয়াছি। এখন তাহার জন্য দুঃখ করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে—নিজের দোষেই যাহা হারাইয়াছি তাহার জন্য কাহার কাছে নালিশ করিব? আমার আশা উদ্যম সব ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু হায়, শক্তি তো পাইলাম না। আজ তাই নিরুপায় হইয়া পথে বসিয়া আছি। হে ভগবান্, আমাকে দয়া করিয়া তুমিই লইয়া চলো।

যাহাদের প্রাণে উদ্যম, দেহে শক্তি এবং হৃদয়ে আশা আছে, তাহারা আনন্দে উৎসাহে সংসারের কাজে আপনাদিগকে লিপ্ত রাখিয়াছে; আর যাহারা ভগবানের করুণার দান তাহাদের শক্তি উদ্যম প্রতিভা প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের পরলোকগমনের পথ নিষ্কণ্টক; তাই তাহারা অবাধে জীবনের পরপারে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সংসারের কর্তব্য সাধন করিবারমতন যাহার সাহস উদ্যম ভরসা কিছুই নাই— ভগবানের করুণার দান যে অপচয় করিয়াছে—সংসারে তাহার আর স্থান কোথায়? নির্বিঘ্নে পরলোকে যাইবার মতো সম্বলও তাহার কিছুই নাই। আমার অবস্থা আজ সেই রকম হইয়াছে—আমি না পারিতেছি কেবলমাত্র সাংসারিকতা বৈষয়িকতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিশ্চিন্ত মোহে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে, আর না পারিতেছি পরলোকের উপযোগী আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিতে—সংসার ও পরলোক এই উভয় লোক হইতেই আমি বঞ্চিত। হে ভগবান্, 'তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার!—আমার কেহ নাই বা কোনো সম্বল এবং অবলম্বনও নাই।

গাছে যখন ফুল ফোটে তখন গাছের এক অপরূপ শোভা হয়। সেই শোভা দেখিয়া সকলের নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু ফুলই গাছের চরম পরিণতি নয়, ফলই বৃক্ষ-জীবনের সার্থকতা। যে গাছের ফুলগুলি বৃথা ঝরিয়া পড়িয়া না গিয়া গাছকে ফলসম্ভারে পরিপূর্ণ ও গৌরবান্বিত করে, সেই বৃক্ষের জীবন সার্থক। কবি এখানে নিজেকে ঝরা ফুল ও ফলহীন গাছের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন—তিনি বলিতেছেন—আমাতে যে-সব ফুল ফুটিয়াছিল, অর্থাৎ ভগবান্ দয়া করিয়া আমাতে যে-সব সদ্‌গুণ সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেগুলি বৃথা ঝরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যে ভাবে সেই গুণগুলির পরিচালনা ও অনুশীলন করিলে আমার জীবন সফল ও সার্থক হইত তাহা না করিয়া বৃথা কাজে সেগুলিকে নষ্ট করিয়াছি। কাজেই সাফল্যের গৌরব আমার নাই। তাই আজ নিজের দোষে যে জীবন নিষ্ফল হইয়া গেল সেই জীবনের জন্য কাঁদিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। আমি যে মূঢ়ের মতন নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছি।

প্রভাতে যখন সূর্যালোকে জগৎ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে তখন লোকের কর্মশক্তি বিকাশ পায়। আবার রাত্রে যখন জগৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় তখন সেই শক্তি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। তৎসত্ত্বেও লোকে রাত্রিতে আলো জালিয়া কৃত্রিম উপায়ে শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া তাহাদের কর্তব্য সমাধান করে। ইহাই হইল জগতের সাধারণ নিয়ম। কবিগণ মানবের বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যকে যথাক্রমে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বাল্যে ও যৌবনে মানবের চিত্ত নানা আশায় নানা সুখকর কল্পনায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; সেই আশা ও কল্পনা হইতে মানবের উৎসাহ-শক্তির বিকাশ হয়। তাই আশামুগ্ধ মানব সোৎসাহে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই আশা-উৎসাহের অবসান হয় বার্ধক্যে উপনীত হইলে।

কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হইলেই যে সকলেই নিরাশ হইয়া পড়েন তাহা নহে। যাঁহারা ধর্মপ্রাণ, সাংসারিক জীবনে যাঁহারা ধর্মপথে থাকিয়া যথাযথ ভাবে কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে পরলোক সুন্দর-রূপে প্রতিভাত হয়। তখন তাঁহারা পরলোকের সুখের আশায়, ভগবানের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইবার আনন্দে পূর্ণ হইয়া সংসারের অতীত সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যের কথাকে তুচ্ছ মনে করেন। বোধ হয়, সাংসারিক নৈরাশ্য তাঁহাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করিতে পারে না।

কবি বার্ধক্যে উপনীত হইয়া ভাবিতেছেন এখন আর তাঁহার যৌবনের আশা-উৎসাহ নাই; তাঁহার দিনের আলো—অর্থাৎ জীবনের আশা-উৎসাহ—ফুরাইল, সাঁঝের আলো—অর্থাৎ পরলোকের সৌন্দর্য—তাঁহার জন্য জলিল না—অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; ইহলোকের শক্তি আশা তিনি হারাইয়াছেন, পরলোক হইতেও কোনো আধ্যাত্মিক সমর্থন বা আশার আলোক আসিয়া তাঁহার মনে লাগিতেছে না; তাই নিরাশ হইয়া ঘাটে—জীবনের প্রান্তে—তিনি বসিয়া পড়িয়া আর্তস্বরে আহ্বান করিতেছেন—

ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

শুভক্ষণ ও ত্যাগ

এই কবিতা দুইটি ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গদর্শনের ৩৮৩-৩৮৪ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

যখন কোনো মহৎ কর্মের বা মহৎ ভাবের শুভ আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে বরণ করিয়া লওয়া একান্ত কর্তব্য; আমার যথাসাধ্য সাহায্য ও সমর্থনের দ্বারা উহাকে সংবর্ধনা করিতে হইবে। আমরা সাহায্য যদি সামান্য ও নগণ্য হয়, আমার নাম যদি কেহ নাও জানিতে পারে, এবং ইতিহাসে যদি আমার নাম নাই থাকে, তথাপি সেই শুভক্ষণকে সমাদর করিতে অবহেলা করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না। আমার এই ফলাফল-বিবেচনাহীন ত্যাগের জন্য সাংসারিক বুদ্ধিমান্ সাবধানী বিবেচক লোকে আশ্চর্য হইবে তো হউক, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়াই আমাকে আমার কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে।

রাজার দুলালের যাত্রাপথে আমার বক্ষের মণিহার খুলিয়া উপহার দিতে হইবে। সেই চুনীর হার আমার বুকের রক্তবিন্দুগুলির মতো ধূলায় পড়িয়া থাকিবে এবং রাজার দুলালের রথের চাকায় গুঁড়া হইয়া একটি রক্তরেখা আঁকিয়া দিবে। কেহ হয়তো লক্ষ্যই করিবে না যে, কে কী মহামূল্য নিধি ত্যাগ করিল এবং কাহার উদ্দেশেই বা ত্যাগ করিল।

আমাদের ক্ষণিক-জীবন এবং চির-জীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হ'য়ে আছে। আমাদের ক্ষণিক-জীবনই সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আমাদের চির-জীবন সেই সুখ-দুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। গাছের ক্ষণিক-জীবন কেবল রৌদ্র ভোগ করছে, আর গাছের চির-জীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে।

আমরা যখন খুব বড় রকমের একটা আত্মবিসর্জন করি, তখন কেন করি? একটা মহৎ আবেগে আমাদের ক্ষণিক-জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, তার সুখ-দুখ আমাদের আর স্পর্শ করতে পারে না; আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের চেয়ে বড়, আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের এই পরিহার, এই আমাদের ক্ষণিক-জীবনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু আমাদের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন আমরা আমাদের ক্ষণিক-জীবনটাকে পরাভূত ক'রেই আনন্দ পাই, দুঃখকে গলার হার ক'রে নিয়েই মনে উল্লাস জন্মায়।—ছিন্নপত্র, বোয়ালিয়া, ২৪।২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সাল।

'কৃপণ' কবিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

যখন আমরা নিছক সুখ ভোগ করিতে থাকি তখন আমাদের মনের একার্থ-অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা কিছুর জন্যে দুঃখ ভোগ এবং ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছা করে, নইলে

আপনাকে অযোগ্য ব'লে মনে হয়—এই কারণেই যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত সেই সুখই স্থায়ী সুগভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধন হয়।

—ছিন্নপত্র (পতিসর, ৩০-এ মার্চ, ১৮০৪), ২৫৬ পৃষ্ঠা

যখন কবির চিত্ত দেশের দুর্দশায় দুর্দিনে রাজনৈতিক সামাজিক ধর্ম-সম্বন্ধীয় দুর্গতিতে পীড়িত হইতেছিল, যখন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার ডাক তাঁহার জীবনকে দোটানায় ফেলিয়াছিল সেই সময়ের মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই দুইটি কবিতায়।

তুলনীয়—'পূরবী' কাব্যে 'দান' কবিতা

আগমন

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে।

সত্য-শিব-সুন্দর-রূপী ভগবানকে যদি আমরা স্বীকার না করি তবে তিনি রুদ্র-রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য করান। সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ নিরন্তর হইতেছে, কিন্তু আমরা মোহ-বশত তাহা অস্বীকার করি, অথবা লক্ষ্য না করিয়া নিশ্চেতন থাকি।

দুঃখ-রাতের রাজা যখন আসিলেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য কোনো আয়োজনই হয় নাই আমার; দরিদ্র-ঘরে যাহা সামান্য কিছু ছিল তাহা দিয়াই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইল। ইহা ভালোই হইল, ইহাতেই ত্যাগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল,—ইহা তো ধনীর ভোগোদ্বৃত্ত সামান্য-কিছু দান করা হইল না, ইহা দরিদ্রের সর্বস্ব-সমর্পণ হইল।

খেয়াতে 'আগমন' ব'লে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন, তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ ক'রে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল, তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

—আমার ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী—পৌষ, ১৩২৪, ৩৯৬ পৃষ্ঠা

তুলনীয়—

যে রাতে মোর দুয়ার গুলি
ভাঙল ঝড়ে,

জানি নাই তো তুমি এলে
আমার ঘরে।

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি? —গীতিমাল্য

Watch ye therefore : for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock-crowing, or in the morning :

Lest coming suddenly he finds you sleeping,
And what I say unto you I say unto all,......Watch !

—The Bible, St Mark, 13, 35-37

Be ye therefore ready also : for the Son of Man cometh at an hour when ye think not.—*Idid*, St. Luke, 12. 40.

'পূরবী' কাব্যে 'অন্তর্হিতা' কবিতা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

দান

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে।

যাহারা দীনাত্মা তাহারা ভগবানের কাছে কেবল সুখই ভিক্ষা করে; কিন্তু ভগবান্ তো কেবল সুখদাতা নহেন, তিনি শিব বলিয়াই রুদ্র; তিনি তো কেবল ভয়ত্রাতা নহেন, তিনি মহদ্‌ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্। যাঁহারা সত্যকে ও কল্যাণকে চাহিয়াছেন, তাঁহারা রুদ্র-রূপকে ভয় করেন নাই—যেমন সক্রেটিস, গ্যালিলিও, ক্রাইষ্ট্, মহম্মদ, গান্ধী। ইঁহারা সত্যের জন্য প্রাণ দিয়াছেন অথবা দুসঃহ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তবু সত্যস্বরূপ কল্যাণকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

আমি চাহিয়াছিলাম প্রিয়ের গলার ফুলের মালা, অর্থাৎ শান্তি, কিন্তু সেই প্রিয়ের হাত হইতে পাইলাম ভীষণ তরবারি, অর্থাৎ দারুণ অশান্তি। শান্তি যে বন্ধন ও জড়তা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়, যদি সেই শান্তি তাহাকে অশান্তির ভিতর দিয়া দুঃখের মূল্য দিয়া অর্জন করা না যায়। কিন্তু এই অশান্তি হইতেছে মাঝের কথা, ইহা চরম কথা নয়; চরম কথাটা হইতেছে—শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। চরম ও পরম সত্য হইতেছে রুদ্রের প্রসন্ন মুখ। কিন্তু সেই প্রসন্নতা পাইতে হইলে প্রথমে রুদ্রের স্পর্শ পাইতে হইবে।

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান্।

অতএব সুকঠিন ত্যাগের সাধনাই জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে।

ভগবান্ যে আমাদিগকে দুঃখ-বহনের অধিকার দান করেন তাহা আমাদের পক্ষে মহা সম্মান। সেই বেদনার মান বক্ষে বহন করিয়া তাঁহার দানের ও দয়ার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

তুলনীয়—

My bridegroom's bed is cold and hard.
　　My bridegroom's kiss is ice and fire.
My bridegroom's clasp is iron-barred,
　　I am consumed in His desire:
My bridegroom's touch is as a sword
　　That pierces every nerve and limb;
'Depart from me,' I mean, 'O Lord!'
　　All the night long I spend with Him.

—Harriet Eleanor Hamilton-King.
The Bride Reluctant.

বালিকা বধূ

ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালের মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে।

অনেক দেশের অনেক সাধক ও কবি মনে করিয়াছেন যে ভগবান্ তাঁহাদের স্বামী এবং তাঁহারা ভগবানের বধূ। ভগবান্‌কে বর-রূপে এবং মানবকে বধূ-রূপে বোধ করা বৈষ্ণব ভাব। বৈষ্ণবেরা মনে করেন যে বিশ্ব-বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ আছেন শ্রীকৃষ্ণ, আর সমস্ত জীব হইতেছে গোপী। (তুলনীয়, মীরাবাঈ এবং জীব গোস্বামীর সাক্ষাতের কাহিনী।) বাইবেলের মধ্যে সলোমনের গান, ডেভিডের স্তুতি, এবং অন্যান্য ক্রিশ্চান মিষ্টিক্‌দের রচনা এবং মুসলমান সুফী কবি হাফিজ প্রভৃতির রচনা এই ভাবে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিতেছেন যে বিরাট্ পুরুষের পার্শ্বে তাঁহার নিজের চিত্ত বালিকা বধূরই মতো দাঁড়াইয়া আছে; সেই পুরুষ যে কত বড়, কী যে তাঁহার মহিমা, অবোধ বালিকার মতনই কবি-হৃদয় সেই তত্ত্বের সন্ধান পুরাপুরি পায় নাই। তবু তাঁহার সঙ্গে কবির যে একটি সহজ অথচ নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে, এই বোধটি একদিন না একদিন তাঁহার সমস্ত জীবনের চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে—এই আশাও কবি ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

তুলনীয়—

কৃতান্তঃ কান্তো বা মনসি ন ভেদঃ প্রথমতঃ
ক্রমাদ্ দ্বি-ত্রিমাসের মনুজ ইতি জাগ্রহ হৃদয়ম্
ততোঽসৌ মৎপ্রেয়ান অহম্ অপিচ তস্য প্রিয়তমা,
ক্রমাদ্ বর্ষে যাতে প্রিয়তমময়ং জাতম্ অখিলম্ ॥

—উদ্ভট

প্রথমতঃ বালিকা বধূর মনে কৃতান্ত ও কান্তের মধ্যে কোনো ভেদ বোধ হইত না, ক্রমে দুই-তিন মাসে তাহার মনে হইতে লাগিল যে ঐ ব্যক্তি মানুষ বটে। তাহার পর তাহার উপলব্ধি হইল যে উনি আমার প্রিয়, আর আমিও উঁহার প্রিয়তমা। ক্রমে বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সমস্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রিয়তমময় হইয়া উঠিল।

The bridegroom of my soul I seek,
Oh, when will he appear ?

—Cowper.

For me the Heavenly bridegroom waits.

St. Augustine's Eve.
—Tennyson.

What if this friend happen to be—God ?

Fears and Scruples.
—Robert Browning,

কৃপণ

ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হইয়া অহং ভুলিয়া যাহা কিছু ভগবানকে সমর্পণ করা যায়, তাহার ফল শতগুণ হইয়া দাতার নিকটে ফিরিয়া আসে। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ—সর্বং কর্মফলং ব্রহ্মার্পণম্ অস্তু, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কোরান ও হাদিসেও এই প্রকারের কথা আছে—ভগবান একমাত্র ধনী, আর সব ফকীর; কে আছে আমাকে কণামাত্র দান করিবে আমি তাহা শতগুণে বর্ধিত করিয়া পরিশোধ করিব; তিনি অভাব-রহিত ও প্রশংসিত; দানের ফলে একটি শস্যকণা হইতে যেন শতসহস্র শস্য উৎপন্ন হয়; জীবনে আরও পুণ্য অর্জন করি নাই কেন?

ত্যাগেই বস্তুর প্রাপ্তির পরিচয়। আবার ফলাফল-বিবেচনাহীন ত্যাগই

শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। আমার দিকে কিছুই রাখিলে চলিবে না—আমার কাজ, আমার দেশ, আমার কীর্তি, আমার সফলতা, আমার শক্তি—এইরূপ আমার বন্ধনের মধ্যে বিশ্বভুবনের অধীশ্বরের প্রমুক্ত আনন্দ-রূপ পীড়িত হয়; সেই আমিত্বের বন্ধন ছিন্ন করিলেই জীবনের দেবতার আবির্ভাব সর্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আমার দিকে সঞ্চয়ে ভার, তাঁহার দিকে সঞ্চয়ে মুক্তি—এই বোধ যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তখন চিত্ত অধীর হইয়া বলে—

এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও,
ভাবের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি,
এ যাত্রা মোর থামাও।

খেয়া, ভার

তুলনীয়—

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেছ
কী কাতর গান গাই'।

* * * *

হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।

কল্পনা

মোর ফকিরওা মাংগি যায়,
মৈঁ দেখহু ন পৌঁঁ।
মংগন সে ক্যা মাংগিয়ে,
বিন মাংগে জো দেয়।

—কবীর

জো হম ছাড় হিঁ হাথ তেঁ
সো তুম লিয়া পসার।
জো হম লেবহিঁ প্রীতি সো
সো তুম্হ দীয়া ডার।

—দাদূ

রবি-রশ্মি

ক্ষণিকা

(রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের কবিতাগুলি শিলাইদহে রচিত। কাব্যখানি বাংলা ১৩০৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।)

সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি নিজের প্রতিভার স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ক্ষণিকায় কবি তাঁহার নিজস্ব ভাষার সন্ধান পাইলেন, ইহার পূর্বে তিনি যেন অপরের নিকটে ধার-করা কৃত্রিম ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। মানসী কাব্যে কবি প্রথম যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রা গণনা করিতে আরম্ভ করেন। ক্ষণিকাতে তিনি প্রথম হসন্তবহুল চল্‌তি কথার সৌন্দর্য ও ধ্বনিমাধুর্য ধরিতে পারিলেন। লিরিকের যাহা বাহ্য উপাদান—ছন্দ, সহজ ভাষা ও অলঙ্কার—তাহা এই কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে বিচিত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ছন্দে ভাবে প্রকাশভঙ্গিতে কবির স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অবলীলাক্রম ঝলমল করিতেছে, সর্বত্র আনন্দের লঘু নৃত্য টলমল করিতেছে। (নিছক গীতি-কবিতা হিসাবে ক্ষণিকা কবির এক অনবদ্য অপূর্ব সৃষ্টি, কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।)

রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত নূতন নূতন ধরণের, নূতন নূতন প্রকাশভঙ্গিতে কাব্য রচনা করিয়া আসিয়াছেন; এক একখানি কাব্য যেন তাঁহার কাব্যপ্রতিভার প্রকাশভঙ্গিমার এক একটি নূতন পর্যায়। তাঁহার কাব্যধারায় বিবর্তন অধিক। একথা কবি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন—

> আজকাল যে-সকল কবিতা লিখ্‌ছি, তা 'ছবি ও গান' থেকে এত তফাৎ যে আমি ভাবি আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্ছে না, ক্রমাগতই পরিবর্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারছি, আমি যেন আর-একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চল্‌বে তাই ভাবি।......অবিশ্রাম পরিবর্তন দেখ্‌লে ভয় হয়।......সবুজপত্র, ১৩২৪, ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা। 'পূরবী' কাব্যের 'আহ্বান' কবিতার ব্যাখ্যায় এই পত্র দ্রষ্টব্য।

এই ক্ষণিকা কবির কাব্যরচনা-ভঙ্গির একটি শ্রেষ্ঠ ও মনোজ্ঞ পরিবর্তন।

(ক্ষণিকায় কবি জীবনের প্রিয় বস্তু হারাইয়া যাওয়ার ও অভিলষিত বস্তু না পাওয়ার ক্ষতি ও ব্যর্থতাকে হাসি-তামাসা দিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিতে

চাহিয়াছেন। হৃদয়ের দারুণ বেদনাকেও তিনি হাসির আলোক দিয়া বরণ করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন এই ক্ষণিকার কবিতাগুলির মধ্যে। কবি নিজেই তাঁহার মানসী জীবনদেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।
হাল্কা তুমি করো পাছে
হাল্কা করি তাই
আপন ব্যথাটাই।

চটুল ভঙ্গিতে বলা সরল কথাগুলিও একটি গভীর বেদনাময় অনুভূতি ও অনুভাব হইতে উৎসারিত। এখানে ওমর খৈয়ামের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা যাইতে পারে। সত্যকে সব বাহুল্যের আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া সহজরূপে প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতার আভাস কবি কণিকায় দিয়াছিলেন, সেই ক্ষমতারই কবিত্বময় সৃষ্টি এই ক্ষণিকা। কবি জীবনকে সহজভাবে সত্যরূপে গ্রহণ করিতে উৎসুক—

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

—বোঝাপড়া

তাঁহার 'চিত্ত-দুয়ার মুক্ত দেখে সাধু-বুদ্ধি বহির্গতা'। এই কবিই পরে ফাল্গুনীতে বলিয়াছেন—'ভালোমানুষ নইরে মোরা ভালোমানুষ নই!' কবির বয়স তারুণ্য-ঘেঁষা হইলেও তিনি বলিয়াছেন,—'পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো সবার আমি এক-বয়সী জেনো'।

উদ্বোধন

(১৩০৬)

যে দিন হইতে মানুষ ভাবিতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত সে একটি কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না। সেই সমস্যাটি হইতেছে—এই বিশাল জগতে তাহার স্থান কোথায়, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি, এবং তাহা কেই বা বলিয়া দিবে? আর প্রতি মুহূর্তে যে বেদনার ভার চারিদিক হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া

ধরিতেছে, তাহার তত্ত্বই বা সে কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? এই পৃথিবীকে মানুষের মনে হয় বড় দুঃখময়, এখানে প্রতিক্ষণে বহুদিনের সযত্ন-পোষিত আশার সূত্র ছিঁড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা, প্রতিপদে মৃত্যু ও বিচ্ছেদের হাহাকার। ইহার মাঝখানে পড়িয়া মানুষ পথ খুঁজিয়া পায় না।

কিন্তু জীবনের এই বিমর্ষ মূর্তি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে না। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আনন্দেই হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ সেই চিরন্তন আনন্দ-মন্ত্রের উপাসক। দুঃখ-বেদনাকে, নিরাশার আঘাতকে জগতের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া মানিতে তাঁহার মন চায় না। তাঁহার মনে হয়, এ দুঃখ যেন সংসারের উপরের কঠিন শুষ্ক আবরণ মাত্র; উহার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগের অপব্যয় না করিয়া, তাহার অন্তস্তলে যে গোপন আনন্দের উৎস আছে তাহারই রসাস্বাদন করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ যেমন তাঁহার প্রিয়াকে a traveller between life and death দেখিয়াছিলেন, এবং সংসারের কোন কিছু আবিলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই ও করিতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি এমন একটি মুক্ত সুন্দর জীবন পাইতে চাহিতেছেন যাহা পৃথিবীর দুঃখ দৈন্য নিরাশা নিষ্ফলতার দ্বারা একটুকুও অভিভূত না হইয়া পৃথিবীর সমস্ত আনন্দরস নিঃশেষে পান করিয়া যাইবে; অমল কমল যেমন জলের কোলে সহজ আনন্দে ফুটিয়া উঠে, পঙ্কজ হইয়াও সে যেমন পঙ্কিলতাকে পরিহার করিয়া শোভায় সুষমায় ঢলঢল করে, তেমনি করিয়া এই অপরূপ মানব-জীবন সংসারের মধ্যে অনাসক্তভাবে কাটিয়া যাইবে। জীবনের কোথাও এতটুকু বাঁধন পড়িবে না যে, শেষের দিনে ডাক আসিলে সাড়া দিতে তাঁহার কোনরূপ কষ্ট বা দ্বিধা হইতে পারে। সেইজন্য নবীন-জীবনের উদ্বোধন-সঙ্গীত কবির কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। যাহা যাইবার তাহাকে কেহ কোনোদিন ধরিয়া রাখিতে পারে না। যাহা পাইবার নহে তাহার জন্য সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া ফিরিলেও কোনো লাভ নাই। কিন্তু মানুষ চিরদিন এই সহজ সরল সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে! স্মৃতির সঞ্চয়ে ও নিরাশ হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে তাহার চারিদিকে যে দুঃখের শৃঙ্খল জড়াইয়া ধরিতেছে, তাহা সে নিজেই সৃষ্টি করিতেছে। সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে না পারিলে তাহার ভাগ্যে আনন্দ লাভ করা অসম্ভব। অর্থ যশ মান প্রভৃতি সব ভুলিয়া মানুষ যদি সৌন্দর্য-পিপাসু হইয়া মুগ্ধ-হৃদয়ে ভ্রমরের মতো বিশাল জগতের মর্মকোষে বাস করিতে

পারে এবং কল্যাণময় সৌন্দর্য-শতদলের শোভা দেখিতে ও রস আস্বাদন করিতে শিখে, তবে তাহার জীবন আনন্দ-ঝলমল অমল সুন্দর হইবে, সামান্য দুঃখ-কালিমা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

তাই কবি বলিতেছেন যে অতীতের প্রতি কোনো মমতা না করিয়া ও ভবিষ্যতের কোনো আশা না রাখিয়া কেবল বর্তমানকেই আমাদের কর্মে প্রয়োগ করিতে হইবে। মানুষের জীবন তো কতকগুলি বর্তমান মুহূর্তের সমষ্টি। অতএব বর্তমানকে সার্থক করিয়া তোলাই হইতেছে জীবনের সাধনা। বর্তমানই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অতীত তো গত; তাহার কথা স্মরণ করিয়া আমাদের ক্ষণস্থায়ী বর্তমানকে বিনষ্ট করা উচিত নয়। আবার ভবিষ্যৎ তো অনাগত; তাহার সম্বন্ধে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নাই, তাহার সহিত আমাদের কোনো সম্পর্ক নাও ঘটিতে পারে। অতএব বর্তমানই আমাদের একমাত্র উপাস্য। অতীত তো অতীত, মাথা কুটিলেও তাহাকে তো আর পাওয়া যাইবে না; গতস্য শোচনা নাস্তি। আবার পরকালের ভরসায় সকল সুখসম্ভোগ ত্যাগ করিয়া এ জীবনকে বিফল করিয়াও কোনো লাভ নাই। আনন্দের কোনো কারণ না থাকিলেও সর্বদা কেবল আনন্দেই মগ্ন থাকিতে হইবে। সামান্য কয়েক দিনের জন্য আমরা ইহজগতে আসিয়াছি। সুতরাং বিরস মুখে বসিয়া থাকিয়া জীবনকে পণ্ড না করিয়া এই জীবনের সকল প্রকার সুখ আস্বাদন করা বাঞ্ছনীয়।

কবি বলিতেছেন যে, অনন্ত মহাকাল যেমন চিরদিন অতীতকে বহন করিয়া বেড়ায় না, অতীতকে ক্রমাগত পিছনে ফেলিয়া কেবল বর্তমানকে বুকে করিয়া অনবরত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়, সেইরূপ আমাদেরও অতীতের অনুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া, ভবিষ্যতের প্রত্যাশা না রাখিয়া, কেবল যে ক্ষণিক-বর্তমান আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত তাহারই প্রত্যেক ক্ষণটিকে আমাদের কর্মের দ্বারা সফল ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। অতীতকে টানিয়া আনিয়া বর্তমানের জায়গা জুড়িয়া কোনো লাভ নাই। যে ক্ষণিক-বর্তমান আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত তাহাকে বরণ করিয়া লও, তাহাকে লইয়াই আজিকার ক্ষণিক-জীবনের আনন্দগান গাও, ক্ষণিক-দিনের উৎসবে মগ্ন হও। গৃহকোণে বসিয়া ক্ষণিক-বর্তমানকে অতীতের চিন্তায় ভাবনায় ভারাক্রান্ত করিয়া জীবনকে মৃত্যুপুরী করিয়া তুলিয়ো না। জীবনের বর্তমানকে যদি আনন্দ-উৎসবে সার্থক করিয়া তুলিতে পারো, তাহা হইলে তোমার অতীত আনন্দময় হইবে এবং ভবিষ্যৎও আনন্দিত হইবে। তাহা হইলে এই বর্তমান ক্ষণগুলি সারাজীবনের কণ্ঠে আনন্দের মালা হইয়া দুলিবে।

কবি উদ্দেশ্যমূলক কর্ম হইতে বিরত হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে যোগে আনন্দের আবেগে পাগল হইয়া উঠিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিতেছেন— বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো জগতের সকল আনন্দে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে।

সকল সংস্কার ও প্রথার বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে নিজেকে উপলব্ধি করিবার ব্যগ্রতা সুফী কবিদের ও হুইটম্যানের কবিতায় পাওয়া যায়। ইঁহারা বলেন—প্রকৃতি ও মানবকে লইয়াই এই জগৎ। সমস্ত মানব-পরিবার দেশে কালে অখণ্ড ও শাশ্বত। শাশ্বত সত্যের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, আপনাকে অখণ্ড মানব-পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যিনি নিজেকে শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন তিনি সকলের পরমাত্মীয় হন।

ব্যথা বিবেচনা সমস্যা সন্ধান—সব সরাইয়া ফেলিয়া ক্ষণ-প্রকাশের বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে যে অমৃতরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, কবি তাহাই চোখ ভরিয়া দেখিতেছেন এবং প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছেন। জীবনের সব জটিলতা দুর্ভাবনা সরাইয়া দিয়া হৃদয়াবেগের সহজ পথে চলার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় কবি বলিতে চাহেন—হৃদয়ের আবেগ তুচ্ছ নয়, সৌন্দর্যের উপলব্ধি কোনো মহৎ তত্ত্বের চেয়ে অসত্য নয়।

—অজিতকুমার চক্রবর্তী

সরল চটুল ভঙ্গিতে কবি কথা বলিয়াছেন; অথচ তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কবি-হৃদয়ের অন্তস্তলে চাহিয়া দেখিবার সুযোগ আমাদের যখনই ঘটিতেছে, তখনই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কী গভীরতা হইতে তাঁহার কথা উৎসারিত হইতেছে, আর অনেক সময়ে কেমন বেদনা-ভরা সেই গভীরতা।

—কাজী আবদুল ওদুদ

তুলনীয়

ক্ষণ-সম্পদ্ ইয়ং সুদুর্লভা প্রতিলব্ধা পুরুষার্থসাধনী।
যদি নাত্র বিচিন্ত্যতে হিতং পুনর্ অপ্যেষ সমাগমঃ কুতঃ॥

ক্ষণ-সুযোগের শুভাশীর্বাদ লাভ করা সহজ নহে, প্রতিলব্ধ হইলে তাহা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য দান করে। যদি এই বর্তমানে হিত চিন্তা না করা যায়, তবে এই বর্তমানের পুনরাগমন তো আর কখনোই হইবে না।

—শান্তিদেব, বোধিচর্যাবতার

তিস্সে বুদ্ধস্স ধম্মেহি খনো তব্ মা উপচ্চগা।
খনাতীতা হি সোচন্তি নিরয়ং হি সমপ্পিতা॥

হে তিস্সা, তুমি ধর্মে মনোনিবেশ করো, তুমি ক্ষণকে পরিত্যাগ করিয়ো না। যাহারা ক্ষণাতীত, অর্থাৎ ক্ষণকে অতীত হইতে দেয়, তাহারা শোকগ্রস্ত হয় এবং নরকের দুঃখ ভোগ করে।

—বুদ্ধদেবের উপদেশ

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মম্ আচরেৎ।

—চাণক্য

পাত্র ভরো, পাত্র ভরো,
পুনঃ পুনঃ কী কাজ বলায়?
কতই দ্রুত যাচ্ছে সময়
গড়িয়ে মোদের পায়ের তলায়।
অনুৎপন্ন আগামী কাল,
লব্ধ-মরণ বিগত দিন,
কাজ কি তাদের ভাবনা ভাবায়,
অদ্য যদি স্বর্ণ ফলায়!

—ওমর খৈয়াম, কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ

এক লহমার খুশীর তুফান,
এই তো জীবন।—ভাবনা কিসের?

—হাফিজ, কাজী নজরুল ইস্‌লামের অনুবাদ

Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil hereof.

—*St. Matthew*. 6. 34.

Trust no Future, howe'er pleasant,
Let the dead Past bury its dead.
Act—act in the living Present,
Heart within, and God o'erhead.

—Longfellow, *Psalm of Life*

One hour of glorious life
Is worth an age without a name.

মাতাল

কবি বিবেচনা অপেক্ষা অবিবেচনাকে প্রশংসা করিয়াছেন অনেক স্থানে। কেবল বিচার-বিতর্কে কাজের অবসর পাওয়া যায় না, শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যাহারা কেবল পাঁজি দেখিয়া দিন-ক্ষণ খুঁজিয়া কর্ম করিতে চায়, তাহাদের আর কর্ম করাই হয় না। কিন্তু উদ্দাম আগ্রহে যাহারা বিপদের ভয় না করিয়া সকল কুসংস্কার পরিহার করিতে পারে এবং কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার শেষ দেখিয়া তবে ছাড়ে, কবি তাহাদের দলে ভিড়িতে চাহিতেছেন। কর্মে মত্ততা এবং সেই কর্মের তলা পর্যন্ত ডুবিয়া দেখার মধ্যে যে যৌবনের বেগ

আছে, কবি তাহাই কামনা করিতেছেন। বিবেচকের দলে ভিড়িয়া পঙ্গু হইয়া থাকিতে তিনি চাহেন না। বাঁধা দস্তুরের রাস্তা ছাড়িয়া যে-দিকে পথ নাই সে-দিকে নূতন পথ খুলিবার ব্রত লইয়া বিপথে ধাবমান হইবার আনন্দে জীবন উৎসর্গ করিতে কবি ব্যগ্র। যে মানুষের বা যে জাতির দুঃখ স্বীকারে ভয়, নূতনের সন্ধানে রত হইতে জড়তা, যেখানে পদে পদে নিষেধ মানা, যেখানে কেবল সাবধানতা, সেখানে লক্ষ্মী দয়া করেন না। লক্ষ্মীছাড়া হইয়া ছুটিয়া বাহির হইতে পারিলেই লক্ষ্মীকে জয় করিয়া আনিতে পারা যায়।

দ্রষ্টব্য—তাসের দেশ। বলাকায় 'নবীন', 'যৌবন' নামক কবিতা।

যথাস্থান

(১৩০৬)

এই কবিতাটি কবির বিরুদ্ধ সমালোচকদের সমালোচনার জবাব এবং কবির যথার্থ ও উপযুক্ত সমঝদার নির্ণয়।

ভীরুতা

(১৩০৬)

ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সঙ্গতকে নহে অসঙ্গতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ার-মুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভৎ‍র্সনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না। সেইজন্য সত্যকে সত্য কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়; তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক-পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় উদ্ধৃত

সেকাল

(১৩০৬)

কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সুদূর অতীত কালে কল্পনায় প্রবেশ করিয়া কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত সেকালের আচার-ব্যবহার বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনার সমাবেশ করিয়া এই কবিতাটিতে কালিদাসের কালের একটি পরিবেশ ও আব-হাওয়া আনিয়া দিয়াছেন। কালিদাসের কালের সৌন্দর্যমালা এই কবিতার মধ্যে গাঁথিয়া কবি তাঁহার কালের পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। কাল ও দেশের ব্যবধান সে-দেশের ও সে-কালের কোনো সৌন্দর্যকে এ-কালের কবিচিত্ত হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। কালিদাসের বর্ণিত চিত্রপরম্পরা আমাদের কবি অতি-নিপুণতার সহিত নিজের কবিতার মধ্যে গ্রথিত করিয়া তুলিয়াছেন। পদে পদে তাঁহার বর্ণনা কালিদাসের কাব্যের বিবিধ বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই কবিতার সহিত মানসীর 'মেঘদূত', কল্পনা কাব্যের 'স্বপ্ন' প্রভৃতি কবিতা তুলনীয়।

কালিদাসের আশ্রয়দাতা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন বিদ্বান্ কবি ছিলেন, তাঁহারা নবরত্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মতন কবি জন্মগ্রহণ করিলে তিনি নিশ্চয় সেই নবরত্নের সঙ্গে দশম-রত্নরূপে যুক্ত হইতেন। বাস্তবিক তিনি কবি-কালিদাসের কবিত্ব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। এই কবিতায় কবির আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী রেবা বা শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সে-কালের উদ্যানে কৃত্রিম শৈল নির্মিত হইত, তাহাকে ক্রীড়াশৈল বলিত।

> ক্রীড়াশৈলঃ কনক-কদলী-বেষ্টন-প্রেক্ষণীয়ঃ।
>
> —মেঘদূত, উত্তর ১৬
>
> ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
>
> —মেঘদূত, পূর্ব ৬১

ঋতুসংহার কাব্য ছয় সর্গে ছয় ঋতুর প্রকৃতি-বর্ণনা। মেঘদূত কাব্য 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র ঘটনা লইয়া লেখা।

সংস্কৃত কবিদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে সুন্দরীর পদাঘাত না

পাইলে অশোক প্রস্ফুটিত হয় না, আর সুন্দরীর মুখমদের কুলকুচা না পাইলে বকুলফুল ফুটে না। এই কবিপ্রসিদ্ধি কালিদাসের বহু কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়—

সেথায় কুরুবকে ঘিরিছে মাধবীর
কুঞ্জ, তারি পাশে দুইটি গাছ—
অশোক-তরু রয় কাঁপায়ে কিশলয়,
বকুল মনোরম করে বিরাজ।
আমার সাথে মোর প্রিয়ার বাম পদ—
তাড়ন পেতে সেই অশোক চায় ;
বকুল কুতূহলে দোহদ ছলে চাহে
প্রিয়ার বদনের মদ-ধারায়॥

—মেঘদূত, উত্তর ১৭

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটক ৩য় অঙ্ক, কুমারসম্ভবম্ ১।২৬, কর্পূরমঞ্জরী নাটক প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

৪

মেঘদূত উত্তর মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকে সেকালের রমণীদের বেশ-বিন্যাসের সুন্দর বর্ণনা আছে—

হস্তে লীলাকমলম্ অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসব-রজসা পাণ্ডুতাম্ আননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদ্-উপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

কুমারসম্ভব কাব্যের ৩।৫৫ শ্লোকে কেশরদামকাঞ্চীর উল্লেখ আছে—

স্রস্তাং নিতম্বাদ্ অবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।

যন্ত্রধারা বা ধারাযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় বহু কাব্যে—

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণ-তোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।

—মেঘদূত, পূর্ব ৬২

—মেঘদূত পূর্ব ৪৯, রঘুবংশম্ ১৬।৪৯, কুমারসম্ভবম্ ৬।৪১ ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য।

সে-কালের রমণীরা কেশে ধূপের ধোঁয়া দিয়া কেশ সংস্কার করিত—

অগুরু-সুরভি-ধূপামোদিতং কেশপাশম্।

—ঋতুসংহার, শিশির, ১২

দ্রষ্টব্য—রঘুবংশম্ ১৬।৫০, ঋতুসংহার বর্ষা ২১, কুমারসম্ভবম্ ৭।১৪।

সে-কালের রমণীরা এ-কালের রমণীদের মতনই মুখে পাউডার মাখিত, কিন্তু

সে পাউডার এ-কালের মতন কৃত্রিম সুগন্ধীকৃত খড়ির গুঁড়া বা চালের গুঁড়া নহে, তাহা হইত সহজ-সুরভি লোধ্র-ফুলের রেণু বা কেয়াফুলের রেণু (মেঘদূত, উত্তর ২, কুমারসম্ভবম্ ৭।৯), এবং কালাগুরুর গন্ধে বসন সুরভিত করিত—

প্রকাম-কালাগুরু-ধূপ-বাসিতং বিশন্তি শয্যাগৃহম্ উৎসুকাঃ স্ত্রিয়ঃ।

—ঋতুসংহার, শিশির ৫

দ্রষ্টব্য—ঋতুসংহার, হেমন্ত ৫; কুমারসম্ভবম্ ৭।১৫।

৫

সে-কালের রমণীরা কপোলে বক্ষে চন্দন কুঙ্কুম কস্তুরী দিয়া চিত্র রচনা করিত—

প্রিয়ঙ্গু-কালীয়ক-কুঙ্কুমাক্তং স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।
আলিপ্যতে চন্দনম্ অঙ্গনাভিঃ মদালসাভির্ মৃগনাভি-যুক্তম্॥

—ঋতুসংহার, বসন্ত ১২

দ্রষ্টব্য—ঋতুসংহার, শিশির ৯; কুমারসম্ভবম্ ৫।২২ ইত্যাদি।

বিবাহের সময়ে বধূ যে বস্ত্র পরিধান করিত তাহার আঁচলের কোণে একটি হংস-মিথুনের ছবি আঁকা থাকিত—

আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী হংস-চিহ্ন-দুকূলবান্।
আসীদ্ অতিশয়-প্রেক্ষ্যঃ স রাজ্যশ্রী-বধূ-বরঃ॥

—রঘুবংশম্ ১৭।২৫

দ্রষ্টব্য—কুমারসম্ভবম্, ৭।৩২।

বিরহিণীর চিত্র মেঘদূতের পূর্ব ১০ ও উত্তরের ২৫, ২৬ শ্লোক হইতে এখানে অঙ্কিত হইয়াছে।

সে-কালের রমণীদের পায়ে নূপুর থাকিত।

—রঘুবংশম্ ১৬।১২; ঋতুসংহার—গ্রীষ্ম ৫, শরৎ ২০ দ্রষ্টব্য

৬

সে-কালের রমণীরা শুক, সারিকা, কপোত, ময়ূর প্রভৃতি পাখী পুষিত।

—মেঘদূত উত্তর ১৮, ২৪, পূর্ব ৩৮; বিক্রমোর্বশী নাটক, ৩য় অঙ্ক

তপোবন-তরুণীরা সহকার-তরুর আলবালে জলসেচন করিত—

আলবাল-পরিপূরণে নিযুক্তা শকুন্তলা।

—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ১ম অঙ্ক

৭

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটক বসন্তোৎসবের সময়ে অভিনীত হয়—

শ্রীকালিদাস-গ্রথিত-বস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকম্ অস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রযোক্তব্যম্ ইতি।

—মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ১ম অঙ্ক

রাজা অগ্নিমিত্র চিত্রশালায় রাণীর চিত্রপটের মধ্যে পরিচারিকারূপিণী মালবিকার ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং সেই চিত্রশালায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

—মালবিকাগ্নিমিত্রম্, ১ম অঙ্ক

মুগ্ধা তরুণীরা ছল করিয়া আঁচল বা মালা গাছের ডালে আটকাইয়া প্রণয়ীদের দেখিয়া লইত।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ১ম অঙ্ক ; বিক্রমোর্বশী, ১ম অঙ্ক

তখনকার কালের তরুণ-তরুণীরা যৌবনের নবীন নেশায় প্রমত্ত হইত।

—মেঘদূত, পূর্ব ২৫

বুঝিবে নাগরের সেথায় যৌবন
হয়েছে উদ্দাম দুর্নিবার।

—প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ

৮

কালিদাসের আবির্ভাবকাল লইয়া পণ্ডিতদিগের মতভেদ ও বিবাদ এখনও মিটে নাই। তবে অনেকে এমন মনে করেন যে কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন।

নিপুণিকা মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের মহারাণী উশীনরীর দাসীর নাম।

৯

আধুনিক রমণীরা ইংরেজী শিখিয়া বিদেশীভাবাপন্ন ও বিদেশীভাষিণী হইয়াছে, তাহারই প্রতি কবির ঈষৎ শ্লেষ। তথাপি তাহারা যে চিরন্তনী নারী তাহার সাক্ষ্য তাহাদের হাবভাবে প্রকাশিত হয়।

১০

কালিদাসের কাব্য, নাটক পাঠ করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ তো কালিদাসের সে-কালের আভাস পাইতেছেন, কিন্তু কবি কালিদাস তো কবি রবীন্দ্রনাথের এ-কালের কোনই আভাস পাইতে পারেন নাই। তাই কবি বলিতেছেন যে, কালিদাস আগে জন্মিয়া ঠকিয়া গিয়াছেন।

যাত্রী

(১৩০৬)

জীবনযাত্রার পথে অনেক সঙ্গীর সঙ্গে মিলন ঘটে ; তাহাদের কেহ বা বহুদূর পথের সহযাত্রী, কেহ বা কেবল খেয়া-পারাপারের সময়টুকুর সাথী। যে খেয়ার সাথী, সেও তাহার সম্পদ্ লইয়া চলিয়াছে সুন্দর ও চিরন্তনের উদ্দেশে—যাহার গোলাতে সে তাহার জীবনের ফসল জমা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। সে যদিও আমার পথেই বরাবর যাইবে না, তবু তাহারও আমার সহিত একই খেয়ানৌকায় চড়িতে ইতস্ততঃ করিবার কারণ নাই ; তাহার ও তাহার সম্পদের স্থান এই নৌকাতে হইবে, আমি তাহাদের কাহাকেও আত্মসাৎ করিব না ; আমি কেবল তাহার খেয়ানৌকায় সাথী হইয়া তাহাদের গন্তব্যের দিকেই উত্তীর্ণ করিয়া দিব। তাহার মনের কথা তাহারই থাকুক, সে তাহা গোপন রাখুক, আমি কেবল তাহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্যের কথাই ভাবিব—এই ক্ষণিক স্বল্পকালের সম্বন্ধটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এই রকম তো আগেও অনেক বার হইয়াছে—কত যাত্রী আমার জীবন-তরীতে কেবল খেয়া পার হইয়া গিয়াছে, তাহার ধানের আঁটি অল্পক্ষণের জন্য আমার তরীতে রাখিয়া তাহার স্থায়ী কাম্য-স্থানের দিকে উত্তীর্ণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

সৌন্দর্যের সঙ্গে কেবল সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শ করিয়াই হৃদয় পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে, সৌন্দর্যকে কেহ কখনো নিঃশেষে আপন করিয়া লইতে পারে না, তাহা দুরাপনা অ-ধরা চিরাপস্রিয়মানা শ্রী, তাহা স্বর্গেও চিরস্থায়ী নয়। তাই কবি যাত্রীকে কেবল খেয়া পার করিয়া দিয়াই সন্তুষ্ট। তাহাকে তিনি একান্ত নিজস্ব করিয়া পাইতে তো চাহেনই না, তাহার গন্তব্য স্থানের ঠিকানা জানিবার জন্যও তাঁহার কোনো ঔৎসুক্য নাই।

অতিথি

(১৩০৬)

সুন্দরকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার বাসনা মানব-মনে বিরহিণী-রূপে নিরন্তর বিরাজ করিতেছে ; তাই মানুষ কিছুতেই তৃপ্তি পায় না ; অথচ যাহাকে সে চায় সে অনির্বচনীয় অব্যক্ত অনায়ত্ত অগম্য ও ধারণাতীত।

আমি কহিলাম—কারে তুমি চাও,
ওগো বিরহিণী নারী!
সে কহিল—আমি যারে চাই তার
নাম না কহিতে পারি!

—উৎসর্গ

সেই অজানা অতিথি কিন্তু প্রাণের কপাটে শিকল নাড়ে।

মানব-জীবন 'পাইনি' ও 'পেয়েছি' দিয়ে গঠিত। ঘর বলে—পেয়েছি; পথ বলে পাইনি। মানুষের কাছে পেয়েছিরও একটা ডাক আছে, আর পাইনিরও ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে, পথ নেই—সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে, ঘর নেই—সেও তেমনি মানুষের শাস্তি। শুধু 'পেয়েছি' বদ্ধ গুহা, শুধু 'পাইনি' অসীম মরুভূমি।

—রবীন্দ্রনাথ

বধূ একেবারে অন্তরের, এবং অতিথি একেবারে বাহিরের। বাহিরের অতিথি আসিয়া অন্দরের বধূর কাজ ভোলায়। আজ অতিথির সহিত গোপন অভিসারে মিলিত হইয়া ঘরের কাজ ভুলিবার পরম ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ণিমা রাত্রে প্রকাশ্যে যদি হে বধূ, তোমার অভিসারে বাহির হইতে ভয় বা সঙ্কোচ হয়, তবে না হয় ঘরের মধ্যে গোপন থাকার মতন ঘোমটার আবরণ টানিয়া মুখ ঢাকিয়া চলো, আর ঘরেরই প্রদীপ হাতে লও। প্রকাশ্যে যদি তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে না পারো, তবে না হয় লুকাইয়াই গোপনে অসম্পূর্ণ-ভাবেই তাহাকে লইও, কিন্তু তাহাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিয়ো না। তুমি অন্তত এইটুকু জানো যে সে আসিয়াছে। তাহাকে পূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন কি এখনো তোমার সারা হয় নাই? তাহাকে কি এখনো অপেক্ষা করাইয়া রাখিবে, না তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবে?

মানব-মনে ও মানব-জীবনে অতর্কিতে মহৎ ভাবের ও মহৎ কর্মের প্রেরণার আবির্ভাব হয়। সেই অতিথির আগমনের প্রতীক্ষায় বাসকসজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে, যেন সেই অতিথি গৃহদ্বারে আসিলেই তাঁহাকে বরণ করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এই আহ্বান যেন রাধার কাছে শ্যামের বাঁশীর আহ্বান; ইহাকে ব্যর্থ হইতে দিলে সারা-জীবন হতাশ হইয়া হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে।

যে-কোনো দেশে যখনই কোনো মহৎ আদর্শের নব অভ্যুদয় হইয়াছে, তখনই কতক লোকে তাহাকে সমাদরে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কতক লোকে লুকাইয়া সেই আদর্শকে মনে মনে স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহাকে বরণ

করিতে সাহস পায় নাই এবং কেহ কেহ তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া জীবনকে ব্যর্থ নিষ্ফল করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন ক্রাইষ্টের বা মহম্মদের বা বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার, অথবা আমাদের দেশে বা অন্যান্য অনেক দেশে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের ও স্বদেশীব্রত পালনের আহ্বান কতক লোকে স্বীকার করিয়াছে, কতক লোকে পারে নাই, আর কতক লোকে করে নাই।

তুলনীয়—খেয়া পুস্তকের 'আগমন' কবিতা, ও 'দুই পাখী'।

আষাঢ় ও নববর্ষা

বর্তমান সভ্যতার যুগে মানব-জীবনে প্রকৃতির স্থান বড় অল্প। তাই ইহাকে জীবনে পাইবার আকাঙ্ক্ষা বড় বেশি। চিররুগ্ন যেমন স্বাস্থ্য কামনা করে, মুমূর্ষু যেমন জীবনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকায়, তেমনি তৃষিত ব্যাকুলতায় আজ মানবের অন্তরাত্মা প্রকৃতিকে চাহিতেছে। এই ভাষাহীন প্রার্থনায় মানব-হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই আজ প্রকৃতির কবিতা এমন করিয়া হৃদয়কে দোলা দেয়। মানব-জীবনের দুর্লভ ও ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষাগুলি যখন কবির হস্তে রূপ গ্রহণ করিয়া, ছন্দে নাচিয়া, সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এমনই করিয়া ইহারা হৃদয়কে মুগ্ধ করে।

—বিশ্বপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ, উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল

আষাঢ়, নববর্ষা প্রভৃতি বর্ষার যে-কোনো কবিতা কবির অসামান্য অনুভবের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের শব্দ-সঙ্গীত, ভাবব্যঞ্জক শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাস এবং মধুর তান-লয়-মান ও চিত্র-পরম্পরা কবিতাগুলিকে পরম মনোরম করিয়াছে। এই দুইটি কবিতার সহিত কবির 'বর্ষামঙ্গল' কবিতা এবং 'আবার এসেছে আষাঢ় গগন ছেয়ে' প্রভৃতি গান তুলনীয়।

নববর্ষা

১

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—তুলনীয়

My heart aches,......being too happy in thine happiness.

—Keats, *Ode to a Nightingale.*

ময়ূরের মতো নাচে রে—কবি সামান্য কবির ন্যায় বলিলেন না বর্ষার মেঘদর্শনে

ময়ূর কলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে—তিনি নিজের হৃদয়কেই ময়ূরস্থানীয় করিয়া উপস্থিত করিয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে ও অন্তঃপ্রকৃতিকে মিলাইয়া দিয়াছেন।

গুরু গুরু মেঘ ইত্যাদি—মেঘগর্জনধ্বনি ভাষায় ও অনুপ্রাসে প্রকাশ পাইয়াছে।

২

ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা—তুলনীয়—উৎসা অজাগরা উত।—অথর্ববেদ, ৪।১৪। জলধারা না অজগর সর্প!

দাদুরি—উপ প্রবদ মণ্ডুকি বর্ষম্ আবদ তাদুরি। অথর্ববেদ, ৪।১৫।

হে ভেক, বর্ষাকে তোমরা আবাহন করো। ঋগ্বেদ, ৭।১০।

বিদ্যাপতির কাব্যেও বর্ষাকালে ভেকের রবের বর্ণনা আছে।

৩

কবি নিজের মনের আনন্দ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া সমস্ত কিছু সুন্দর দেখিতেছেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ যেমন প্রিম্‌রোজ ফুলকে কেবল ফুলরূপে দেখেন নাই, তাহাতে আরও অতিরিক্ত কিছু দেখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বাহ্য সৌন্দর্যকে নিজের মনের আনন্দে অভিষিক্ত দেখিতেছেন। প্রকৃতির মধ্যে যে আনন্দের নিত্যলীলা চলিতেছে, তাহার সঙ্গে মানব-মনের আনন্দের যোগের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। নবতৃণদল শ্যামলতায় সরসতায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা যেন কবিরই হৃদয়ের হর্ষবিস্তার; কদমফুল ফুটিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যেন কবিরই আনন্দ-জাগ্রত প্রাণের বিকাশ!

৪

ঊর্ধ্ব আকাশে বর্ষার নব মেঘভার দেখিয়া কবির মনে হইতেছে যেন কোনো নীলবসনা রূপসী তাহার দীর্ঘ কেশকলাপ আলুলায়িত করিয়া দিয়া উচ্চ প্রাসাদ-চূড়ায় দাঁড়াইয়া আছে। তড়িৎশিখার চকিত আলোক যেন সেই রূপসীর রূপপ্রভা, সেই রূপসীর নীলাম্বরীর রূপালি জরির কুটিল কুঞ্চিত পাড়। এখানেও শব্দে ও অনুপ্রাসে তড়িৎস্ফুরণ চমৎকারভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

৫

বর্ষায় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ধৌত হইয়া নির্মল হইয়াছে, সেইজন্য কবি তাহার বসন অমল বলিয়াছেন; আবার বর্ষার আগমনে সমস্ত উদ্ভিদ্ শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য তাহার অমল বসন শ্যামল বলিয়াছেন। সুন্দরী বর্ষা যেন সদ্যোধৌত শ্যামল বসন পরিধান করিয়া সজ্জিত হইয়াছে।

সে উন্মনা বিরহ-বিধুরা বধূর ন্যায় যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

ঘট-রূপ পানা তৃণ প্রভৃতি ঘাট ছাড়াইয়া ভাসিয়া যাইতেছে বলিয়া কবি জলস্রোতের গতির ইঙ্গিত করিয়াছেন। কবি এই কবিতাতেই শেষ কলিতে বলিয়াছেন—

তীর ছাপি' নদী কলকল্লোলে এলো পল্লীর কাছে রে।

নবমালতী ফুল বর্ষার আগমনে ফুটিতেছে ও ঝরিতেছে, যেন কোনো সুন্দরী তরুণী আন্‌মনে ফুলগুলি তুলিয়া তুলিয়া দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিতেছে।

৬

বর্ষাকালে বকুলফুল ফোটে। তাই কবি বলিতেছেন, সেই বকুলগাছে বর্ষাসুন্দরী যেন দোলা বাঁধিয়া দোল খাইতেছে—বাদল-বায়ে বকুলশাখা দুলিতেছে ও বকুলফুল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এখানেও শব্দ ও অনুপ্রাস শাখার ঘন আন্দোলন ও বকুলফুলের ঝরিয়া-পড়া চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছে। বর্ষামঙ্গল কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা।

৭

বর্ষা যেন সৌন্দর্যের ভরা লইয়া তরণী সাজাইয়া আসিয়া কেতকীবনে তাহার তরুণ তরণী ভিড়াইয়াছে। কেয়ার ঝাড় ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং কেয়াফুলের পাপ্‌ড়িগুলি নৌকার ডোঙার মতন খুলিয়া খুলিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে শৈবালদল পুঞ্জিত হইয়াছে, বর্ষাসুন্দরী যেন অঞ্চলে ভরিয়া সে সকল সঞ্চয় করিতেছে।

আবির্ভাব

এই কবিতাটির তাৎপর্য সম্বন্ধে স্বয়ং কবি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এই—

কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে-মায়া শরৎ-ঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে, মনকে রাঙিয়ে তোলে; এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ক্ষণিকার 'আবির্ভাব' কবিতায় একটা কোনো অন্তর্গূঢ় মানে থাকতে পারে; কিন্তু সেটা

গৌণ; সমগ্রভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে; সেটা যদি মনোহর হ'য়ে থাকে তা হ'লে আর কিছু বল্‌বার নেই।

তবু 'আবির্ভাব' কবিতায় কেবল সুর নয়, একটা কোনো কথা বলা হয়েছে; সেটা হচ্ছে এই যে—এক সময়ে মনপ্রাণ ছিল ফাল্গুন মাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণগন্ধগান নিয়ে; সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব—তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় একটি বিশেষ বাণী ছিল। তার পরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হ'য়ে এল; তখন সেই প্রথম-যৌবনের বাসন্তী রঙের আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যাম সমারোহ—জীবনে বাণীর বদল হলো, বীণায় আর এক সুর বাঁধ্‌তে হবে; সেদিন যাকে দেখেছিলুম এক বেশে এক ভাবে, আজ তাকে দেখ্‌ছি আর-এক মূর্তিতে, খুঁজে বেড়াচ্ছি তারি অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন। জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ, সে এক হ'লেও তার জন্যে একই আসন মানায় না।—৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৩।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি (ভারতী, ১২৯৪ বৈশাখ, ২২-২৩ পৃষ্ঠা) নামক এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে লিখিয়াছিলেন—

লিখিতে হইলে যে বিষয় চাইই এমন কোনো কথা নাই।......বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে।......বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে, তাহা আনুষঙ্গিক এবং তাহা ক্ষণস্থায়ী।

বাস্তবিক এই কবিতাটিতে বিষয়বস্তু হইয়াছে গৌণ; উহার ভাষা ছন্দ সুর লালিত্য অনুপ্রাস মিলিয়া কবির মনের একটি বিশেষ মুহূর্তের যে উল্লাস ও অনুভব প্রকাশ করিয়াছে তাহাতেই ইহা একটি উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শব্দের ইন্দ্রজাল বুনিয়া পাঠকের বা শ্রোতার মনে যে মায়া রচনা করে, সেইটিতেই এই কবিতার বাহাদুরি এবং ইহার মহামূল্যতা।

এই কবিতার সপ্তম কলিতে আছে—'বনবেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ!' বেতস মানে বেত, তাহা নিরেট, তাহাতে বাঁশি হইতে পারে না। 'বনের বেণুর বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ' বলিলে অনুপ্রাস ও অর্থ দুইই রক্ষিত হইতে পারিত। এই কথা কবির গোচর করিলে তিনি আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

কোনো ভাল অভিধান দেখো তো, বেতস বল্‌তে বাঁশও হয় এমন সাক্ষ্য পেয়েছি। কবিতা যখন লিখেছিলেম তখন খাগ্‌ড়ার কথা ভেবেছি—শরেতে যে ভদ্ররকম বাঁশি হয় তা নয়, কিন্তু ওর মর্মস্থানের ফাঁকটুকুতে নিঃশ্বাস সঞ্চার ক'রে সুর বের করা যায় ব'লে বিশ্বাস করি। কিন্তু যখন দেখা গেল বেতস বল্‌তে শর বোঝায় না এবং অর্থমালার সর্বপ্রান্তে বেণু কথাটা পাওয়া গেল তখন বাগর্থের দ্বন্দ্ব মিট্‌ল দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তুমি কোন্ কৃপণ অভিধানের দোহাই দিয়ে আবার ঝগড়া তুল্‌তে চাও!

ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে—অভিধানে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ নাই। না থাকুক। ইহার পরে যত অভিধান রচিত হইবে তাহাতে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ লিখিতে হইবে। দাশু রায় 'কোদণ্ড' শব্দ কোদাল অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে আজ হইতে কোদণ্ড মানে কোদালও হইবে। সেক্সপীয়ার প্রভৃতি কবিরা কত কত শব্দ নিজেদের মনগড়া অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। অভিধানকারগণ তাহা পরে অভিধানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এমনি করিয়াই তো এক শব্দের বিভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে।

কল্যাণী

কবির বীণায় কত সুর কত রাগিণী সৌন্দর্যকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া বাজে। যাহা কিছু সুন্দর তাহাকে সুরের জালে বন্দী করিয়া কবি আনন্দ লাভ করেন। কবি সৌন্দর্যের ও ঔদার্যের, শ্রীর ও কল্যাণের উপাসক।

নারীর রূপ কাব্যজগতে বড় আদরের সামগ্রী। সহস্র কবির বীণায় সহস্র রূপে রমণীর রূপের ও সৌন্দর্যের স্তুতি বাজিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র রমণীর রূপের পূজারী নহেন। তরুণ কবি প্রথমে অবশ্য 'বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী' যে রমণী, যাহার অঞ্চলচ্যুত বসন্তরাগরক্ত কিংশুক-গোলাপ পৃথিবীকে পাগল করিয়া দেয়, সেই দীপ্তশিখা-স্বরূপিণী রমণী-মূর্তিকে নানা ভাবে নানা রূপে বন্দনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যসাধনা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কামনা সংযমের কাছে পরাভূত হইল, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। অবশেষে তিনি দেখিলেন এ বিশ্বের সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত কল্যাণ যিনি আপনার পদতলে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া এ-জগৎকে প্রতি পদে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি স্নিগ্ধ-শান্ত-মূর্তি দেবী অন্নপূর্ণা; শিব শঙ্কর তাঁহারই কাছে ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া আছেন। তিনি ত্যাগের প্রতিমূর্তি, তাঁহার মধ্যে ভোগের চিহ্ন মাত্র নাই। অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করিবার জন্যই শিব নিজেকে ভিখারী বলিয়া স্বীকার করেন, এবং ইহাতে তাঁহার একটুও লজ্জা নাই।

কবি দেখিতেছেন রমণী সংসারের সমস্ত ভোগস্পৃহা বর্জন করিয়া শুচিসুন্দর স্মিত মূর্তিতে গৃহকার্যে রত আছেন, চারিদিকের ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রাঘাতের মধ্যেও তিনি তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত গৃহখানি অটুট রাখেন। সেই নিবিড় শান্তির অন্তরে

বিরাজমান তাঁহার গৃহখানি যৌবন-চাঞ্চল্যহীন। গৃহখানির চারিদিকে পুষ্পিতা লতা বেষ্টন করিয়া উহাকে সৌন্দর্যের মন্দিরে পরিণত করিয়াছে; তাহাকে ঘিরিয়া শিশুদের আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তপোবনসুলভ পবিত্রতার মধ্যে কল্যাণী রমণীর এই ভবনখানি কবি কীট্‌সের বর্ণিত সাইকীর Bower-এর কথা মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু কল্যাণী রমণীর মন্দিরে যে মাদকতাশূন্য শুভ্রশ্রী প্রতিষ্ঠিত তাহার সন্ধান কীট্‌স্‌ পান নাই। এই অচঞ্চল শান্তি ও ভোগবিরতির মধ্যে কল্যাণী আপনার কল্যাণব্রতে নিরতা। উষা ও সন্ধ্যা তাঁহার কাছে আসিয়া পূজারিণীরূপে তাঁহার পূজা করে। কর্মক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত-হৃদয় হতভাগ্য মনুষ্যের জন্য তিনি নির্জনে অপরূপ শান্তিমণ্ডিত মন্দিরে হৃদয়ের সুধাপাত্র উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবার জন্য পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন। তাঁহার স্নিগ্ধ স্পর্শে আশাহীন উদ্যমহীন জীবন 'শান্তির পূর্ণতায়' ভরিয়া উঠে।

অপূর্ব-স্নিগ্ধজ্যোতিঃশালিনী এই মহীয়সী নারীমূর্তি দেখিয়া কবি উচ্ছ্বসিতহৃদয় হইয়া গাহিয়াছেন—ওগো লক্ষ্মী, ওগো কল্যাণী, তোমার এই মাতৃমূর্তিই নারীত্বের চরম পরিণতি। তুমি স্বর্গের অপ্সরী নও, তুমি স্বর্গের ঈশ্বরী। তুমি কেবল ভোগবাসনা-পরিতৃপ্তির উপকরণমাত্র নও, তুমি অনন্তের পূজার মন্দিরে হৃদয়কে লইয়া গিয়া একটি অনাবিল শান্তির মাধুর্যে তাহাকে পূর্ণ করিয়া দাও। তোমার কল্যাণী-মূর্তির নিকটে রমণীর রূপ, রমণীর জ্ঞান, সকলই তুচ্ছ। অক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যে তুমি যখন আপন গৃহকর্মে ব্যাপৃতা থাকো, তখন সমস্ত আকাশ জুড়িয়া শব্দহীন মাঙ্গল্য-শঙ্খ বাজিয়া বাজিয়া তোমার কার্যকে অভিনন্দিত করে ও শুভ-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলে। পৃথিবীতে সকল-কিছুই পরিবর্তনশীল কালের অধীন; কিন্তু তোমার সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি চিরকাল একই প্রকার থাকিয়া যায়। শীত যায়, বসন্ত আসে, আবার বসন্তও বিদায় লয়, কিন্তু তুমি যে কল্যাণী সেই কল্যাণীই থাকো। জরা-যৌবনের পরিবর্তন সেই কল্যাণীমূর্তির কোনো পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। নদীর মতো তুমি তোমার পার্শ্বস্থিত সকল-কিছুকে কল্যাণ বিতরণ করিয়া জীবনের শেষ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছ। তুমি আছ বলিয়া সংসার আছে, নহিলে সংসার কবে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইত। আমি কবি, আমি সহস্র বস্তুর বন্দনা গাহিয়া ফিরি। কিন্তু সকল-কিছুর বন্দনা-গান শেষ করিয়া আমার কবিত্বের চরম পরিণতির যে গান, আমার প্রতিভার যাহা শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, আমার শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি তাহা আমি তোমারই জন্য রাখিয়াছি।

এই কবিতাটি সৌন্দর্যের কল্যাণীমূর্তির বন্দনা, ভোগবিরতির শান্তির আরতি।

নৈবেদ্য

(আষাঢ়, ১৩০৮)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে নৈবেদ্য একটি অপরূপ অনবদ্য অভিনব সৃষ্টি। এতদিন কবি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেছিলেন। তাহার পরে মধ্যে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' রচনা করিয়া সার্বজনীন উপাসনার পথনির্দেশ করিতেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পরিবারের মধ্যে ও দেশের সম্মুখে যে ধর্মপ্রাণতা আধ্যাত্মিকতা ও সত্য-তপস্যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে বাল্যাবধি পড়িতেছিল। সেই সর্বসংস্কারমুক্ত সত্যধর্মের উপলব্ধির প্রকাশ এই নৈবেদ্য পুস্তকের কবিতাগুলি। কিন্তু এই উপলব্ধি তাঁহার বুদ্ধির উপলব্ধি, জ্ঞানের উপলব্ধি। ভগবানের সন্নিধি লাভ করিবার বাসনা ও সত্যপথে চলিবার প্রার্থনা এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ঐ বাসনা ও প্রার্থনার মধ্যে এমন একটি বলিষ্ঠ তেজস্বিতা ও কঠোর সংযম আছে, যাহা মহর্ষির পুত্রকে ঋষিত্বের উত্তরাধিকারী করিয়াছে। স্বদেশের ধর্মসাধনার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার সহিত সর্বদেশের সর্বকালের যে সত্যধর্ম তাহারই বোধ এই কবিতাগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সাধক রবীন্দ্রনাথ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা ও আরাধনার নৈবেদ্য সাজাইয়া বর চাহিতেছেন পূর্ণ মনুষ্যত্ব—নিজের জন্য ও স্বদেশবাসীর জন্য। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, ধর্মের পথে চলা কঠিন দুঃখজনক বলিয়া কবি জানেন, অথচ তাহারই প্রতি তাঁহার লোভ। তিনি দুঃখ বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া দুঃখ বহন করিবার শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। কবি এখানে যোগী—পরম মঙ্গলময়ের প্রতি তাঁহার চিত্ত সতত উন্মুক্ত, সত্যস্বরূপের সম্মুখীন এবং ব্রহ্মে যোগযুক্ত। এই পরমসমাহিত অবস্থায় এমন অনেক কথা তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে যাহা ঋষিদৃষ্ট সূক্তেরই মতন পূর্ণ ও অগ্নিগর্ভ। ভারত-সম্বন্ধে যে-সমস্ত কবিতা নৈবেদ্যে আছে, সে-সমস্তও পূর্ণ এবং বীর্যবান্ মুক্ত-দর্শনের আলোকে ভাস্বর। কাব্যের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে। কবির বীর্যবান্ আত্মা সেই সৃষ্টিমহিমা লাভ করিয়াছে এই কাব্যে। এই কাব্যে কবি প্রকৃতিকে ও মানবকে সোপান করিয়া প্রকৃতির ও

মানবের অধীশ্বরের সম্মুখে উপনীত হইয়াছেন।—(কাজী আবদুল ওদুদ বিরচিত রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ দ্রষ্টব্য।)

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের সত্য ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমিতে চিত্তকে স্থাপিত করিয়া সমগ্র পৃথিবী ও সমস্ত মানবকে ভালবাসিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মবিহার লাভ করিতে চাহিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে ও তাঁহার জীবনে উপনিষদের শিক্ষার যে প্রভাব ছিল, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে নৈবেদ্যের কবিতাগুলিতে। কবির আধ্যাত্মিক জীবন উন্মেষ লাভ করিবার আকুতি প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মের সম্মুখে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের জন্যও কবি সত্যবোধ সত্যধর্ম সত্যনিষ্ঠা বল ও বীর্য প্রার্থনা করিতেছেন। কবি স্বদেশকে তাহার প্রাচীন আদর্শের উপরই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিতেছেন।

মুক্তি

(১৩০৭)

সকল দেশের মধ্যযুগের কবি দার্শনিক ও ধর্মপ্রবর্তকদের এই ধারণা ছিল যে, এই মর্ত্যে কেবল দুঃখই আছে; এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সংসারে অনাসক্ত হইতে পারিলেই আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইয়া যাইবে, এবং সেই দুঃখনিবৃত্তির নামই মুক্তি। বৈষ্ণব দার্শনিকেরাই আমাদের দেশে প্রথমে মুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ঘোষণা করেন।* চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

> অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
> ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥
> তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
> যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন—

> মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
> ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধারণার অগ্রদূত হইয়া সংসারকেই ধর্মসাধনার পরম তীর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষ সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণ্যের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ পবিত্র ও উন্নত হইয়া উঠে। কবির দৃষ্টিতে এই জগৎ মায়া মাত্র নহে, ইহা ব্রহ্মেরই প্রকাশক্ষেত্র ও লীলাক্ষেত্র—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥

যে বিশ্ব আমাদের চেতনার ভিতরে, বাসনার ভিতরে, বেদনার ভিতরে, কর্মের ভিতরে, সকল অনুভবের ভিতরে স্পন্দিত হয়, তাহা তো মায়াময় মোহময় মিথ্যা অথবা ক্ষতিকারক হইতে পারে না।

এইজন্য কবি বলিয়াছেন—

হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরাজিতে যাহাকে emotion বলে, তাহা আমাদের হৃদয়ের আ-বেগ, অর্থাৎ গতি; তাহার সহিত বিশ্ব-কম্পনের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের ধ্বনির সহিত, তাপের সহিত তাহার একটা স্পন্দনের যোগ, একটা সুরের মিল আছে।...বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্যমাত্রই...একটা অনির্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরূপ ভাবকে অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলিয়া নাম দিয়া থাকেন।......সঙ্গীত ও সন্ধ্যাকাশের সূর্যাস্তচ্ছটা কতবার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব-জগতের হৃদ্‌স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে; যে একটি অনির্বচনীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের কোনো যোগ নাই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সঙ্গীত ও সূর্যাস্ত কেন, যখন কোনো প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে, তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশ-কালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মতো অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

এইরূপে প্রবল স্পন্দনে আমাদিগকে বিশ্বস্পন্দনের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। বৃহৎ সৈন্য যেমন পরস্পরের নিকট হইতে ভাবের উন্মত্ততা আকর্ষণ করিয়া লইয়া একপ্রাণ হইয়া উঠে, তেমনি বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্য-যোগে যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখন আমরা সমস্ত জগতের সহিত একতালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলের প্রত্যেক কম্পমান পরমাণুর সহিত একদলে মিশিয়া অনিবার্য আবেশে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।

—পঞ্চভূত, গদ্য ও পদ্য

কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেও এই কথাই বলিয়াছেন—রবি-রশ্মি, পূর্বভাগে দ্রষ্টব্য।

মালিনী নাটকের মধ্যেও কবি বলিয়াছেন যে—দূর হইতে নিকটের মধ্যে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টের মধ্যে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্মকে ভালো করিয়া উপলব্ধি করা যায়।

কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন তাহার স্নেহ-প্রেম লইয়া

আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়; যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র যে সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যে সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তি-রসের আস্বাদন।

—বঙ্গভাষার লেখক, ৯৮০-৮২ পৃষ্ঠা

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই কবিতার ভাবার্থ এই—এই সংসার ও এই মানবজীবন মিথ্যা মরীচিকা মাত্র অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় নহে। প্রকৃত-পক্ষে ভগবান সংসারের এই বিচিত্রতা ও জীবনের এই নানা সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। সুতরাং মুক্তি-লাভের জন্য ইহসংসারকে বর্জন করিয়া পরলোকাপেক্ষী সাধনা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। সংসারে থাকিয়াই, আপনার কর্তব্য করিয়াই ভগবানকে লাভ করা যায়।

আমাদের দেশের বৈরাগ্যবাদী উদাসীনতা ও সাংসারিক বিষয়ে অলস নিশ্চেষ্টতা এক দিকে, এবং পাশ্চাত্তাদেশের বৈষয়িক সম্ভোগ-লোলুপ উদ্দামতা অন্য দিকে,—এই উভয়েরই প্রতিবাদ করিয়া কবি বারংবার বলিয়াছেন—মুক্তি ও বন্ধনের সমন্বয় করিতে হইবে, স্ব-অধীন হইয়া স্বাধীনতার সাধনা করিতে হইবে, আত্ম-উপলব্ধি করিয়া বিশ্বের সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিই উচ্চতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সোপান।

এইরূপ কথা তিনি নৈবেদ্যের নানা কবিতার মধ্যে বলিয়াছেন—

সংসারে বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।

বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা ব'সে রব, মুক্তি আরাধিতে?
জন্মেছি যে মর্ত্যলোকে ঘৃণা করি' তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

মুক্তি কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে আমি জগৎ-ছাড়া নই, আর জগৎ আমি-ছাড়া নয়। অতএব আমি ও জগতের মধ্যে কোনো বন্ধনই নাই। যদি-বা থাকে, তবে তাহা ছেদন করিবার কোনো উপায়ও নাই। মানুষ সমস্তকে লইয়াই সম্পূর্ণ। প্রেমেই মুক্তি, প্রেমে সব স্বার্থপরতার গণ্ডি মুছিয়া যায়, প্রেমে সব আসক্তির মৃত্যু ঘটে। তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নাই তবু আমাদের জন্য নিরন্তরই সমস্তই ত্যাগ করিতেছেন। যিনি প্রেমস্বরূপ, তিনি তো কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। এইজন্য কবি বলিয়াছেন—

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে,
আমি আপনাকে ভাই মেল্‌ব যে বাইরে।

—গীতবিতান

মুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।

বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর-মাঝখানে।

বৈষ্ণবদের যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা বৈকুণ্ঠের জন্য সঞ্চিত থাকে, হেগেল তাহা সংসারেই মিটাইতে চাহেন। কবির মত অনেকটা হেগেলের মতের অনুগামী—ইহা Hegel-এর দর্শনের Ideal Realism।

তুলনীয়—

He prayeth best who loveth best.
—Coleridge, *Ancient Mariner.*
For Love is Heaven, and Heaven is Love.
—Scott, *Lay of the Last Minstrel.*

Leigh Hunt-এর *Abu Ben Adhem; Browning-*এর *Saul, Rabbi Ben Ezra.*

কবিতা-পাঠ—

প্রদীপের মতো ইত্যাদি—জগতের প্রত্যেকটি পদার্থ এক-একটি দীপবর্তিকার মতো বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার ইত্যাদি—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতিই উচ্চতর আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান।

মোহ—বিশ্বজগৎকে সত্য বলিয়া অনুমান করিয়া তাহাকে ভালোবাসার নাম মোহ বা মায়া।

প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া—তুলনীয়—

যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।

—চৈতালি, পুণ্যের হিসাব

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

—চৈতালি, অভয়

কবি বলিতেছেন যে প্রকৃতি বিশ্বরাজের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁহার প্রেমের ক্ষেত্র। প্রকৃতির আবেশ-বিহ্বলতা, জীবনের মোহ ও বন্ধন, অন্তরের আনন্দ ও মুক্তির তৃষ্ণা—সমস্তই বিশ্ববিমোহনের চরণতলে একত্র হইয়া আছে।

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ

এই কবিতাটি কবি তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উপাসনায় ভগবানের প্রেমে তন্ময় হইয়া যাইতে দেখিয়া মুগ্ধ অন্তরের আনন্দের সহিত লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। মহর্ষি বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মজ্ঞানে কিরূপ নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতেন তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ইহার পরে দিয়াছেন—

এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তাঁর গভীর গাম্ভীর্য।

—আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা, প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন, ৭৪২ পৃষ্ঠা

দীক্ষা

বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়া মানুষ একটি ঐক্যকে খোঁজে—সেটি শিবম্। মঙ্গলের মধ্যেই দ্বন্দ্ব—অঙ্কুর এইখানেই দুইভাগ হইয়া বাড়িতে চলিয়াছে; মঙ্গলের মধ্যেই সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ। মাটির মধ্যে যে বীজটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্ত, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না; লড়াই বাধিল শিবকে জানিতে গিয়া—শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র, এইখানে মহদ্‌ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম ও পরীক্ষা। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ শান্তির মধ্যে তাহার গর্ভবাস। কবি ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী সত্যের, ন্যায়ের, ধর্মের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে-

চাহিতেছেন। বাঙালীর ভাববিহ্বলতা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কবি বহু কবিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন।

ন্যায়দণ্ড

কবি মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন না; তাঁহাকেই নিজের চিত্ত-মন্দিরে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই সৈনিকরূপে এই সংসার-বক্ষে দৃঢ়-পদক্ষেপে বিচরণ করিতে চাহিতেছেন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে

কবি ভারতের অতীত গৌরবের সহিত বর্তমানের অধঃপতন তুলনা করিয়া পুনরায় সেই অতীতের মহিমায় স্বদেশকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের ২।৫ ও ৩।৮ বাণী দুইটিকে কবি এই কবিতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রাচীন-ভারতের আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

শিক্ষা

কবি প্রাচীন ভারতের যে-সব পরিচয় কাব্যে ও শাস্ত্রে পাইয়াছেন, সেই আদর্শ অনুধাবন করিয়া এই সনেটটি লিখিয়াছেন।

কবিতা-পাঠ—

নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি ইত্যাদি—ইহার পরিচয় আমরা পাই কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যে—বার্ধক্যে মুনি-বৃত্তীনাম্। —রঘুবংশম্, ১ম সর্গ।

ক্ষমিতে অরিরে—প্রাচীন ভারতের যুদ্ধও ধর্মযুদ্ধ ছিল, যুদ্ধের সময়েও ন্যায়-পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া বীরের পক্ষে গ্লানি ও লজ্জার কারণ হইত। প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের আদর্শ ছিল—

বিরথং বিগতং ব্যথং বিবর্ণং বিমুখস্থিতম্।
যুদ্ধোৎসাহ-হতং হত্বা ব্রহ্মহা জায়তে নরঃ॥

—বহ্নিপুরাণ। মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৪৭

সর্বং কর্মফলং ব্রহ্মার্পণম্ অস্তু।

—শ্রুতি

গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার—প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হইত—তাহার মধ্যে নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ দুইটি; অর্থাৎ প্রত্যহ অন্ততঃ একটি অতিথির ও কোনো-না-কোনো প্রাণীর সেবা করিতে হইবে, তাহাদিগকে অন্নপানীয় দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে হইবে, তাহারাও গৃহস্থের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এই মনে রাখিতে হইবে।

নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল—দৈন্য মানুষের অক্ষমতার পরিচায়ক, এজন্য দৈন্য লজ্জাজনক; কিন্তু সক্ষমের স্বেচ্ছাকৃত যে দৈন্য ত্যাগের মহত্ত্বে মণ্ডিত হয়, তাহাতে সেই দৈন্য মাহাত্ম্যের প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাদ্ ব্রহ্ম-জ্ঞান-পরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ৮ম উল্লাস

ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

—ঈশোপনিষৎ, ১ম শ্লোক

যুগান্তর ও স্বার্থের সমাপ্তি

এই দুইটি সনেট বোয়ার-যুদ্ধের সময়ে লেখা। ১৯০০ সালে বোয়ার-যুদ্ধ হয়। সেইজন্য শতাব্দীর সূর্যাস্তের কথা বলা হইয়াছে। ইংরেজ ও ভারতীয়দের প্রতি ওলন্দাজ উপনিবেশী বোয়ারেরা অন্যায় অত্যাচার করিতেছে এই অজুহাতে ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পরে পররাজ্য কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাকে কবি নিন্দা করিতেছেন।

কবিদল চীৎকারিছে—এই সময়ে কিপ্‌লিং প্রভৃতি কবিরা বোয়ার-বিদ্বেষ জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

বলাকা

১৩২১ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৩২৩ সালের বৈশাখ পর্যন্ত কবি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং সেই সময়ের রচিত কবিতাগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, বাংলা ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে।

বলাকা কাব্যখানি ৪৬টি পৃথক্ পৃথক্ কবিতার সঞ্চয়ন। ইহাদের মধ্যে কবি মাত্র ৮-টি কবিতার নাম দিয়াছেন, আর বাকীগুলির কোনো নাম দেন নাই। বলাকা নামটি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। বলাকা-পংক্তি যখন আকাশে তোরণহীন লম্বিত মালার ন্যায় দুলিতে দুলিতে মানস-সরোবরের দিকে উড়িয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ ও স্বতন্ত্র মূর্তি আমাদের দৃষ্টিতে তেমন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, যেমন প্রতিভাত হয় তাহাদের সম্মিলিত মালিকাবদ্ধ সমগ্র পংক্তির গতিচ্ছন্দ ও গতিভঙ্গিমা। বলাকার কবিতাগুলির প্রত্যেকেরই এক-একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য তো আছেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও তাহাদের সম্মিলিত সমষ্টিফল একটি স্বতন্ত্র বিশেষ তাৎপর্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বলাকার অধিকাংশ কবিতার মধ্য দিয়া এই সমূহাত্মক তাৎপর্যের এক-একটি বিশেষ প্রকার ও বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় কবি সেইজন্যই কবিতাগুলির নাম দিতে দিতে সজাগ হইয়া নাম দেওয়া বন্ধ করিয়া প্রক্রম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। নামের মধ্যে যাহা বাঁধা পড়ে, তাহার স্বতন্ত্রতা নামের আবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। যেখানে প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়া একটি চঞ্চল নৃত্যগতির পাদবিক্ষেপ সূচিত হয়, সেখানে এই পাদবিক্ষেপকে সমস্ত নৃত্যের মধ্যে এক এক করিয়া দেখিলে তাহার সমগ্রতার তাৎপর্য বুঝা যায় না।

দোদুল্যমান মালার ন্যায় বলাকা-পংক্তি যখন আকাশপথে উড়িয়া যায়, তখন প্রত্যেকটি বক বা হংসের যে স্থান-সন্নিবেশের বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে, তাহা আমাদের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করে না। এই স্থান-সন্নিবেশের বৈচিত্র্যের ফলে বলাকা-মালাটি যে বিচিত্র ভাবে বিচিত্র রূপে আমাদের মন হরণ করে, সেই বর্ণনাই সমগ্র বলাকার বর্ণনা। আকাশে ঘনকৃষ্ণমসীতুল্য মেঘ উঠিয়াছে, ঝড়

বহিয়া চলিয়াছে, বলাকার মালাটি মধ্যে মধ্যে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। এই দুর্দম বিপদের মধ্যে, মেঘগর্জনের মধ্যে, বিদ্যুৎঝলকের মধ্যে বলাকার কোনো ভয় নাই; তাহাদের মালা এক একবার ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই তাহারা তাহা গাঁথিয়া তুলিতেছে। মেঘের সম্মুখে আসিয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহারা যেন নূতন জীবনের সন্ধান পায়। তাহারা মানস-সরোবরের যাত্রী, বিপদের মধ্যে যাত্রা করিয়া চলাই তাহাদের ধর্ম। তাই তাহারা বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া, বিপদ অতিক্রম করিয়া সুদূর অজানা মানস-সরোবরের দিকে যাত্রা করে; তাই বলাকা কথাটি উচ্চারণ করিলেই আমাদের মনে সর্ববিপজ্জয়ী একটা অজানার উদ্দেশ্যে অন্তহীন অকারণ অবারণ চলা ও গতিচ্ছন্দের কথা মনে পড়ে। বলাকা বইখানিতেও এমনি একটি গতিচ্ছন্দের লীলাভঙ্গি চিত্রিত করিতে কবি চেষ্টা করিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিরনবীন অন্তরাত্মাতে যে গতিধর্ম অনুভব করেন, সেই গতিধর্ম নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। নিজের সঙ্গে বাহিরের জগতের ও বাহিরের দ্বন্দ্বে তাঁহার কি ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাও প্রধানত এই কাব্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বিশ্বময় এই অকারণ অবারণ চলার লীলাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গহন রাত্রিকালে গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া মানুষ অজানা সাগরে পাড়ি দেয়, তাহার জীবনীশক্তির প্রবাহ তাহাকে কোন্ এক সুদূর জগৎ হইতে অন্য জগতে, দেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া যায়। সেই অন্ধকার রজনীতে রজনীগন্ধার গন্ধের ন্যায় অনন্তের একটি সুগন্ধ মানবের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া রাখে। যদি এই অনন্তের অভিমুখে যাত্রা, এই গতি, এই অকারণ অবারণ চলা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হইত, তবে বিশ্বে মৃত জড়পুঞ্জের সমাবেশ মহাকলুষতার সৃষ্টি করিত। কিন্তু গতিশক্তির নিত্যমন্দাকিনী মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবনকে নিরন্তর শুচি করিয়া তুলিতেছে। মৃত্যু জীবনের মধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুকে আমরা পাই না; চিরনবীনতার মধ্যে, অমৃতের মধ্যে মৃত্যুর যথার্থ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'বলাকা' বলিলেই যেমন একটি গতিধর্মের কথা মনে পড়ে, তেমনি এই কাব্যখানির মধ্যেও কবি বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটি গতিচ্ছন্দের বর্ণনা করিয়াছেন। এই ছন্দ বিশ্বকে ক্রমাগত "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনো-খানে"—এই বাণী দিয়া অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। বলাকার মতোই এই কাব্যের কবিতাগুলি এক অজানা রাজ্যের যাত্রী। এইজন্যই কবি এই কাব্য-খানির নাম দিয়াছেন 'বলাকা'।

আমাদের দেশের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে সত্য স্থির—অচল। শঙ্করাচার্য সত্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—কালত্রয়াবাধিতং সত্যম্—সত্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে সমভাবে অবস্থিত, সত্য ত্রিকালে অপরিবর্তিত। কিন্তু বর্তমান যুগের দর্শনের বাণী হইতেছে—সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক বলেন—গতি নাই এমন বস্তু জগতে নাই; যাহাতে গতি নাই, তাহা নিছক কল্পনা মাত্র, তাহা সত্য নহে। গতির বাণী ইউরোপে বের্গ্‌সঁ প্রথম প্রচার করেন, এ জন্য তাঁহার দর্শনকে গতিবাদ বলা হয়। যাহার জীবনীশক্তি আছে, সে আর-সকল জিনিসকে নিজের করিয়া লইয়া তবে নিজেকে প্রকাশ করে; তাহার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে,—খণ্ডভাবে দেখিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। গতি বস্তুর একটা অবস্থা মাত্র নয়—বস্তু ও স্থান-কালের সম্পর্ক মাত্র গতি নয়, গতি এক স্থিতি হইতে অপর স্থিতিতে পরিণতি মাত্র নয়। কাল অবিভাজ্য, অনন্ত-প্রবাহ, কালে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নাই। স্থানও অনন্ত, কেবলমাত্র বস্তুর সহিত বিশেষ সম্পর্কে কাল ও স্থানকে প্রবিভক্ত মনে হয়।

Space is a plenum, co-extensive, identical, with totality of all existent and extended bodies. There is no empty space either between bodies or between their parts. The structure of space and the structure of the extended bodies that fill space is one and the same. Similarly time was held to be identical in the concrete with motion and continuous change. There are as many times as there are motions.

আধুনিক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে নিরবচ্ছিন্ন স্থান বা কাল বলিয়া কিছু নাই, কেবল বস্তুর গতিতেই আমাদের মনে স্থান ও কালের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব গতিই একমাত্র সত্য।

অতএব সত্য অনন্ত প্রবহমান অবিভাজ্য। গতি রুদ্ধ হইলেই সত্য জীবনহীন হইয়া জড়বস্তুতে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথও বলাকা পুস্তকের সমস্ত কবিতার মধ্যেই এই গতি-বাদকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গতি, কেবল গতি, ক্রমাগতই চলা। থামিতে গেলেই—

উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।

কিন্তু কবি এইখানেই তাঁহার কথা শেষ করেন নাই। উদ্দেশ্যহীন কেবল গতি আমাদিগকে কোনো গম্যস্থানে লইয়া যায় না, সে গতিতে ক্লান্তি আনে,

প্রাণ অতৃপ্তি অনুভব করে। এই জন্যই কবি নবম কবিতাতে—তাজমহলে—গতির মধ্যে আনন্দের রূপ দর্শন করিয়াছেন—

সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি' সে অনঙ্গ স্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।

এইখানে আমাদের কবি দার্শনিক বের্গ্‌সঁকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বের্গ্‌সঁর গতি কেবল অফুরন্ত চলা মাত্র; তাহা কোনো লক্ষ্য-দ্বারা নির্দিষ্ট নহে, কোনো আনন্দ-দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে। এইখানে বের্গ্‌সঁ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব—কবি কেবল গতিতেই তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই, তিনি আনন্দরসের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন। বের্গ্‌সঁ জীবনের মধ্যে কেবল গতি দেখিয়াছেন, তিনি অসীমের সহিত জীবনের কোনো যোগ দেখিতে পান নাই; সত্য তাঁহার নিকট ভালোমন্দের অতীত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্যই তিনি জীবনের উদ্দেশ্য, গতির লক্ষ্য নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট কেবল গতিতে মানবের মুক্তি নয়,—

মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে—

তবে তো সমস্তই পণ্ড।

আমাদের দেশের আর একজন শক্তিশালী লেখকও গতির মধ্যেই সত্যকে দেখিয়াছেন—

এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া নিত্য কোনো বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে; যুগে যুগে কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে, এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।

তোমরা বলো চরম সত্য, পরম সত্য; এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান্।......তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত সনাতন অপৌরুষেয়! মিছে কথা। মিথ্যার মতোই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি ক'রে চলে। সত্য শাশ্বত সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ সত্যকে গতিতে স্বীকার করিয়াও এক বিশেষ লক্ষ্যে গিয়া

উপনীত হইয়াছেন—মানুষ ক্রমাগত নিজেকে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিবে দেবত্ব লাভ করিবার জন্য—

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ? —৩৭ নম্বর

রবীন্দ্রনাথের এই গতি-বাদ বলাকার যুগে নূতন উপলব্ধি নহে, ইহা তাঁহার আবাল্যের কবিতার মধ্যে বরাবরই ছিল—কবি আকৈশোর অনুভব করিয়া আসিয়াছেন যে কি জড়-বিশ্ব, আর কি প্রাণী-বিশ্ব দুইয়েরই মাঝে এক অবিরাম অবিশ্রাম গতিবেগ আছে—'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা'। এই গতিময় কবিতাগুলিকে একত্র করিয়া মোহিতচন্দ্র সেন 'নিষ্ক্রমণ' নাম দিয়াছিলেন। কবি চিরকাল বলিয়া আসিয়াছেন—আগে চল্ আগে চল্ ভাই। কিন্তু বলাকার যুগে এই গতি-বাদ একটি বিশেষ বেগ ও রূপ লাভ করিয়াছে। কবি বলিয়াছেন যে এই গতির মাঝেই বিশ্বের প্রাণশক্তির বিকাশ। গতি স্থগিত হইলেই আবিলতা আবর্জনা জমে ও মৃত্যু উপস্থিত হয়—

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে ;—
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে। —চৈতালি, দুই উপমা

অতএব গতিস্রোতে গা ভাসাইতে পারিলেই মুক্তি।

এই গতিশীল বিশ্বপ্রকৃতির রূপ বলাকায় ছন্দোলালিত্যে ও শব্দৈশ্বর্যে বাংলার কাব্যসাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে। কবির প্রত্যেক কবিতা অদৃশ্য অনন্তের ইঙ্গিতে ভরপুর। মৃত্যু তো কবির কাছে কোনোদিনই পরিসমাপ্তি নয় ; আর এই পৃথিবীটুকুই মানব-জীবনের কারাগার নয় ; এই মানব-জীবন—

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছে সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে।

* * * * *

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে। —শাজাহান

কবি তাঁহার যৌবনে 'মানসী' পুস্তকে 'নিষ্ফল কামনা' নামে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা অসম অমিত্র-ছন্দে লেখা। সেই অসম অমিত্র-ছন্দকে মিত্রাক্ষর করিয়া একটি নূতন রূপ, লালিত্য ও বেগ দান করিয়া কবি এক অপূর্ব নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন বলাকার ছন্দ।

এইরূপ বহু দিক্ হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় বলাকা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম।

এই বলাকা কাব্যখানি কবি স্বয়ং শান্তিনিকেতনে ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছিলেন; প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত সেই ব্যাখ্যানের নোট লইয়া ১৩২৮-২৯ সালের শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশ করেন। সেই নোটগুলি, এবং আমি কবির কাছে গিয়া ও পত্র লিখিয়া কবির যে-সব অভিমত সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সেই সব মিলাইয়া এই পুস্তকের কবিতার ব্যাখ্যা লিখিতে যাইতেছি।

নবীন

বলাকা—১ নম্বর

রচনার তারিখ ১৫ বৈশাখ, ১৩২১ সাল। ইহা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের সবুজপত্রে 'সবুজের অভিযান' নামে প্রকাশিত হয়।

যৌবনের গতিকে অভ্যর্থনা জানাইয়া এবং স্থিতিশীলতার প্রতি ধিক্কার জানাইয়া কবিতাটির আরম্ভ।

যৌবন চলার বেগে জীবনের পরিচয় প্রকাশ করে। যৌবন সমস্ত কিছু পরখ করিয়া লইতে চায়—শাস্ত্রবাক্যও বিনা-বিচারে মাথা পাতিয়া লইতে চায় না—সে বলে 'যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে।' যৌবনের মধ্যেই মানব-জীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার শক্তির প্রাচুর্য তাহার মনে পথ খুঁজিয়া লইবার প্রেরণা জাগায়; সে বলে—'পথ আমারে পথ দেখাবে', 'চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে', 'জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি'। —ফাল্গুনী

কিন্তু, প্রবীণতা চায় পরের অভিজ্ঞতার বলে সে বিঘ্ন-ব্যথাকে এড়াইয়া থাকিবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তাহারা আবার তাহাদের প্রবীণতার বোঝা চাপাইয়া দিবে।

এই জন্যই এই অশান্ত ও অশ্রান্ত যৌবনের প্রতি কবির অপরিসীম শ্রদ্ধা,—কারণ, যৌবনেই মানুষের জীবন বিকাশ লাভ করে। কবি তাঁহার ফাল্গুনী নাটকে ও বহু কবিতায় যৌবনের জয়গান করিয়াছেন। কবির নিজেরও চিরদিন যুবা থাকিবার ইচ্ছা। তিনি ক্ষণিকাতে 'কবির বয়স' কবিতায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

যৌবনই বিশ্বের ধর্ম, জরাটা মিথ্যা। যৌবন জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।

কবিতা-পাঠ

কাঁচা—যাহাদের মনে কোনো সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই, যাহাদের হওয়া স্থগিত হইয়া যায় নাই।

পাকা—যাহারা সংস্কারে বদ্ধমূল, জড়ভাবাপন্ন, এবং যাহাদের উন্নতি পরিণতি স্থগিত হইয়া গিয়াছে। যে স্থিতিশীল সে কাজের বাহির, সে নূতনের পথে গতির সাধনা করিতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—

Generally the elderly are conservatives; perhaps because, as some psychologists inform us, we are incapable of absorbing new ideas by twenty-five and the memory effects a charitable compensation, recalling only what was pleasant in the golden days of youth. With eyes fixed on the future, the young find monotony boring, and it is their ardour that forces on social revolutions. Accepting the accomplished fact, their elders give it their blessing and gravely take the credit.

শিকল-দেবী—মানুষের জীবনে সমাজে ও ধর্মে স্তূপাকার আবর্জনার মতো যে-সব প্রাণ-শক্তি-বিরোধী অনাচার ও কুসংস্কার জমা হয় তাহাই মানুষের শৃঙ্খল ও বাধা। ইহাকেই মনস্বী বেকন Idol বা অসত্যের বিগ্রহ বলিয়াছেন। কালাপাহাড় যেমন অসত্য দেবতার চিরশত্রু, নবীনও তেমনি। কিন্তু নবীনের প্রলয়-লীলার মধ্যে কেবল ধ্বংস নাই,—নব সৃষ্টির আয়োজনও আছে। নবীনের অভ্যুদয়ে যত কিছু নিয়মের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, নবীন সকল বাধা দূরীভূত করিয়া নূতন সৃষ্টির পথ করিয়া দিতে পারে।

ভুলগুলো—ভুল না করিলে কেহ সত্যকে লাভ করিতে পারে না। ভুল করিয়া সংশোধন করিতে করিতে তবে লোকে সত্যের সাক্ষাৎ পায়। অতএব ভুল করিবার সুযোগ পাইলেই মানুষ সত্যকে আবিষ্কার করিতে পারে।

দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি। —কণিকা

বিরাগী কর অবাধ পানে—নবীনের নেতৃত্বে গতিকে অবলম্বন করিয়া অজানার সন্ধানে আমাদের যাত্রা করিতে হইবে। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার মূল্য তো জানার সঙ্গে-সঙ্গেই ফুরাইয়া গিয়াছে। অজানাকে জানাই নবীনের সাধনা। কেবল শাস্ত্র মানিয়া গতানুগতিক ভাবে নির্দিষ্ট চিরাচরিত পথে যাহারা চলে তাহারা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করে। নূতনকে পাইতে হইলে নূতন পথেই চলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—এই প্রকাশের জগৎ এই গৌরাঙ্গী তা'র বিচিত্র রঙের সাজ পরে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তা'র মরণ—সে কুলকেই সর্ব্বস্ব ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না—সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি—সমস্তকে অতিক্রম ক'রে বিপদকে উপেক্ষা ক'রে সে যে চলেছে সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে আরোর দিকে প্রকাশের এই কুল খোয়ানো অভিসার যাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের কাঁটা-পথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে। ...

মানুষের মধ্যে যে সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগোচ্ছে—ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না তা'রা কেবল পুঁথির নজির জড়ো ক'রে কুল আঁকড়ে ব'সে রইল—তা'রা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা আনন্দলোকে জন্মেছে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য লীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা. যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

—জাপান-যাত্রী

সবুজ নেশা—নবীন নূতন সৃষ্টির জন্য ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতাই তাহার সবুজের নেশা ও ঝড়ের মধ্যে তাড়িতের বেগ। নবীন নূতন সৃষ্টির দ্বারা ধরণীকে সুন্দরতর সমৃদ্ধতর করিয়া তুলে—ইহাকেই কবি বলিতেছেন যে তুমি নিজের গলার মালা দিয়া বসন্তকে সুন্দরতর করো ও সুসজ্জিত করো। বসন্তের আগমনে পৃথিবী নবীন শোভায় ভূষিত হয়। নবীনের চেষ্টাতেও নূতনের আবির্ভাব হয়, নবীন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকেও সুন্দরতর করিয়া তুলে।

রবীন্দ্রনাথ এইরূপ কথা অনেক জায়গায় বলিয়াছেন।

তুলনীয়—

ভুলে যাই জীবনের ধর্ম তার নূতনত্ব; যা তার অপ্রাণের প্রাচীন আবরণ তাকেই মনে করি চিরকালের। সেই বোঝার ভারে আনে ক্লান্তি, আনে নিশ্চেষ্টতা। তাই মাঝে মাঝে স্মরণ করতে হবে সেই প্রাণের নির্মল নবীন রূপ, যে প্রাণ বারে বারে পুরাতনের মলিনতা বর্জন ক'রে নব জন্মে আপন কক্ষপথ প্রদক্ষিণের নূতন প্রারম্ভে প্রবৃত্ত হয়। জড় বস্তুর কোনো লক্ষ্য নেই। কিন্তু জীবনযাত্রা মানব-জীবনের একটা ব্রত,—নিজেকে সম্পূর্ণ করার ব্রত।......মনুষ্যত্বের ব্রত যদি আমরা গ্রহণ ক'রে থাকি...আন্‌তে হবে মনে নবজীবনের নবপ্রারম্ভতা। সেই নব-প্রারম্ভতার বেগ যদি দুর্বল হয় তা হলেই জয় হয় মৃত্যুর। চিত্ত যখন আপনাকে নূতন ক'রে উপলব্ধি করবার শক্তি হারায় তখনই জরা তাকে অধিকার করে।"

—১লা বৈশাখ, প্রবাসী, ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ

দেশী বিদেশী বহু কবিও যৌবনের ও নবীনতার জয় ঘোষণা করিয়াছেন। যথা,—

বালপনা গল সেলী বনৈহোঁ।

—কবীর

আমি আমার তারুণ্যকে ফকীরের মালা করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি।

Crabbed Age and Youth
Cannot live together:
Youth is full of pleasance,
Age is full of care;
Youth like summer morn,
Age like winter weather.
Youth like summer brave,
Age like winter bare:
Youth is full of sport,
Age's breath is short.
Youth is nimble, Age is lame:
Youth is hot and bold,
Age is weak and cold.
Youth is wild, and Age is tame:
Age, I do abhor thee,
Youth, I do adore thee.

—Shakespeare.

If thou regret'st thy youth, why live?
The land of honourable death
Is here:——up to the field and give
Away thy breath!
Seek out——less often sought than found
——A soldier's grave, for thee the best;
Then look around, and choose thy ground,
And take thy rest.

—Byron.

The end of life is not comfort, but divine being.

—A. E. (George Russel).

The whole secret of remaining young is to keep an enthusiasm burning within, by keeping a harmony in the soul.

—Amiel's Journal, The Secret of Perpetual Youth.

জীবনে বিপদ বরণ করিয়া জীবনকে জয়ী করিবার কথাও অনেক কবি বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন—

Be thou, Spirit fierce,
My spirit! Be thou me, impetuous one,
Drive my dead thoughts over the universe,
Like withered leaves, to quicken new birth;

Be my lips to unawakened earth
The trumpet of a prophecy! O Wind,
If winter comes, can Spring be far behind!
—Shelley, *Ode to the West Wind.*

Then, welcome each rebuff
That turns earth's smoothness rough,
Each sting that bids nor sit nor stand but go!
Be our joys three-parts pain!
Strive, and hold cheap the strain;
Learn, nor account the pang; dare, never
grudge the throe!
—Robert Browning, *Rabbi Ben Ezra.*

Knowing the possible, see thou try beyond it
Into impossible things, unlikely ends;
And thou shalt find thy knowledgeable desire
Grow large as all the regions of thy soul.
—Lascelles Abercrombie, *The sale of St. Thomas.*

Never was mine that easy faithless hope
Which makes all life one flowery slope
To heaven! Mine be the vast assaults of doom.
Trumpets, defeats, red anguish, age-long strife,
Ten million deaths, ten million gates to life,
The insurgent heart that bursts the tomb.
—Alfred Noyes, *The Mystic.*

দ্রষ্টব্য :— Sir Arthur Quiller Couch—*Studies in Literature.* সেখানে তিনি Meredith সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিতেছেন—"No poet, no thinker, growing old, had ever a more fearless trust in youth; none has ever had a truer sense of our duty to it :

'Keep the young generations in hail,
And bequeath them no tumbled house.'

বলাকা—২ নম্বর

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো!

১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসের সবুজপত্রে এই কবিতাটি 'সর্বনেশে' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। নবীনকে কবি বলিতেছেন 'সর্বনেশে'—কারণ সে পুরাতনের প্রতি মমতা দেখায় না, সে পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া লোপ করিয়া দিতে চায়। কিন্তু সর্বনেশেকে ভয় করিবার কোনো কারণও নাই; সর্বনেশে গতিই বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে সমর্থ।

কবিতাটির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

তরুণী যেমন পিতার ঘর ছেড়ে পতিগৃহে গিয়ে নিজ যৌবনের সার্থকতা লাভ করে, তেমনি আজ আমার অন্তরাত্মাকে পরিচিত ভূমি ছেড়ে অজানার দিকে আনন্দ-যাত্রা করতে হবে। এতে দুঃখ আছে, তবু এ সর্বনাশ নয়, কারণ এ পতিগৃহে যাত্রার মত।...প্রাচীন মতামত সংস্কার প্রভৃতি যা কিছু প্রিয় সব পিতৃগৃহের মত ত্যাগ করে নব রক্ত-পট্টাম্বরে পতিকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, সর্বনাশের যুগসন্ধিক্ষণ যে এসেছে।

বলাকা—৩ নম্বর

আমরা চলি সমুখ পানে

এই কবিতায় কবির আগের দুই কবিতার ধারাই চলিয়া আসিয়াছে।

আমরা পশ্চাতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অনবরত সম্মুখের দিকে ধাবিত হইব, এবং সম্মুখে চলিতে পারাতেই মুক্তি—সম্মুখধাবনে আমরা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতে গিয়া পৌঁছিব। যে গণ্ডির ভিতর আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা তাহাকে ঘর মনে করিয়াছিলাম, সেই সীমারেখা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের মহাযুগের যাত্রী হইতে হইবে। সম্মুখের বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া নূতন সমুদ্রতীরে পাড়ি দিতে হইবে।

শঙ্খ

এই কবিতাটি প্রথমে ১৩২১ সালের সবুজপত্রের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শঙ্খ মঙ্গলকর্মের সময়ে বাজানো হয়, যুদ্ধে যোদ্ধাদের উদ্বোধিত করিবা র জন্য বাজানো হইত। এই শঙ্খ হইতেছে বিধাতার আহ্বান—ইহার ধ্বনি যুদ্ধের আহ্বান ঘোষণা করে—সেই যুদ্ধ অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। উদাসীনভাবে এই শঙ্খকে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দিতে নাই। সময় আসিলেই দুঃখ-স্বীকারের আদেশ বহন করিতে হইবে ও প্রচার করিতে হইবে। শঙ্খের ধ্বনি সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য মিলিত করিবে, শঙ্খধ্বনি নবযুগকে মঙ্গল-সহ আহ্বান করিয়া আনিবে। গতির বাণীই অভয়শঙ্খ বা পাঞ্চজন্য শঙ্খ সতত ঘোষণা করে। তাহার ধ্বনি কানে গেলে বিরাম-বিশ্রাম ঘুচিয়া যায়, একটা গতির উন্মাদনায় চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এই শঙ্খ অশান্তি মহারাজের জয় ও 'আগমন' ঘোষণা করে।

তুলনীয় :—

ওরে দুয়ার খুলে দেরে
　　বাজা শঙ্খ বাজা !
গভীর রাতে এসেছে আজ
　　আঁধার ঘরের রাজা !
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
　　বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
　　আঙিনা তুই সাজা !
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
　　দুঃখরাতের রাজা।

—খেয়া, আগমন

জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহারা উদাসীন শঙ্খধ্বনি তাহাদিগকে নূতনের দিকে অভিসারের ও অভ্যস্ত পুরাতন বর্জনের বাণী শুনায়।

কবিতা-পাঠ

চলেছিলাম পূজার ঘরে—আমার জীবন-সন্ধ্যায় মনে হইয়াছিল যে শান্ত হইয়া নিরুপদ্রবে পূজা-অর্চনা করিয়া বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।

রক্তজবা ও রজনীগন্ধা—যখন জীবনসন্ধ্যায় শান্তির স্নিগ্ধ রজনীগন্ধা চয়ন করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতেছিলাম তখন সংগ্রামের উপযোগী রক্তজবার মালা গাঁথিবার তাগাদা ও আদেশ আসিয়া উপস্থিত।

ডাক্‌ল বুঝি নীরব তব শঙ্খ—ক্ষুদ্রতার গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া বিরাট্ বিশ্বযজ্ঞে যোগ দিবার আহ্বান বুঝি আসিল।

যৌবনেরি পরশমণি—সকল জড়তাকে দূর করিয়া ফেলিবার যে শক্তি যৌবনের আছে তাহাই আমার মনে সঞ্চার করিয়া দাও। দুগ্ধ মন্থন করিলে যেমন নবনীত উৎপন্ন হয়, তেমনি জীবন-সংঘাতের ভিতর হইতে মঙ্গল আহরণ করিবার জন্য নবীনদিগকে সকল প্রকার গণ্ডি ছাড়িয়া বাহির হইতে হইবে। সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টন হইতে তাহাদিগকে মুক্তি পাইতে হইবে ও অপরদের মুক্তি দিতে হইবে।

অন্ধ—জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাসীন।

আতঙ্ক—অভ্যস্ত পুরাতন বর্জন করিয়া নূতনের দিকে অভিসারের মধ্যে যে সাহস ও ভয় আছে তাহাই তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া লইয়া যাইবে।

আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা—তুলনীয় খেয়া পুস্তকের 'দান' কবিতা।

ব্যাঘাত আসুক নব নব—শান্তি হয় বন্ধন, যদি তাহাকে অশান্তির ভিতর হইতে লাভ করা না

যায়। রুদ্রের রৌদ্র মূর্তিকে বাদ দিয়া তাঁহার যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করিয়া যে শান্তি, তাহা তো জড়ত্বের নামান্তর; তাহা স্বপ্ন, তাহা সত্য নহে। তাই অশান্তির অন্তরালে কবি শান্তি খোঁজেন—

আরাম হ'তে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান্।

He (Saint John) said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord.

The Bible, St. John, I. 23.

পাড়ি

বলাকা—৫ নম্বর

এই কবিতাটি সম্বন্ধে স্বয়ং কবি বলিয়াছেন—

এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা।······যে সময়ে যুদ্ধ সুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ কর্‌ছিল। তাকে আমার চিত্ত এই ভাবে দেখেছে—যুদ্ধের সমুদ্র পার হ'য়ে নাবিক আস্‌ছেন, ঝড়ে তাঁর নৌকার পাল তুলে দিয়ে। তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুর্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড় সম্পদ্ নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আস্‌ছেন? এই কবিতায় দুটি প্রশ্নের কথা আমি বলেছি। নাবিক যে সম্পদ্ নিয়ে আস্‌ছেন তা কি এবং নাবিক কোন্ ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন? যুদ্ধের সাগর যিনি পার হ'য়ে আস্‌ছেন তিনি কোন্ দেশে কার হাতে তাঁর সম্পদ্‌কে দান করবেন?

১ম শ্লোক—যখন চারিদিকে গভীর রাত্রি, সাগর মত্ত, ঝড় বইছে, এমন দুর্দিনে নাবিকের কি ভাবনা ছিল যে এমন সময়ে তিনি কূল ছাড়লেন? কি সঙ্কল্প তাঁর মনে ছিল যার জন্য পরম দুর্দিনে নিয়মের দ্বারা সংযত লোকসমাজের কূলকে ত্যাগ করে তিনি মত্ত-সাগর পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়েছেন?

দ্বিতীয় শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। সেই আভাসটা এই যে—কোনো একটি গৌরবহীনা পূজারিণী এক জায়গায় অজানা অঙ্গনে পূজার দীপ জ্বালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, যুদ্ধের সাগর পার হয়ে নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করবার জন্য এই প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছেড়েছেন। যে অঙ্গনে কারো দৃষ্টি পড়ে না, সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু তাঁকে আসতে হলে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আসতে হবে।

ঝড়ের মধ্যে এই বিবাগীর, ঘরছাড়ার এ কী সন্ধান? কত না জানি মণিমাণিক্যের বোঝা নিয়ে তিনি নৌকা বেয়ে আসছেন! বুঝি কোনো বড় রাজধানীতে তিনি ধনসম্পদ্ নিয়ে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দেখি একটি মাত্র রজনীগন্ধার মঞ্জরী! তিনি যাঁকে খুঁজছেন তাঁকে তো তবে মণিমাণিক্য দেবেন না। তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিণী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জরী নিয়ে আসছেন। এরই জন্য এত কাণ্ড? হাঁ, এরই জন্য নাবিকের নিষ্ক্রমণ।

যে রজনীগন্ধার সৌরভ অন্ধকারে বিস্তৃত হয়, তা সেই অচেনা অঙ্গনের উপযুক্ত। দিনের বেলা সেই সৌরভ সঙ্গোপনে থাকে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সৌন্দর্যের প্রকাশ। সেই সৌরভময় ফুল নিয়ে নাবিক বেরিয়েছেন। নূতন প্রভাত আসন্ন, সেই নব-প্রভাতের উপহার নিয়ে নবীন যিনি তিনি আসছেন। যে তপস্বিনী পথের পাশে নূতন প্রভাতে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে অপেক্ষা করছে তাকে সমাদরের মালা পরিয়ে দিতে তিনি বার হয়েছেন। সে রাজপথের পাশে রয়েছে, তার লোককে দেখাবার মতো ঘর-দুয়ার নাই—তারই জন্য নাবিক অসময়ে সকলের অগোচরে বার হয়েছেন। সেই তপস্বিনীর রুক্ষ অলক উড়ছে, পলক সিক্ত হয়েছে, তার ঘরের ভিত ভেঙে গিয়েছে, সেই ভিতের ভিতর দিয়ে বাতাস হেঁকে চলেছে। বর্ষার বাতাসে তার প্রদীপ কম্পিত হচ্ছে—ঘরের মধ্যে ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে তার দৈন্য-দশার মধ্যে ভয়ে ভয়ে সে রাত কাটাচ্ছে, তার আশঙ্কা হচ্ছে যে বর্ষার বাতাসে তার কম্পমান দীপশিখা কখন নিবে যাবে। সে একপ্রান্তে বসে আছে, তার নাম কেউ জানে না। কিন্তু তারই কাছে নাবিক আসছেন।

আমার উৎকণ্ঠিত নাবিক আজকের দিনেই যে বার হয়েছেন তা নয়। কত শতাব্দী হল তাঁর যাত্রা সুরু হয়েছে, কত দিন থেকে কত কাল-সমুদ্র পার হয়ে তিনি আসছেন। এখনও রাত্রির অবসান হয় নি, প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। যখন তিনি আসবেন তখন কোনো সমারোহ হবে না, তাঁর আগমন কেউ জানতেই পারবে না। তিনি আসলে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোকে ঘর ভরে যাবে। নূতন সম্পদ্ কিছু পাওয়া যাবে না, কেবল দৈন্য ঘুচে যাবে। তপস্বিনী যে দারিদ্র্য বহন করেছিল তা ধন্য হয়ে উঠবে, শূন্য পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে। তার মনে অনেক দিন ধরে

সন্দেহ জাগছিল, সে ভাবছিল যে তার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করা ব্যর্থ হল বুঝি, কিন্তু তার সেই সংশয় ঘুচে যাবে। তখন তর্কের উত্তর ভাষায় মিলবে না, সে প্রশ্নের মীমাংসা নীরবে হয়ে যাবে।

ইতিহাসের বড় বড় বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ইতিহাস-বিধাতা সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন। সেই মাল্য কে পাবে? আজ যারা বলিষ্ঠ শক্তিমান্ ধনী, তাদের জন্য তিনি আসছেন না। তারা যে ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত; কিন্তু তিনি তো ধনরত্নের বোঝা নিয়ে আসছেন না। তিনি প্রেমের শান্তি বহন করে, সৌন্দর্যের মালা হাতে করে আসছেন। আজ তো শক্তিমানেরা সেই মাল্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই, তারা যে রাজশক্তি চেয়েছে। কিন্তু যে অচেনা তপস্বিনী আপন অঙ্গনে বসে পূজা করছে, আমার নাবিক রজনীগন্ধার মালা তারই জন্য নিয়ে আসছেন। সে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে, মনে করছে তার অজ্ঞাত অঙ্গনে পথিকের পদচিহ্ন বুঝি পড়ল না। সে যখন মাল্যোপহার পেয়ে ধন্যা হয়ে যাবে তখন সে বলবে—তোমার হাতের প্রেমের মালা চেয়েছিলাম, এর বেশি কিছু আমি আকাঙ্ক্ষা করি নি। ধনধান্যে আমার স্পৃহা ছিল না। এই রিক্ততার সাধনা যে করেছে, এই কথা যে বলতে পেরেছে, সে দুর্বল অপরিচিত দরিদ্র হোক, নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন। এরই জন্য এত কাণ্ড, এত যুগযুগান্তরের অভিসার! হাঁ এরই জন্য। সকল ইতিহাসের এটাই অন্তর্নিহিত বাণী।

গত মহাযুদ্ধে এক দল লোক অপেক্ষা ক'রে বসে ছিল যে যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আরেক দল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল; তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর ও চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছে। বিশ্বে যারা পরাজিত অপমানিত, তারা মনুষ্যত্বের চরম দানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে, কিন্তু তবুও যদি তারা প্রদীপ না নেবায়, তপস্যায় যদি ক্লান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি ক'রে থাকে, তবে তখন সেই নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ ক'রে দেবেন।

—শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৯, আচার্য রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা

—প্রদ্যোতকুমার সেন কর্তৃক অনুলিখিত

কোনো বিশেষ যুদ্ধ বা ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত না করিয়া সহজ সাধারণ ভাবে এই কবিতার অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।—

গতি অনন্তের প্রতীক। গতির আহ্বানবাণী ঝড়ের ও উত্তাল ঢেউয়ের ভিতর দিয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায়। গতির নিমন্ত্রণ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে অজানা কূলের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

এই যে অহরহ নূতনের আমন্ত্রণ আসিতেছে, তাহাকে কে স্বীকার করিয়া অকূলে ভাসিবে তাহা এখন কাহারও জানা নাই। যে এখন অখ্যাত অজ্ঞাত হইয়া আছে, সেই হয়তো উহাকে স্বীকার করিবে এবং তাহার দ্বারা বিখ্যাত ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে।

এই যে আহ্বান আসিতেছে তাহার অনুসরণ করিলে ধনসম্পত্তি লাভ হইবে না। কেবল আত্মপ্রসাদ মাত্র ইহার পুরস্কার—ইহাই তাহার প্রিয়ের হাতের রজনীগন্ধার মঞ্জরী।

যাহার জন্য অকস্মাৎ এই নাবিক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন, সে তো অতি অখ্যাত; কেহই তাহাকে এখনও চিনে না, সে পথপ্রান্তবাসী। কিন্তু তাহাকেই বিখ্যাত করিয়া তুলিবার জন্য নাবিকের এই অভিযান ও অভিসার।

এই নেয়ের আহ্বান যে বরণ করিয়া লইবে, তাহার সকল দৈন্য ধন্য হইয়া যাইবে, তাহার আত্ম-অবিশ্বাস চিরকালের জন্য ঘুচিয়া যাইবে।

ছবি

বলাকা—৬ নম্বর

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়।

ছবি-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে কি বোঝেন তাহা তিনি এক প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা জানিলে, এই কবিতা বোঝা সহজ হইবে বলিয়া তাহা অগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

ছবি বলতে আমি কি বুঝি সেই কথাটাই খোলসা করে বলতে চাই।

মোহের কুয়াশায়, অভ্যাসের আবরণে সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে 'আছে' বলে অভ্যর্থনা করে নেবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি। সেই জন্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলুম।

ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বলতে পারে 'চেয়ে দেখ,' তা হলেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেন-না যা আছে তাই সৎ, যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।

কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের ব্যাপ্তি অতীতে ভবিষ্যতে, দৃশ্যে অদৃশ্যে, বাহিরে অন্তরে। আর্টিস্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে পরিমাণে সাম্‌নে ধর্‌তে পারে, 'আছে' বলে মনের সায় সেই পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয়; তাতে আমাদের ঔৎসুক্য সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হয়ে ওঠে।

আসল কথা, সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিকেই আমরা সুন্দরের অনুভূতি বলি। গোলাপ-ফুলকে সুন্দর বলি এই জন্যেই যে, গোলাপ ফুলের দিকে আমার মন যেমন করে চেয়ে দেখে, ইটের ঢেলার দিকে তেমন করে চায় না। গোলাপ-ফুল আমার কাছে তার ছন্দে রূপে সহজেই সত্তা-রহস্যের কী একটা নিবিড় পরিচয় দেয়। সে কোনো বাধা দেয় না। প্রতিদিন হাজার জিনিসকে যা না বলি, তাকে তাই বলি—বলি, তুমি আছ।

একদিন আমার মালী ফুলদানী থেকে বাসি ফুল ফেলে দেবার জন্যে যখন হাত বাড়ালো, বৈষ্ণবী তখন ব্যথিত হয়ে বলে উঠল,—লিখ্‌তে পড়্‌তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমি তো দেখ্‌তে পাও না। তখনি চম্‌কে উঠে আমার মনে পড়ে গেল—হাঁ, তাই তো বটে! ঐ 'বাসি' বলে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আমি আর সম্পূর্ণ দেখ্‌তে পাইনে। যে আছে সেও আমার কাছে নেই,—নিতান্তই অকারণে, সত্য থেকে, সুতরাং আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হলুম। বৈষ্ণবী সেই বাসি ফুলগুলিকে অঞ্চলের মধ্যে সংগ্রহ করে নিয়ে চলে গেল।

আর্টিস্ট তেমনি করে আমাদের চমক লাগিয়ে দিক। তার ছবি বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলুক, 'ঐ দেখ আছে'। সুন্দর বলেই আছে তা নয়, আছে বলেই সুন্দর।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ও সুস্পষ্ট করে অনুভব করি আমার নিজের মধ্যে। 'আছি' এই ধ্বনিটি নিয়তই আমার মধ্যে বাজ্‌ছে। তেমনি স্পষ্ট করে যেখানেই আমরা বলতে পারি 'আছে', সেখানেই তার সঙ্গে কেবল আমার ব্যবহারের অগভীর মিল নয়, আত্মার গভীরতম মিল হয়। 'আছি' অনুভূতিতে আমার যে-আনন্দ, তার মানে এ নয় যে, আমি মাসে হাজার টাকা রোজগার করি বা হাজার লোকে আমাকে বাহবা দেয়। তার মানে হচ্ছে এই যে, আমি যে সত্য এটা আমার কাছে নিঃসংশয়, তর্ক-করা সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, নির্বিচার একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। বিশ্বে যেখানেই তেমনি একান্ত ভাবে 'আছে' এই উপলব্ধি করি, সেখানে আমার সত্তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়। সত্যের ঐক্যকে সেখানে ব্যাপক করে জানি।

—রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী, ১৩৩৩ ফাল্গুন

বের্গ্‌সঁর প্রধান কথা এই যে—গতির ভিতরেই সত্যকে খুঁজিতে হইবে, নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্য নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন যে—intellectual

concept-এর মধ্যে সত্যকে পাওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথও দেখাইয়াছেন যে—এক দিকে আছে সত্য, অপর দিকে আছে কেবল ছবি—একটা intellectual concept মাত্র, যেমন রাক্ষস যক্ষ কিন্নর, dragon unicorn ইত্যাদি। কিন্তু সেই ছবি সত্য হইয়া উঠে যখন তাহার সঙ্গে আমার জীবনের অনুভূতির মিলন ও সংযোগ ঘটে, তখন সে আর ছবি থাকে না।

এই জন্য একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—

The drama of lines and curves presented by the humblest design on bowl or mat partakes indeed of strange immortality of the youths and maidens on the Grecian Urn, to whom Keats says:

'Fond lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal. Yet do not grieve;
She cannot fade; though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair.'

—Vernon Lee, *The Beautiful.*

কবিতাটি সম্পর্কে কবির ব্যাখ্যা এইরূপ—

১ম স্ট্যাঞ্জা

ঐ যে আকাশের নক্ষত্র ছায়াপথে একত্র নীড় রচনা ক'রে রয়েছে, ঐ যে গ্রহ উপগ্রহ সূর্য চন্দ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো হাতে তীর্থযাত্রায় চলেছে, তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? আজ কি তুমি কেবল চিত্র-রূপে রয়েছ? —ছবি দেখে এই প্রশ্ন কবির অন্তরে উদিত হলো।

—এই ছবি খুব সম্ভব কবির পত্নীর। তিনি যখন বুদ্ধগয়া হইতে এলাহাবাদে যান, তখন সেখানে তাঁহার ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের জামাতা প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন; সেইখানে বোধ হয় কবি নিজের পত্নীর প্রতিকৃতি দেখিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

২য় স্ট্যাঞ্জা

জগতের যা-কিছু সবই চলার পথে রয়েছে। তুমি কি কেবল চিরচঞ্চলের মাঝখানে শান্ত নির্বিকার হয়ে থাক্‌বে? জগৎ-যাত্রার পথে যে-সব পথিক বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে কি তোমার যোগ নেই? তুমি সকল পথিকের মাঝখানেই আছ, অথচ তাদের থেকে দূরে আছ; তারা চঞ্চলতায় গতি পেয়েছে, তুমি স্তব্ধতায় বদ্ধ।

এই যে ধরণীর ধূলি, এ অতি তুচ্ছ, কিন্তু এও ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল-রূপে বাতাসে

উড়্ছে। এই ধূলিরও কত বিকার, কত পরিবর্তন, কত গতির লীলা। বৈশাখে ফুল ফোটে না, শুকিয়ে ঝ'রে যায়, যখন ধরণী বিধবার মতো তার আভরণ ত্যাগ করে, তখন সেই তপস্বিনীকে এই ধূলি গৈরিক বস্ত্র পরিয়ে দেয়। আবার যখন বসন্তের মিলন-উষা আসে, তখন সে ধরণীর গায়ে পত্রলেখা এঁকে দেয়। এই যে তৃণ বিশ্বের পায়ের তলায় আছে,—এরা অস্থির, এরাও অঙ্কুরিত বর্ধিত আন্দোলিত হচ্ছে, উজ্জ্বল হচ্ছে ও ম্লান হচ্ছে। এদের মধ্যে নানা বিকাশ ও পরিবর্তন আছে ব'লেই এরা সত্য। তুমিই কেবল ছবি, বরাবর এক ভাবে স্তব্ধ বদ্ধ স্থির হ'য়ে আছ।

৩য় স্ট্যাঞ্জা

আজ তুমি ছবিতে আবদ্ধ আছ বটে, কিন্তু তুমিও তো একদিন পথে চল্‌তে। নিঃশ্বাসে তোমার বক্ষ দুলে উঠ্‌ত। তোমার প্রাণ তোমার চলায়-ফেরায় সুখে-দুঃখে কত নূতন নূতন ছন্দ রচনা করেছে। বিশ্বের ছন্দে প্রাণের ছন্দ তাল রক্ষা ক'রে লীলায়িত হয়েছে। সে আজ কতদিনের কথা! তখন আমার নিজের জগৎ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে জগৎ বিশেষ ভাবে আমারই, তাতে তুমি কত গভীররূপে সত্য ছিলে। এই জগতের সুন্দর জিনিস যা-কিছু আমি ভালো-বেসেছি তার মধ্যে তোমার নিজের নামটি তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে, সুন্দর প্রিয় সামগ্রীকে তুমিই তোমার ভালবাসা দিয়ে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিলে। তুমি নিখিলকে রসময় ক'রে তুলেছিলে—তোমার মাধুর্যের তুলিতে বিশ্ব সুন্দর মধুর হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আনন্দময় বার্তাকে তুমি মূর্তিমতী বাণীরূপে আমার কাছে বহন ক'রে এনেছিলে।

৪র্থ স্ট্যাঞ্জা

আমরা দুজনে এক সঙ্গে যাত্রা ক'রে চলেছিলাম। হঠাৎ অনন্ত-রাত্রি অর্থাৎ মৃত্যু তোমাকে অন্তরালে নিয়ে গেল। আমি চল্‌তে লাগ্‌লাম, তুমি নিশ্চল হ'য়ে গেলে। দিন ও রাত্রি আমার সুখদুঃখ বহন ক'রে নিয়ে চল্‌ল, আমার চলা আর থাম্‌ল না। আকাশের সাগরে আলো-অন্ধকারের জোয়ার-ভাঁটার পালা চলেছে। আমি পথ দিয়ে যাত্রা করেছি, সেই পথের দুধারে ফুলের দল চলেছে—কদম্ব-শিউলি-নাগকেশর-করবী, নানা ঋতুতে এদের উৎসবের যাত্রা। আমার দুরন্ত জীবন-নির্ঝর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছুটেছে,—অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত ধ্বংস হ'তে হ'তেই তারা প্রাণের পথ কেটে দিচ্ছে। তাই মৃত্যুই কিঙ্কিণী বাজিয়ে

জীবনকে শব্দিত কর্‌ছে, নানা দিকে প্রসারিত ও প্রবাহিত ক'রে দিচ্ছে। আজ জানি না পরক্ষণে কি ঘটবে, তথাপি অজানা তার বাঁশি বাজিয়ে আমাকে দূর থেকে দূরে ডেকে ডেকে চলেছে, আমাকে ঘরছাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে। আমি প্রতিদিনের চলাকে ভালোবাসি ব'লেই জীবনকে ভালোবাসি। অজানার সুরে চলা আমার ভালো লাগে। তুমি আমার সঙ্গে চলেছিলে, হঠাৎ একেবারে পথ থেকে নেমে গেলে। আমরা ক্রমাগত চলেছি,—হঠাৎ তুমি এক জায়গায় দাঁড়ালে, সেখানেই স্তম্ভিত হ'য়ে ছবি হ'য়ে রইলে।

৫ম স্ট্যাঞ্জা

আমার হঠাৎ মনে হ'লো, এ কী প্রলাপ বক্‌ছি! তুমি কি কেবল ছবি? না, না, তুমি তো শুধু ছবি নও! কে বলে তুমি কেবল রেখার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে রয়েছ? তোমার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশিত হয়েছিল ও মূর্তি গ্রহণ করেছিল, তা যদি এখনও না থাকৃত তবে এই নদীর আনন্দবেগ থাকৃত না। তোমার আনন্দ যে-বাণীকে বহন ক'রে এনেছিল তা তো থামেনি। বিশ্বের যে-অন্তরের বার্তাকে তুমি এনেছিলে, তা চিরকাল ধ'রে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ কর্‌ছে। তা যদি না হতো, তবে মেঘের এই স্বর্ণচিহ্ন থাকৃত না। তোমার চিক্কণ কেশের যে ছায়া, তা বিশ্বের নানা রূপের মধ্যে রয়েছে। তা যদি বিশ্ব থেকে মিলিয়ে যেত তবে সৃষ্টির আনন্দের মধ্যেই ক্ষতি ঘটৃত, সেই সঙ্গে মাধবী-বনের মর্মরায়মাণ ছায়া লুপ্ত হ'য়ে স্বপ্নপ্রায় হ'য়ে যেত।

তুমি আমার সামনে নেই, কিন্তু জীবনের মূলে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে আছ, তুমি আর পৃথক হ'য়ে থাকৃলে না। তোমাকে আমি যে ভুলেছিলুম, সে ভুল বাইরের। তুমি আমার জীবনের চৈতন্যলোক থেকে মগ্নচৈতন্যের জীবনে চ'লে গেছ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমার অন্তরের গভীর দেশে গেছ। আকাশের তারা রাত্রিকে বেষ্টন ক'রে আছে, আমরা কত সময়ই তাদের কথা সচেতন ভাবে ভাবি না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে চলার মধ্যে তাদের দিকে চেয়ে না দেখ্‌লেও তাদের সঙ্গীতে ও আনন্দে আমাদের মন অলক্ষ্যে পূর্ণ হ'য়ে যায়। তেমনি পথে চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌ছি যে ফুলকে ভুলেছি, কারণ সচেতন-ভাবে তাকে দেখ্‌ছি না। কিন্তু আমার যাত্রাপথে সেই ফুল প্রাণের নিঃশ্বাস-বায়ুকে সুমধুর কর্‌ছে, ভুলের শূন্যতাকে পূর্ণ কর্‌ছে। আমি ভুলি বটে, তবুও ভুলি না।

আমি তোমাকে বিশেষভাবে মানস-চক্ষে দেখ্‌ছি না ব'লে যে ভুলে রয়েছি তা নয়। বিস্মৃতির কেন্দ্রস্থলে ব'সে তুমি আমার রক্তেতে দোল দিয়েছ। তুমি চোখের বাইরে নেই, ভিতরে সঞ্চিত হ'য়ে আছ। সেই জন্যই আজকের বসুন্ধরার শ্যামলতার মধ্যে তোমার শ্যামলতা, আকাশের নীলিমার মধ্যে তোমার নীলিমা দেখ্‌ছি। তুমি যে আনন্দ দিয়েছ, বিশ্বের আনন্দের মধ্যে তা মিলিয়ে আছে।

আমি যখন গান গাই, তখন কেউ জানে না যে তোমার সুর তার ভিতরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। তুমি কবির বাহিরে ছিলে, কিন্তু অন্তরের যে-কবি সঙ্গীত-কাব্য রচনা করছে, তার প্রেরণা-রূপে তুমি আজ মর্মস্থলে রয়েছ—তুমি আজ কবিচিত্তবিহারিণী। তুমি কবির অন্তরে কবি হ'য়ে রইলে, আর বাইরের নিখিলে ব্যাপ্ত হ'য়ে থাক্‌লে। অতএব তুমি শুধু ছবি মাত্র নও।

তোমাকে একদিন সকালে অর্থাৎ সচেতন অবস্থায় লাভ করেছিলুম, তার পরে রাত্রি এলো মৃত্যুরূপে, তুমি অন্তরালে চ'লে গেলে। রাত্রিতে তোমাকে হারিয়ে ফেলে, রজনীর অন্ধকারে অর্থাৎ মগ্নচৈতন্যে ও সুপ্তচৈতন্যের মধ্যেই গভীরভাবে তোমাকে আবার ফিরে পেলাম।

—শান্তিনিকেতন, চৈত্র, ১৩২৯

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে
তারপরে হারায়েছি রাতে।—

পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে 'রাতে' বলিতে কবি মৃত্যুকে বুঝিয়াছেন। কবি এখানে বলিতে চাহিয়াছেন—মৃত্যুরূপে রাত্রি সমাগত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তুমি অন্তরালে অদৃশ্য হইলে।

এই স্ট্যাঞ্জার সহিত তুলনীয় :—

আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে সেই সমস্ত ক্রমে সংস্কার স্মৃতি অভ্যাস আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া তাহার সমস্ত স্তরপর্যায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারে না। উপর যতটা দৃশ্যমান হইয়া উঠে, অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পের বেগে যে নিগূঢ় অংশ উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। —পঞ্চভূত, অখণ্ডতা

তুলনীয়—পূরবী কাব্যে 'পূরবী', 'কৃতজ্ঞ' কবিতা।

শাজাহান

বলাকা—৭ নম্বর

এই কবিতাটি প্রথমে ১৩২১ সালের সবুজপত্রের অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় "তাজমহল" নামে প্রকাশিত হয়।

এই কবিতাটি বলাকার সকল কবিতার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার ভাষার কারুকার্য, গভীর ভাবব্যঞ্জনা ও মনোহারিণী কল্পনার প্রসার ইহাকে মনোরম করিয়াছে। ইহার কবিত্বময় ঐশ্বর্য অতুল্য।

এই কবিতাতে কবি বলিতে চাহিতেছেন যে রাশি রাশি বস্তুস্তূপে সত্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্তর-বেদনার মধ্যে সত্য নিহিত আছে। ভারতসম্রাট্ শাজাহান রাজশক্তি ধন মান তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অন্তরের বেদনাকে চিরন্তন করিবার মানসে তাজমহল নির্মাণ করেন।

কিন্তু স্মৃতির চিরন্তনত্ব কেবল স্মৃতিতে পর্যবসিত নয়; স্মৃতির সঙ্গে যে প্রীতি জড়িত হইয়া থাকে, সেই প্রীতিতেই স্মৃতির চিরন্তনত্ব প্রতিষ্ঠিত।

আবার, কি জড়বিশ্ব, কি প্রাণীবিশ্ব, দুইয়েরই মধ্যে আমরা দেখিতে পাই এক অবিরাম অবিশ্রাম গতি। এই গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণশক্তির বিকাশ। এই গতি যেখানে থামিয়া যায় সেখানেই যত আবিলতা, যত আবর্জনা জমিয়া উঠে—সেখানেই নিদারুণ মৃত্যুর আবির্ভাব হয়। এই গতিস্রোতেই মুক্তির পথ।

সেই জন্য ব্যথিত বিরহী যদিও বলিতে চায়—'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'—তথাপি সে ভুলে, ভুলিতে বাধ্য হয়; কারণ, বিচ্ছেদের বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী। অথচ অন্য দিকে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য, বিস্মৃতি সত্য নয়।

মৃত্যু যেন তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা তীরে দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে; হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক, এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী; কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য,—বিস্মৃতি সত্য নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জান্‌তে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ঙ্কর সত্য! জান্‌তে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না—এবং সেইটে মনে কর্‌লে মানুষ আরো ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে—কেবল যে থাক্‌ব না তা নয়, কারো মনেও থাক্‌ব না। —ছিন্নপত্র, (সাজাদপুর, ৪ঠা জুলাই ১৮৯১)

শাজাহানের হৃদয়বেদনা অপরূপ তাজমহলের চেয়েও অধিক সত্য; তাই স্মৃতিমন্দিরে সত্য বন্দী হইয়া নাই। চিত্ত-বেদনা এক আধারেই নিজেকে চিরদিন বন্দী করিয়া ও বদ্ধ করিয়া রাখে না, ক্রমাগতই সে আধার হইতে আধারান্তরে চলিয়া যায়। বেদনার এই আকার পাওয়ার পিপাসা অনন্ত—কোনও সসীম আধারে তাহার এই পিপাসা মিটে না, অসীমকে না পাইলে তাহার আর তৃপ্তি নাই।

যদি তাজমহলের ন্যায় মানবের শ্রেষ্ঠ কীর্তিতেও জীবনকে ধরিয়া রাখা না যায়, তাহা হইলে জীবনের সত্যকে কিরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে? বের্গ্‌সঁ বলিয়াছেন যে—জীবনের স্বরূপ হইতেছে অনন্ত প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, জীবনের প্রকাশ হইতেছে 'বিরাট্ নদী'।

আবার, মানব তাহার কীর্তির চেয়ে মহৎ। অতএব শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁহার আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—উহার মধ্যে তাঁহাকে কুলায় না বলিয়াই এত বড় সীমাকেও ভাঙিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল—পৃথিবীতে এমন বিরাট্ কিছুই নাই যাহার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলে তাঁহাকে খর্ব করা হইত না। আত্মাকে মৃত্যু লইয়া চলে কেবলই সীমা ভাঙিয়া ভাঙিয়া। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে সম্পর্ক তাহা কখনই চিরকালের নহে,—তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেই রকম। সেই সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসিয়া পড়িয়াছে,—তাহাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশ মাত্র ক্ষতি হয় নাই।

শাজাহান অর্থাৎ কীর্তিমান মানুষ বা জীবন, কিছুতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে না, সে কিছুতেই বন্দী হয় না বলিয়াই তাহার কীর্তি বিলাপ করিয়া বলে—

স্মৃতিভারে আমি প'ড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

যে চলিয়া যায় সেই হইতেছে 'সে', তাহার স্মৃতি-বন্ধন নাই; আর যে অহং কাঁদিতেছে সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ। "আমি—আমার" করিয়া যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা "আমি"। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি, আমার তাজমহল, যে মানুষটা বলে, তাহারই প্রতীক ঐ গোরস্থানে;—আর মুক্ত হইয়াছে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী—তাহাকে কোনো একখানে ধরে

না, না তাজমহলে, না ভারত-সাম্রাজ্যে, না শাজাহান-নামরূপধারী বিশেষ ইতি-হাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে। ৲⁄

মানুষ যে অতি প্রিয়তম জনকেও চিরকাল মনে করিয়া রাখিতে পারে না, এ কথা কবি আগেও বলিয়াছেন—এমন গভীরভাবে নয়, একটু রঙ্গ করিয়া—ক্ষণিকার মধ্যে 'অনবসর' কবিতায়।

এই কবিতাটি এবং ৯ নম্বর কবিতাটি তাজমহলের চমৎকার প্রশস্তি। এই তাজমহলের প্রথম প্রশস্তি রচনা করেন স্বয়ং সম্রাট্ শাজাহান। তিনি তাজমহলকে বলিয়াছেন—

জগৎসার! চমৎকার! প্রিয়ার শেষ শেয।
অমল ভায় কবর ছায় তন্দুর তার তেজ!
*　　*　　*　　*
কুসুম-ঠাম ধেয়ান ধাম অমল মন্দির,—
ইহার 'পর ধাতার বর সদাই রয় স্থির!

—মণিমঞ্জুষা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তাহার পরে কত কত লেখক তাজমহলের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের মধ্যে স্যর এডুইন্ আর্নল্ড, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

সম্রাটের অনিমেষ ভালোবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মন্দ্র

।স্মৃতি-মন্দিরেই যে স্মৃতি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে না, সে কথা দ্বিজেন্দ্রলালও বলিয়াছেন—

কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি? হে সমাধি! চিরস্মরণীয়!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাজমহলকে বলিয়াছেন—

প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর!)　　—অভ্র-আবীর

Not architecture as all others are,
But the proud passion of an Emperor's love
Wrought into living stone, which gleams and soars
With body of beauty, shrining soul and thought;

—Sir Edwin Arnold.

৯ নম্বর কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে তাজমহল কেবল যে শাজাহানের প্রিয়া-বিরহের বেদনা বহন করিতেছে তাহা নহে—

যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী—
রাজার প্রাসাদ হ'তে দীনের কুটীরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

*   *   *   *

আজ সর্ব-মানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে'
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

চঞ্চলা

বলাকা—৮ নম্বর

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি তখন এলাহাবাদে ছিলেন। অন্ধকার রাত্রিতে কবি ছাদের উপর বসিয়া ছিলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া অগণ্য নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে কবির মনে এই ভাবোদ্রেক হইল যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক বিপুল সৃজনীশক্তির স্রোত বহিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহারই ঘূর্ণাবর্তে কত শত সৌরমণ্ডল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্‌বুদের মতো শেষ হইয়া যাইতেছে। ঐ মহাব্যোমের বিরাট্‌ সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে কত কত আলোকের ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিয়া আবার নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাইতেছে তাহার কোনো ইয়ত্তা নাই। ইহাকেই কবি বিরাট্‌ নদী-রূপে অনুভব করিয়াছেন। জীবন-রাজ্যেও ঐ একটি বাণী, 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা'।

নিরন্তর গতিকে, অবারণ চলাকে কবি নদীর সঙ্গে কেন তুলনা করিয়াছেন তাহার কারণ কবির পুরাতন ডায়ারি হইতে জানিতে পারি—

জলের দিকে চেয়ে অনেক সময় ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি বিশুদ্ধ গতিভাবেই মনে আনতে চাই তবে নদীর কাছ থেকে সেটাকে পাওয়া যায়। জীবজন্তু তরু-লতার মধ্যে যে চলাফেরা তাতে খানিকটা গতি খানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর একটা অংশের নিশ্চলতা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই একসঙ্গে চলচে—সেইজন্যে যেন আমাদের

সচেতন মনের সঙ্গে ওর একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানস-শক্তির মতো বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙ্‌চে-চুরচে এবং চলচে—মনের ইচ্ছার মতো সে নিজেকে নানা ভঙ্গে নানা শব্দে নানা প্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে। এই একাগ্রগামিনী নদী আমাদের মনের বাসনার মতো, আর প্রশান্ত শস্যশালিনী ভূমি আমাদের বাসনার সামগ্রীর মতো।

নদীটা যেন একটা সুবৃহৎ প্রাণপদার্থের মতো; একটা প্রবল উদ্যম বহুদূর থেকে সগর্ব কলস্বরে অবহেলে চ'লে আসচে।

এই কবিতাটি বুঝিতে হইলে ফরাসী দার্শনিক বের্গ্‌সঁ জগৎ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা জানিলে ভালো হয়। বের্গ্‌সঁ বলেন—জগতের মধ্যে, আমাদের মধ্যে, সদাসর্বদাই পরিবর্তন চলিতেছে, এবং দুইটি পরিবর্তনের মাঝামাঝি অবস্থাটিও কেবলই পরিবর্তন মাত্র। এমন কোনো অনুভূতি চিন্তা বা স্পৃহা নাই প্রতিমুহূর্তেই যাহার পরিবর্তন হয় না।

"We change without ceasing, and the state itself is nothing but change. There is no feeling, no idea, no volition, which is not undergoing change at every moment: if a mental state ceased to vary, its duration would cease to flow."

অতএব পরিবর্তন ছাড়া জগতে আর কিছু নাই। অপরিবর্তনশীল কোনো সত্তা স্বীকার করিতে পারা যায় না, আবার কোনো বস্তুর পরিবর্তন হয় এমন কথাও বলা চলে না। কারণ, পরিবর্তন স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে সেই বস্তুটির একটি পরিবর্তিত অবস্থা ছিল যাহার পরিবর্তন হইয়াছে। আমরা যতদূ'ই দেখি না কেন, কেবল চিরপরিবর্তনই আমাদের চোখে পড়ে। জগতে কিছুই থাকে না, সবই হয়। পরিবর্তনের যে স্রোত বহিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে কিছুই স্থির থাকে না। সমস্ত কিছুরই রূপান্তর ঘটিতেছে এবং ঘটিবেই। বের্গ্‌সঁ ইহার নাম দিয়াছেন 'Becoming' অর্থাৎ 'হওয়া'। যদি বস্তু ও বস্তুর গুণাবলীকে তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে এক গতি ছাড়া আমরা আর কিছুই পাই না। এই গতিকে কেহ বলেন কম্পন, কেহ বলেন ইথারের ঢেউ, কেহ বা বলেন নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রন।

একটি নদীর ধারার সঙ্গে এই পরিদৃশ্যমান জগতের তুলনা করা যাইতে পারে। এই যে অনাদি অনন্ত স্রোত, এই যে জীবনধারা, এই চরম ও পরম শক্তি চলন্তী শাশ্বতী। কিন্তু এই শক্তির গতি যে অবাধ, বাধাবন্ধহীন, তাহা নহে। চলিতে চলিতে হঠাৎ বাধা পাইয়া প্রতিহত হইয়া এই শক্তি

ফিরিয়া দাঁড়ায়। চৈতন্যশক্তির এই যে প্রতিঘাত, এই বিপরীত গতি, বের্গ্‌সঁর মতে ইহারই নাম বস্তু। জীবনধারা যেন একটি উৎস, তাহার ধারা কেবলই উপরে উঠিতে চায়। যে জলকণাগুলি উপরে উঠিয়া আবার পড়িয়া যায়, সেগুলিই বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। অতএব বস্তুও গতিরই একটি অবস্থা মাত্র, বুদ্ধির দ্বারা আমরা নিরবচ্ছিন্ন গতিধারাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বস্তু-রূপে দেখি। কিন্তু বাস্তবিক কালের কোনো বিভাগ নাই, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলিয়া কালের কোনও বিভাগ করাই সম্ভব নহে। বের্গ্‌সঁ বলেন, "অতীতের অবিরত প্রবাহ নিরবচ্ছেদে ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে, বর্তমান সেই অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি হাইফেন্ মাত্র; বর্তমান বলিয়া কিছুই নাই। কারণ, যে মুহূর্তকে আমরা বর্তমান বলি, তৎক্ষণাৎ তাহা অতীত হইয়া যাইতেছে, এবং ভবিষ্যৎ আসিয়া সেই বর্তমান নামক কালবিন্দুব স্থান অধিকার করিতেছে।"

ঠিক এই কথাই কবি রবীন্দ্রনাথ কবিত্বময় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই কবিতায় বলিয়াছেন—

কালের কোন মুহূর্তই স্থির হইয়া নাই—তাহাদের ভিতর দিয়া পরিবর্তনের প্রবাহ অদৃশ্য বেগে নিরন্তর চলিয়াছে; সেই প্রবাহ-বেগে সবই ভাসিয়া চলিতেছে। বিশ্বের প্রবাহ কালকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কাল বিরাট্। ভরা নদীর স্রোত লক্ষ্য-গোচর হয় না, তাহার বেগ বুঝা যায় তাহার উপরে প্রবমান ফেনপুঞ্জের গতি দেখিয়া। কালপ্রবাহেরও খর-গতিবেগ বুঝিতে পারা যায় তাহার উপরে প্রবমান তারকাপুঞ্জের গতি দেখিয়া। কালের বেগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কায়াহীনতা হইতে কায়া পরিগ্রহ করিতেছে। জলের বেগে ফেনার উৎপত্তি হয়, তেমনি কালের বস্তুহীন বেগে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে —কায়াহীন স্বপ্নের বেগে যেমন বস্তু জাগিয়া উঠে তেমনি। গাছের মধ্যে যে বেগ তাহা বীজ হইতে অঙ্কুরে, অঙ্কুর হইতে কাণ্ডে, কাণ্ড হইতে পাতায়, পত্র হইতে ফুলে, ফুল হইতে ফলে, ক্রমাগত রূপ হইতে রূপান্তরিত হইয়া চলে। চলাটাই সর্বত্র রূপ হইয়া উঠে। চলাটাই রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া, পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্য দিয়া ভাসিয়া চলিতেছে। গতি হইতেছে ভৈরবী বৈরাগিণী অনন্ত পথযাত্রিণী; তাহার পথের দুই ধারে সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু; কিন্তু কাহারও দিকে তাহার দৃক্‌পাত নাই। বস্তুর প্রবাহ যখন চলে, তখন তাহা দেশে কালে বিভক্ত হইয়া চলে। জল যখন চলে, তখন তাহা বহু দেশের স্রোতস্বিনী; কিন্তু বাধা পাইলে তাহা হয় একটি স্থানের প্লাবন। চলার দ্বারা সমস্ত কিছুর ভার-

কুয়ার ধারে

আমাদের যাহা কিছু সঞ্চয় তাহা পাইবার জন্য ভগবান্ তৃষ্ণার্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশে আমরা যাহা ত্যাগ করি, তাহা সামান্য হইলেও বড় হইয়া উঠে। মানবের ও অপর জীবের সেবাতে তাঁহারই সেবা করা হয়। ক্রিশ্চানদের ঠিক এই রকমের একটি কাহিনী আছে—একটি সুন্দর ছবিও আছে —কয়েকটি নারী কূপ হইতে জল তুলিতেছে, এমন সময়ে পথশ্রান্ত ক্রাইষ্ট আসিয়া সেখানে তৃষ্ণার্ত হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কত কত মেয়ে তো তাঁহার পাশ দিয়া জলভরা কলস লইয়া চলিয়া গেল, কেহ তৃষ্ণার্তকে জল দিল না। অবশেষে একটি রমণী আসিয়া তাঁহাকে জল দিল, এবং সে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। তুঃ—'গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

—চৈতালি, দেবতার বিদায়

For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

—St. Matthew, 16. 25.

For I was an hungered, and ye gave me meat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in.

—St. Matthew, 25. 35.

তুলনীয়—Parable of The Good Samaritan.

—St. Luke, 10. 30. 35.

অনাবশ্যক

জগতে দেখা যায় যেখানে অভাব সেইখানেই যে তাহা মোচন করিবার উপকরণ আসিয়া জুটে তাহা নহে—যাহার অনেক থাকে, তাহারই কাছে আরও অনেক গিয়া জুটে, আর যাহার নাই তাহার অভাব কিছুতেই মিটিতে চায় না। একজন পুরুষ হয়তো কোনো রমণীর একটু প্রীতি, একটু ভালোবাসা পাইলে ধন্য হইয়া যায়, অথচ সেই রমণী তাহার প্রাণপূর্ণ প্রেম লইয়া চলিয়াছে এমন একজন পুরুষের উদ্দেশে যে হয়তো তাহা গ্রাহ্যই করিতেছে না, সে হয়তো অপর কোনো রমণীর ভালোবাসা পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেও দেখা যায় সরস ভূমিতে প্রচুর উদ্ভিদ্ জন্মে, বেচারী মরুভূমি একটি গাছ পাইলে বর্তিয়া যায়, কিন্তু তাহার ভাগ্যে তাহা জুটে না; আকাশে

শতকোটি জ্যোতিষ্ক জ্বলে, কিন্তু যে দরিদ্র তাহার কুটীরে একটি মাটির প্রদীপও জ্বলে না। যেখানে আবশ্যক নাই সেইখানেই যেন সব গিয়া জুটে। আকাশে কত জ্যোতিষ্ক, সেখানেই তুলিয়া দেওয়া হইল আকাশ-প্রদীপ; দীপালিতে কত দীপের সমারোহ, সেইখানেই দেওয়া হইল আর একটি দীপ, রহিয়া গেল আমার ঘর অন্ধকার।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে স্বয়ং কবি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার দ্বারা ইহার তাৎপর্য সুস্পষ্ট হইবে।—

"খেয়ার 'অনাবশ্যক' কবিতার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে ব'লে মনে করিনে। আমাদের ক্ষুধার জন্যে যা অত্যাবশ্যক, তার কতই অপ্রয়োজনে ফেলাছড়া যায় জীবনের ভোজে, যে-ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে যার তাতে দৃষ্টি নেই—সেই অনাবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি; অথচ বঞ্চিত হয় সে, যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রতিদিন দেখ্‌তে পাচ্ছি সংসারে যেখানে অভাব সত্য সেখান থেকে নৈবেদ্য প্রচুর পরিমাণেই বিক্ষিপ্ত হয় সেই দিকে যেখানে তার জন্যে প্রত্যাশা নেই—ক্ষুধা নেই।"

—শান্তিনিকেতন,—৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৩

— —

ফুল ফোটানো

আমাদের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাহা আমরা কেবল নিজের ইচ্ছা-অনুসারে ঘটাইয়া তুলিতে পারি না। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই। আমাদের প্রকাশ ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করে বলিয়াই মহম্মদ বলিয়াছিলেন—আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নাই, আমি আল্লার রসুল বা পয়গম্বর—মহম্মদ উর্ রসুল্ আল্লাহ্। আর ক্রাইষ্ট নিজেকে বলিয়াছিলেন—আমি মানব-পুত্র, আমি ভগবানের পুত্র।

দ্রষ্টব্য—গীতিমাল্য পুস্তকের 'আত্মবিক্রয়' কবিতার ব্যাখ্যা।

তুলনীয়—

নিঠুর গরজী
তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে।
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহনে।
দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই,
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।

তোর লোভ প্রচণ্ড,
তাই ভরসা দণ্ড,
এর আছে কোন্ উপায় ?
কয় যে মদন, শোন নিবেদন, দিস্‌নে বেদন
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজ ধারা আপন হারা তার বাঁশী শুনে।

—মদন সেখ, বাউল

দিন শেষ

এই কবিতাটির সহিত শেষ খেয়া কবিতার ভাব-সাদৃশ্য আছে। আমার কাছে ভবসংসার অতিথিশালা মাত্র, এখানে হাটের লোক আসিয়া বিশ্রাম করে, তার পরে যে যার ঘরে ফিরিয়া যায়। এই অতিথিশালায় কত লোক জীবনের সমস্ত মালিন্য ধুইয়া শুদ্ধ পবিত্র হইয়া স্বগৃহে যাত্রা করিয়াছে, কত আশা কত আনন্দ তাহাদের। কিন্তু আমার পক্ষে এই সংসার নিরানন্দ অন্ধকার, এখানে আমাকে কে আশ্রয় দিবে ?

দীঘি

দীঘি যেমন স্নিগ্ধ শীতল জলে পরিপূর্ণ, ভগবান তেমনি দয়া ও প্রেমে পরিপূর্ণ। বেলাশেষে তাঁহার কোলে ফিরিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, এখন আর সংসারের কাজ ভালো লাগে না। বধূ যেমন অনুরাগে ও আগ্রহে বাপের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখে, তেমনি আগ্রহ জাগিতেছে আমার মনে। এই পথ বড় পিচ্ছিল, কিন্তু সেই শীতল অতলতায় অবগাহন করিবার আনন্দে আমার দেহ-মন পরিপূর্ণ। জীবনের অবসানে পরলোকে ভগবানের কোলে যাইবার পথ নীরব সুগম্ভীর মৃত্যু—তাঁহার যে আলিঙ্গন তাহা মরণ-ভরা, তাহা সকল বন্ধন মোচন করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই যে মহাযাত্রা ইহা একেবারে ভয়ঙ্কর নহে, পথ দেখাইতে সাঁঝের তারা জ্বলিয়া উঠিল, পথে জোনাকির আলোও আছে, এবং মঙ্গল ঘোষণা করিয়া শঙ্খও ধ্বনিত হইতেছে। যিনি রুদ্র, তিনিই শিব, যিনি মৃত্যু তিনিই নবজীবন।

প্রতীক্ষা

আমি জীবন-সন্ধ্যায় আমার সাংসারিকতা ছাড়িয়া বিষয়বাসনা বিস্মৃত হইয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। হে ভগবান, তুমি আমাকে করুণা করিয়া গ্রহণ করো। আমার জীবনের যাহা সুন্দর ও পবিত্র সঞ্চয় তাহা তোমাকে অর্ঘ্য দিবার জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি এবং তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি প্রেমের স্রোতে জোয়ার বহাইয়া আমার হৃদয়ের ঘাটে আসিয়া তোমার করুণা-তরণী ভিড়াইবে, এবং আমাকে তোমার বাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবে, সেই মিলন-সুখাবেশে আমার দেহ মৃত্যুতে শিথিল শীতল হইয়া তোমার চরণমূলে লুটাইয়া পড়িবে, সেই আশাতেই আমি বাসকসজ্জা করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

প্রচ্ছন্ন

বিশ্বেশ্বর আপনাকে বিশ্বের সকল বস্তুর পশ্চাতে অন্তরাল করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন—তিনি সকল কিছুকে পথ ছাড়িয়া দিয়া নিজে সকলের পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাই লোকে সব কিছুকেই পাইতে চায় কেবল তাঁহাকে ছাড়া। কবি তাঁহার প্রিয়তম জীবনদেবতার জন্য তাঁহার কাব্যকুসুম চয়ন করিয়া ডালি সাজান, সে ডালি হইতে কত লোকে ফুল তুলিয়া লইয়া যায় নিজেদের উপভোগের জন্য।

সমস্ত জীবন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিল, কত কত সাধক পরলোকের সম্বল লইয়া ঘরে ফিরিল। আমি তোমার প্রতীক্ষায় যে বসিয়া আছি, কবে তুমি দয়া করিয়া আপনি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে, ইহা অত্যন্ত স্পর্ধার মতন শুনাইবে বলিয়া আমি নীরবে থাকি। আমি যে দীনা ভিখারিণীর মতন, আর তুমি রাজরাজেশ্বর।

তুমি এসো, হে প্রভু, তুমি আমাকে তোমার রথে তুলিয়া লইয়া আমার জীবনকে সার্থক করো, আমাকে বিনষ্ট হইতে দিয়ো না—রুদ্র, যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্, মা মা হিংসীঃ।

সব-পেয়েছির দেশ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু প্রকাশমান তাহাই পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ—জগতের কোথাও কোনো অভাব নাই, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্ যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এই বসুধা অমৃত-পাত্র, সে স্বমহিমায় ঐশ্বর্যশালিনী। এই বোধ যদি মনে জাগে, তাহা হইলে আর কোনো অভাব বোধ হইতে পারে না। সেই সন্তোষপূর্ণ মনই সব-পেয়েছির দেশ। যেখানে সন্তোষ আছে, সেখানে কোনো লোভ দ্বেষ হিংসা থাকিতে পারে না, পরের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা হইতে পারে না। এই সব-পেয়েছির দেশে কোথাও কোনো বাহুল্য নাই, আড়ম্বর নাই, কৃত্রিমতার লেশমাত্রও সেখানে স্থান পায় না; কোঠাবাড়ীর দম্ভ সেখানে নাই, সেখানে হাতীশালায় হাতী নাই, ঘোড়াশালায় ঘোড়া থাকার আড়ম্বর নাই। সব-পেয়েছির দেশে বাধাবন্ধনহীন প্রাণের সরল আনন্দের প্রাচুর্য বিরাজ করিতেছে; প্রাণের সহজ আবেগে যাহা ফুটিয়া উঠে কেবল তাহারই স্থান আছে সেখানে। সেখানে কচি ঘাস, শ্যামলা লতা, মনোরম পুষ্প প্রাণের আনন্দে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানকার কাজকর্ম সমস্ত কিছুই সকলে আনন্দের আবেগে করে, কর্তব্যের তাড়নায় নহে, লোভের বশে নহে—বিনা-বেতনের কর্ম শেষ করিয়া দিনের শেষে সকলে হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরে। সেখানে সকলের সঙ্গে সকলের অন্তরের নিবিড় মিলনের পক্ষে কোনো বাধাবন্ধ নাই। সেখানে সর্বদা অকৃত্রিম আনন্দ বিরাজ করে। সেখানে কিছুই আইন-কানুন দিয়া বাধ্য করিয়া করাইতে হয় না, কিছুই বাধ্যকর নিয়মের অধীন নয়,—সব কিছুই স্বধর্মে স্বাধীন। সে দেশে সদাগরের নৌকা কেনা-বেচার জন্য ঘাটে ভিড়ে না, কারণ কাহারও তো কোনো অভাব নাই; রাজার সৈন্যসামন্তও সেখানে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। সব-পেয়েছির দেশকে বাহ্যভাবে বা লঘুভাবে দেখিলে তাহার কোনো তত্ত্বই জানিতে পারা যায় না। উহার প্রাণের স্পন্দন ও অন্তরের রহস্য জানিতে হইলে ঐ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহার অধিবাসী হইতে হইবে—নিজেকে উহার সঙ্গে যোগযুক্ত করিয়া উহারই অঙ্গ হইয়া যাইতে হইবে।

কবি এইরূপ সব-পেয়েছির দেশে নিজেকে স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। এইটিই তাঁহার কামনার স্বর্গ—এখানে তিনি নিজের সমস্ত খোঁজাখুঁজির পালা শেষ করিয়া দিয়া সব পাওয়ার পরম সন্তোষ ও শান্তি মনের মধ্যে লইয়া নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন এবং সেখানে বাস করিয়া তিনি নিজেকে পরিপূর্ণ পরিণতির দিকে—অসীমের পানে—পরিচালিত করিবেন। এখানে তাঁহার পুরস্কার বিনা-বেতনের কাজ—কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম সাধনা। এখানে 'নাইকো পথে ঠেলাঠেলি, নাইকো হাটে গোল'—

Far from the madding crowd's ignoble strife . .

এখানে পরমা শান্তি ও বিপুলা বিরতি।

তুলনীয়—

My mind to me a kingdom is,
Such perfect joy therein I find
As far exceeds all earthly bliss
The world affords.

—Dyer, *Contentment.*

Tennyson-এর Lotos-Eaters নামক কবিতাটিও ইহার সহিত তুলনীয় এবং Milton-এর Paradise Lost-এর--

There is nothing good or bad but thinking makes it so,
The mind is its own place, and in itself
Can make a heaven of hell, a hell of heaven.

—*Paradise Lost*, Bk. 1.

শারদোৎসব

এই অপরূপ সুন্দর নাট্যকাব্যখানির রচনা শেষ হয় ৭ই ভাদ্র ১৩১৫ সালে। আমার সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না, যখন আমি ছাত্র, তখনই আমি স্পর্ধার সহিত কবিকে এক পত্র লিখিয়া ফরমাস করিয়াছিলাম যে আমাদের দেশের ছাত্র অথবা ছাত্রীদের অভিনয়ের উপযোগী নাটক-নাটিকা নাই, ইহার অভাব পূরণ করিতে পারেন একমাত্র তিনি ; ছাত্রদের অভিনয়ের যোগ্য নাটকে কোনো স্ত্রী-চরিত্র থাকিবে না, এবং মেয়েদের অভিনয়ের যোগ্য নাটকে কোন পুরুষ-চরিত্র থাকিবে না। আর একটি নাটিকা এমন করা কি যায় না যে কেবল মাত্র এক জন লোকের স্বগত উক্তির দ্বারাই একটি কাহিনী বিবৃত হয় অথচ তাহার মধ্যে নাটকীয় ভাব বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস, আমার সেই চিঠির ফলে কবি 'হাস্যকৌতুকে' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে' প্রকাশিত হেঁয়ালি-নাট্যগুলি রচনা করেন, 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' এবং 'বিনিপয়সার ভোজ' কেবল মাত্র স্বগতোক্তিতে গ্রথিত একক নাটিকা-রচনাও বোধ হয় আমারই পত্রের দাবীর ফলে হইয়া থাকিবে। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাট্যে পুরুষ-চরিত্র নাই। কেবলমাত্র পুরুষ-চরিত্র লইয়া শারদোৎসব নাটক রচনা করিলেন কবি এই প্রথম। আমি যখন কলিকাতার ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউসের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম, তখন আমি এই পুস্তক প্রকাশ করি। ইহাকে লোচন-রোচন করিবার জন্য ইহার আকার করি একটু নূতন ধরণের,—প্রাচীন পুঁথির আকারের, এবং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া ইহার প্রচ্ছদের ও মুখপাতের জন্য দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লই।

ইহা অভিনয় করা হয় আশ্বিন মাসে পূজার ছুটির পূর্বে। ইহার অভিনয়-উপলক্ষে কবি বিধুশেখর শাস্ত্রীকে একটি সংস্কৃত নান্দী পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে আমি বলি যে—এই নাটক যে কবি রচনা করিয়াছেন, সেই কবির রচিত নান্দী পাঠ করা সঙ্গত। তাহাতে কবি বলিলেন—তোমরা যদি আমাকে আধ ঘণ্টার ছুটি দাও, তাহা হইলে আমি নান্দী লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। আমরা কবিকে ছুটি মঞ্জুর করিলাম। তিনি আধ

ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন—ইহারই মধ্যে একটি কবিতা ও একটি গান রচনা করা ও স্থর সংযোজনা হইয়া গিয়াছে। সেই কবিতা ও গানটি নাটকের অভিনয়ের স্থচনা-পত্রে ছাপা হইয়াছিল। গানটি এখন 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে স্থান পাইয়াছে—(৭ নম্বর গান),—'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।' নান্দীর কবিতাটি মুদ্রিত শারদোৎসবে নাই। সেইজন্য উহা আমি নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

নান্দী

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি' যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভ'রে দিন সবাকার মন॥
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি',
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধহাস্তে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়॥

"তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে"—এই গানটির শেষের লাইনের উপরের দুইটি লাইন কবি প্রথমে নিম্নলিখিতরূপে রচনা করিয়াছিলেন—

এস সব স্থখে দুখে মর্মে,
এস প্রতিদিবসের কর্মে।

কিন্তু পরে কাটিয়া সংশোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন—

এস দুঃখ-স্থখে এস মর্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্মে।

এই গানটির আদিম রূপটি আছে ছিন্নপত্রে, পতিসর হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালে লেখা এক চিঠিতে।

ভারতবর্ষের এক কবির মনে 'ঋতুসংহার' বিচিত্র রসমধুর ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল; তাঁহারই কবিত্বের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী এই কবির চিত্তকেও ষড়ঋতু নানা ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। তাহারই প্রথম নাটকরূপ এই শারদোৎসব।

শারদোৎসব নাট্যকাব্যের মূল কথাটি কবি স্বয়ং দুই স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ ক'রে মন দিয়ে দেখি তখন দেখ্‌তে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজ্‌ছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে: কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে ব'সে এক মনে কাজ করছিল। রাজা বল্লেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত ;—অসীমের যে-দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের ঋণ সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে এ'কে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেইখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সেই-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও তো গাছতলায় ব'সে ব'সে বাঁশীর সুর শোনাবার কথা নয়।

—আমার ধর্ম, প্রবাসী ১৩২৪ পৌষ

মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল বিশ্বে তার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জেগে উঠছে। বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তার চিত্তমহল। এই মহলে যদি দ্বার খুলে আমরা বিশ্বকে আহ্বান ক'রে না নিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণমিলন ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানব-প্রকৃতির পক্ষে প্রচণ্ড অভাব। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল সার্থক হয়।

যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায়নি, সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন ক'রে বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ থ্রি ইয়ার্স শী গ্রু নামক কবিতায় অপূর্ব সুন্দর ক'রে বলেছেন।

প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে লুসির দেহ-মন কি অপরূপ সৌন্দর্যে গ'ড়ে উঠবে, তারই বর্ণনা-উপলক্ষ্যে কবি লিখছেন—

প্রকৃতির নির্বাক্ নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাই এই বালিকার

মধ্যে নিঃশ্বসিত হবে। ভাসমান মেঘ-সকলের মহিমা তারই জন্য, এবং তারই জন্ম উইলো বৃক্ষের অবনম্রতা; ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটি শ্রী তার কাছে প্রকাশিত, তারই নীরব আত্মীয়তা আপন অবাধ ভঙ্গিতে এই কুমারীর দেহখানি গ'ড়ে তুল্‌বে। নিশীথ রাত্রির তারাগুলি হবে তার ভালবাসার ধন; আর যে-সকল নিভৃত নিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হ'য়ে নেচে চলে সেইখানে কান পেতে থাক্‌তে থাক্‌তে কলধ্বনির মাধুর্যটি তার মুখশ্রীর উপরে ধীরে সঞ্চারিত হ'তে থাক্‌বে।

পূর্বেই বলেছি—ফুল ফল ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকায কেবলমাত্র একমহলা; মানুষ যদি তার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে, তবে সেটা তার পক্ষে বড়ো লাভ নয়। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত কর্‌লে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তার প্রাণমন বিশেষ শক্তি বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘট্‌ছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হ'য়ে ওঠে।··· তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় প'রে চারিদিক হতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। সেই হৃদয়ে যদি কোন রঙ না লাগে, কোন গান না জেগে ওঠে তা হ'লে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর কর্‌বার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষেশ্বর,—সেই বণিক্ আপনার স্বার্থ নিয়ে টাকা উপার্জন নিয়ে সকলকে সন্দেহ ক'রে ভয় ক'রে ঈর্ষা ক'রে সকলের কাছ থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ্ গোপন ক'রে বেড়াচ্ছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে? সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিল্‌তে বার হয়েছেন; লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় ব'লেই লাভ সহজ হ'য়ে সুন্দর হ'য়ে তার হাতে আপনি ধরা দেয়।

কিন্তু এই যে সুন্দরকে খোঁজ্‌বার কথা বলা হলো, সে কি? সে কোথায়? সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটা সৌখিনপদার্থ? এই কথারই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রয়েছে।

শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে ব'সে উপনন্দ তার প্রভুর ঋণশোধ করছে। রাজ-সন্ন্যাসী এই প্রেম-ঋণ শোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখ্‌তে পেলেন। তাঁর তখনি মনে হলো শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য।······

দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নি? সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যায় অকৃপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ কর্‌তে থাকে, তখনি দেবতা তার মধ্য হ'তে আপনার দান, অর্থাৎ আপনাকেই নূতন আকারে ফিরে পান, আর তখনি কি মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না? সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটিয়ে উঠ্‌তে থাকে, ততই কি তা সুন্দর উজ্জ্বল হয় না? বাধা কোথায় কাটে না? যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা,

যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবত্ব হ'য়ে উঠতে সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায়, সেখানে নিজের মধ্যে দেবত্বের ঋণ সে অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়ে থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় ব'লে মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগিয়ে একেবারে ফুঁকে দিতে চায়—তাকে যে অমৃত দেওয়া হয়েছিল, সে যে অমৃতের উপলব্ধিতে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করতে পারে, দুঃখকে গলার হার ক'রে নেয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই অমৃতকে তখন সে শোধ ক'রে দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য, আনন্দরূপমমৃতম্।

বাউলসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই ঋণশোধই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হ'তে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়,—কর্মকে এড়িয়ে তপস্যায় ফাঁকি দিয়ে পরিত্রাণ লাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলেছেন,—তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।......

এই নিয়ে সন্ন্যাসীতে আর ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্তা হয়েছে নীচে তা উদ্ধৃত করলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন সুন্দর কেন? আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি জগৎ আনন্দের ঋণশোধ করছে। বড় সহজে করছে না, নিজের সমস্ত দিয়ে করছে। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি ঢেলে দিচ্ছেন, আর একদিকে কঠিন দুঃখে তার শোধ চলছে, এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন সমান থেকে যাচ্ছে, মিলন সুন্দর হয়ে উঠছে।

সন্ন্যাসী। যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিলে পড়ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী।

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই এক পক্ষে কম প'ড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হ'তে পারে না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী মর্ত্যলোকে দুঃখিনী-বেশেই আসেন। তাঁর সেই তপস্বিনী-রূপেই ভগবান্ মুগ্ধ। শত দুঃখের দলে তাঁর পদ্ম সংসারে ফুটেছে।

লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্যা ক'রে শিবকে পেয়েছিলেন, মর্ত্যলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সঙ্গে মিলন লাভ করেন। যে মানুষের বা যে জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নেই, তপস্যা নেই, দুঃখস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নেই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

উপনন্দ তার প্রভুর নিকট হ'তে প্রেম পেয়েছিল, ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বেয়ে সে যতই প্রেম-দানের সমান ক্ষেত্রে উঠছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করছে। দুঃখই তাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সঙ্গে ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তা-ই কুশ্রীতা।

—শারদোৎসব, বিচিত্রা—১৩৩৬ আশ্বিন

কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দুঃখ নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারা পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে তো তাহার নহে—সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের। কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার।

এই জন্যই শারদোৎসবে কবি বলিয়াছেন—

দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তুই তো চিনিস;
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহঙ্কার।

'দুঃখ' প্রবন্ধের মধ্যে কবি আরও বলিয়াছেন—

দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না। —সঙ্কলন অথবা ধর্ম

এই শারদোৎসব নাটক পরে ১৩২৮ বা ইংরাজি ১৯২২ সালে 'ঋণশোধ' নামে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শারদোৎসব নাটিকায় এক অপূর্ব সৃষ্টি ঠাকুরদাদার চরিত্র। ইনি যেন রবীন্দ্রনাথেরই মনের রূপক। সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া সত্যের সাধনা করা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-জীবনের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের অন্তর চিরনবীন। এই ঠাকুরদাদা লোকটিও ঠিক তেমনি সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানী চিরনবীন রসিক। তিনি কখনও বেতসিনী নদীর তীরে তীরে ছেলের দল লইয়া গান গাহিয়া শারদোৎসব করিয়া ফিরেন, কখনো বা অচলায়তনের বাহিরে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শোণপাংশুর দলে ভিড়িয়া যান, কখনো বা রুগ্ন অবরুদ্ধ অমলের শয্যার পার্শ্বে রাজার ডাকঘরের চিঠির খবর লইয়া আসেন, আবার তিনিই ভোল ফিরাইয়া গুরু বাউল সর্দাররূপে ফাল্গুনী বসন্তোৎসবে মাতেন, তিনিই আবার ধনঞ্জয় বৈরাগী নাম লইয়া অত্যাচারের অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ করেন। তিনি রাজদ্বারে নির্ভীক, দরিদ্র মূক প্রজার মুখপাত্র বন্ধু হইয়া অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন নিজে দুঃখ ভোগ করিয়া। তিনি শিশুদের খেলার সাথী, বিপদে সাহস ও সহায়, সদানন্দ সত্যসন্ধ নির্ভীক বলিষ্ঠ সর্বংসহ। তাঁহার চরিত্র শরতের মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায়ই নির্মল স্বচ্ছ সুন্দর। এই ঠাকুরদাদাই

রাজার সহিত মিলনের পথে অনুতাপিনী সুদর্শনার সহযাত্রী, এবং ইনিই ছিলেন 'বৌ ঠাকুরাণীর হাটে' এবং 'প্রায়শ্চিত্তে' ও 'পরিত্রাণ' নাটকে রাজা বসন্ত রায়ের অন্তরে এবং বিভা সুরমা ও উদয়াদিত্যের সঙ্গে রস-মধুর স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যে। শোণপাংশুদের সঙ্গে আমরাও জানি—"এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর।"

এই নাটক রচনা ও অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমি কবিকে অনুরোধ করিয়াছিলাম এমনি করিয়া ছয় ঋতুর উৎসব লইয়া নাটক রচনা করিলে বেশ হয়। কবি একটু ভাবিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—হ্যাঁ তা করলে মন্দ হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের হেমন্তের কোনো বিশেষ রূপ নেই। অন্য ঋতুগুলির নিজস্ব রূপ বা তাৎপর্য আছে, অন্তরের অর্থ আছে, হেমন্তের তেমন কিছু নেই।

এই কথাবার্তার পরের দিন কবি আমাকে বল্লেন—দেখ, হেমন্তেরও একটা তাৎপর্য পেয়েছি—হেমন্তে সব শস্য কাটা হ'য়ে যায়, তখন মাঠ হয় রিক্ত, কিন্তু চাষী গৃহস্থের গৃহ হয় পূর্ণ; বাহিরের রিক্ততা অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। এই ভাবটি নিয়ে একটা নাটক লেখা যেতে পারে।

আমি আশা করিয়াছিলাম কবি ছয় ঋতুর উপরেই নাটক লিখিবেন। 'ফাল্গুনী' ও 'রাজা' বসন্তের উৎসবের নাটক। 'অচলায়তনে'র মধ্যে 'উতল ধারা বাদল ঝরে'। গ্রীষ্মও দু-একটা কবিতা ভেট পাইয়াছে। কিন্তু হেমন্ত কাব্যের উপেক্ষিতই থাকিয়া গিয়াছে। ঋতু-রঙ্গের মধ্যে কবি পরে সামান্য একটু হেমন্ত-বর্ণনা করিয়া তাহার মান রক্ষা করিয়াছেন মাত্র।

প্রায়শ্চিত্ত

ইহার ভূমিকার তারিখ হইতেছে ৩১-এ বৈশাখ ১৩১৬ সাল। এই ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—বৌ ঠাকুরাণীর হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে। এই নাটকের মধুর চরিত্র কবি বসন্ত রায়কে দেখিয়া মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' হইতে শ্রীকণ্ঠ সিংহকেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই নাটকের মধ্যে একটি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে—ধনঞ্জয় বৈরাগী। ইংরাজি ১৯০৮ সালের কাছাকাছি সময়ে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে অত্যাচারীদের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন। এই সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর জীবনে পরে আরও স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কবির সৃষ্টি এই ধনঞ্জয় বৈরাগী যেন মহাত্মা গান্ধীর ভবিষ্যৎ কর্মঠ পরিণত চরিত্রের সহিত ভাবপ্রবণ কবিবরের স্বকীয় চরিত্রের সংমিশ্রণে গঠিত। যে মহাত্মা গান্ধী পরে অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যায় আইন অমান্য করিয়া জগন্মান্য হইয়াছেন, এবং যে কবি জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিজের সম্মানজনক খেতাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দুই মহনীয় চরিত্রের সমাবেশে যেন এই ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র সংগঠিত।

পরে ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই নাটককে আরও কিছু পরিবর্তন করিয়া 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশ করেন। উহাতেও ধনঞ্জয় চরিত্র আছে। এখানেও রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায় প্রজাদের পক্ষ হইয়া উদয়াদিত্য রাজকুমার এবং সুরমা যুবরাজমহিষী বিপদ্‌কে অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ পালন করিয়া চলিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ কারাবরণ ও মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। এই নাটক দুইখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখা হইলেও ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের আধুনিক কালের রাজনৈতিক অবস্থার ছায়া পড়িয়াছে।

'মুক্তধারা' নাটকখানিও এই পর্যায়ের, তাহাতেও ধনঞ্জয় আছেন। যে-সব ভীরু মূক প্রজারা অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে পারে না, তাহাদের মুখপাত্র ও বাণীমূর্তি এই ধনঞ্জয় বৈরাগী—তিনি বৈরাগী বলিয়া সকলেই তাঁহার আপন এবং ন্যায় ও সত্য তাঁহার ধর্ম।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলিতে যে গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের রচনার তারিখ হইতেছে ১৩১৩ হইতে ৩০-এ শ্রাবণ ১৩১৭ সাল পর্যন্ত। গানগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে, কতক কলিকাতায়, এবং কতক শিলাইদহে রচিত। এই-সব গান কবি যেমন রচনা করিয়াছেন আর অমনি আমাদের ডাকিয়া গাহিয়া গাহিয়া শুনাইয়াছেন। এই জন্য এই গানগুলির সঙ্গে আমার অনেক মধুর স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গানের ১০০টি বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে রচিত; শেষ গান ৩০-এ শ্রাবণ ১৩১৭ তারিখে রচিত। পুস্তক প্রকাশিত হয় ভাদ্র মাসে। 'খেয়া'র চার বৎসর পরে গীতাঞ্জলি ভগবানের উদ্দেশ্যে কবি নিবেদন করিয়াছেন। কবির ভগবৎপ্রেম এখন খেয়ার যুগের চেয়েও প্রগাঢ় হইয়াছে, মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছে, এবং ভগবান্ এখন কবির বন্ধু সখা প্রিয় দয়িত স্বামী হইয়াছেন। ভক্তপ্রেমে বশীভূত হইয়া ভগবান্ ভক্তের সহিত মিলনের জন্য অভিসার করেন, ভক্তও অভিসারিকার মতন আগ্রহান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। উভয়ের বিরহব্যথা বড় গভীর, ক্ষণমিলনের আনন্দও অতি নিবিড়। একবার কবি বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বের মাঝেই পাইতে চাহিতেছেন, আবার একান্তে তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিতে ব্যগ্র হইতেছেন। এই জন্যই কবি একবার ভারততীর্থে মহামানবের মিলন দেখিতেছেন, দুর্ভাগা দেশকে সকল বিচ্ছেদ দূর করিয়া অদ্বৈতের অদ্বয়ত্ব অনুভব করিতে বলিতেছেন, আবার কবি নিজেকে প্রেমের মূল্যে বিকাইয়া দিতে চাহিতেছেন।

সচ্চিদানন্দময় ভগবান আপনার প্রেমের আনন্দ অনুভব করিবার জন্য দ্বিধাবিভক্ত হইবার যে এষণা অনুভব করেন, তাহাই সৃষ্টির মূল। যুগল না হইলে প্রেম হয় না। একময় ব্রহ্মের রস-বিলাস-লালসাই সৃষ্টির কারণ। আনন্দ হইতেই বিশ্বের জন্ম। যিনি এক স্বতন্ত্র ছিলেন, তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তদ্ এবানুপ্রাবিশৎ—তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং সর্বগত হইলেন, যিনি ছিলেন অরূপ তিনি হইলেন বহুরূপ ও অপরূপ—রূপং রূপং বহুরূপং বভূব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের প্রেরণা পাইয়াছেন প্রেমের ও আনন্দের অনুভূতির মধ্যে। তাই তাঁহার সাধনা আনন্দকে প্রেমগীতের অঞ্জলি দিয়া। অবাঙ্‌মানসগোচর যিনি, তিনি আনন্দের লীলাবিলাসে বিশ্বের সমগ্র সত্তাকে বহু করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বাত্মাকে প্রেমের বহু বিচিত্র অভিব্যঞ্জনায় মধ্যে বিকশিত দেখিয়াছেন। সুখে-দুঃখে মানে-অপমানে আপনার নিজস্ব অনুভূতির সমগ্র বৈচিত্র্যে বিশ্বের আনন্দ-শিহরণে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের লীলায়িত তরঙ্গহিল্লোলে কবি বিশ্বকবির সঙ্গে প্রেমানন্দের লিপি আদান-প্রদান করিয়াছেন।

গীতাঞ্জলিতে কবির অধ্যাত্মসাধনার মূল তত্ত্ব এই—১। অহঙ্কার মিলনের বাধা। তাহাকে ধ্বংস করার সাধনা প্রথমেই অবলম্বনীয়। অহঙ্কারে বিশ্ব প্রতিহত, আনন্দ সঙ্কীর্ণ, প্রেম সঙ্কুচিত হয়। ২। সংসারে দুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহারা প্রেমময়ের দূতী। আমাদের অসাড় চিত্তকে তিনি আঘাতের স্পর্শ দিয়া জাগাইয়া তদভিমুখ করিয়া তুলেন। যেমন ধূপ দীপ দগ্ধ হইয়া গন্ধ ও আলোক বিতরণ করে, যেমন চন্দন ঘৃষ্ট হইয়া স্নিগ্ধতা ও সুগন্ধ বিতরণ করে, তেমনি চিত্তও বেদনার আঘাতে পূজায় রত হয়। ৩। বিশ্বপ্রকৃতির ও নরসমাজের সর্বত্র ভগবানের সত্তা ও লীলা সাধক-কবি সন্দর্শন করিতেছেন। ভূমার সন্ধান পাইয়া তিনি বিশ্বচরাচরে ছোট-বড় সকলের মধ্যে পরমদেবতার সামগান শুনিতে পান। একই সত্তা বিশ্বচরাচরকে পরিবৃত করিয়া আছে—এই বিরাট্ সত্য সুখ-দুঃখের মধ্যে উত্থান-পতনের মধ্যে পাপ-পুণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহতের মধ্যে সর্বত্র সর্বদা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। এই জগতের মধ্যে একটি শান্তিময় সামঞ্জস্য আছে, যাহার প্রভাবে সকল বিরোধ সকল অভাব মলিনতা অপূর্ণতা পূর্ণের স্পর্শে মহিমান্বিত হইয়া উঠে। এই কবিতাগুলির মধ্যে এক দিকে কবির নিজের আত্মনিবেদন আছে, অপর দিকে দেশের দুর্দশায় বেদনাবোধ আছে।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ৫০টি গানের ইংরেজী অনুবাদ ও গীতিমাল্য প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তকের গান ও কবিতার অনুবাদ করিয়া লইয়া ১৩১৯ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৯১২ সালের ২৭-এ মে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সেখানে এই অনুবাদ-কবিতাগুলি কবি ইয়েট্‌স্ প্রভৃতির প্রশংসা ও বিস্ময় আকর্ষণ করে।

গীতাঞ্জলি নাম দিয়া সেই অনূদিত কবিতাগুলি ইণ্ডিয়া সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়। তাহা মাত্র ২৫০ কপি ছাপা হইয়া বন্ধুদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, তাহার একখানি আমি উপহার পাইয়া গর্ব অনুভব করিয়াছিলাম। এই পুস্তকের দ্বারা সমগ্র ইউরোপে কবির কবিত্বখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৩২০ সালের ২৭-এ কার্ত্তিক ১৯১৩ সালের ১৩-ই নভেম্বর এ দেশে সংবাদ আসে যে কবি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। সত্যেন্দ্র দত্ত এই সংবাদ পাইয়া একখানি এম্পায়ার কাগজ কিনিয়া লইয়া আমার কাছে আসেন, এবং সত্যেন্দ্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি তিনজনে মিলিয়া কবিকে সংবর্ধনা করিয়া আমাদের সানন্দ প্রণাম জানাইয়া টেলিগ্রাম করি; কবির নিকটে তাঁহার জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেলিগ্রাম প্রথম পৌঁছিয়া এ সংবাদ দেয়, তাহার পরে আমাদের টেলিগ্রাম পৌঁছে। ইহাতে সত্যেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন— তিনি বলিয়াছিলেন, আমি টেলিগ্রাম করিতে জানিলে আমার টেলিগ্রামই সর্বাগ্রে পৌঁছিত।

এই নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে যাইয়া ৭-ই অগ্রহায়ণ ২৩-এ নভেম্বর ১৯১৩ সালে কবিকে সংবর্ধনা করেন।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া ইউরোপে আমেরিকায় যে প্রশংসার প্লাবন বহিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একজন মনস্বী কবির অভিমত এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

Je considere certaines pages du Gitanjali la seule de ses œuvres que je connaisse comme les plus hautes, les plus profondes, les plus divinement humaines qu' on ait ecrites jusqu' a ce jour.

—Maeterlinck.

I consider certain pages of the Gitanjali—the only one of his works that I know—the highest, the most profound, the most divinely human that have been written to this day.

দ্রষ্টব্য—ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা (অনুবাদ)—ইন্দিরা দেবী।

—সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২১

১ নম্বর গান

কবি ভগবানের চরণে মাথা নত করিয়া পড়িতে চাহিতেছেন কিন্তু এ অবনতি-স্বীকার বড় কঠিন সাধনা—কবি ইহার তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 'নৈবেদ্যে'র এক কবিতায়—

হে রাজেন্দ্র, তব কাছে নত হ'তে গেলে
যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে'
লহ ডাকি' সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে।

এই দুষ্কর সাধনার প্রথম সোপান আপনার অহংভাব পরিত্যাগ করা; কারণ, অহঙ্কার মিলনের বাধা, পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধির বাধা; কোনো মানুষ নিজের মধ্যে পূর্ণ নয়, সকলের সঙ্গে যোগের সত্যতাতেই সে সত্য। অহঙ্কার মানুষকে সেই সত্য হইতে বঞ্চিত করে।

মানুষ নিজের ছোট-আমিকে গৌরব দিতে গিয়া নিজের বড়-আমিকে অপমান করে, খর্ব ও ক্ষুণ্ণ করে। তাই কবি 'নৈবেদ্যে' বলিয়াছেন—

যাক আর সব
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব!

কর্মযোগ-সাধনের যোগ্যতা লাভের জন্য ভক্ত কবি প্রাণের আকূতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—ধর্মপথের একটা প্রধান অন্তরায় ভগবানের নামে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে জাহির করিয়া তুলিবার বাসনা; সেই পাপ যেন আমাকে পাইয়া না বসে, আমি যেন আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র না হই। প্রকৃতির প্রিয় অনুচর ষড়রিপু স্বকীয় স্বাভাবিক বেশ পরিবর্তন করিয়া ধার্মিকতার ছদ্মবেশে সাধককে প্রবঞ্চিত করিয়া পথভ্রষ্ট করিতে চাহে। তাই ধর্ম-প্রচারের ছলে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া বঞ্চিত হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচারক-সমাজে বিরল নহে। অতএব আমাকে রিপুর হস্ত হইতে রক্ষা করো এবং আমি যেন বলিতে পারি—

তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী,
* * *
মোহ-বন্ধ ছিন্ন করো করুণ-কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিল-ধৌত হৃদয়ে থাকো দিবসযামী।

তুলনীয়—৪৭, ৫৪, ৮২, ৮৮, ১৪৪ নম্বর গান।

৩ নম্বর গান

কত অজানারে জানাইলে তুমি

প্রেমের আনন্দ-স্ফুরণে জগৎ মধুময় হয়; প্রেমের ধর্ম দূরকে নিকট করা, আপনাকে ভুলিয়া পরের হাতে আত্ম-সমর্পণ করা; প্রেমই আমিত্বের অহঙ্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডি ঘুচাইয়া দেয়। প্রেমস্বরূপ এককে জানিলে আর কোনো বিভেদবুদ্ধি থাকিতে পারে না। প্রেমে সকলের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে, কিন্তু কোথাও যেন আসক্তি প্রবল হইয়া সেই প্রেমকে বন্ধনে পরিণত না করে। সেই জন্য কবি বন্ধন স্বীকার করিয়াও সেই বন্ধন মোচনের প্রার্থনা করিয়াছেন—

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ।

—৫ নম্বর

যে নূতনের সঙ্গে মিলন হইবে, প্রেম-বন্ধন হইবে, তাহারই মধ্যে দেখিতে হইবে যিনি পুরাতন শাশ্বত চিরন্তন তিনিই বিরাজমান। তাহা হইলে আর প্রেম-সম্পর্ক বন্ধন হইতে পারিবে না।

৪ নম্বর গান

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা

ভক্ত কবির ভগবানের কাছে যাচ্ঞা আছে কিন্তু বঞ্চনা নাই; দীনতা নম্রতা আছে, কিন্তু ভীরুতা নাই; কারণ, তিনি জানেন—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

তুলনীয়—৯০,৯২ নম্বর গান।

৬ নম্বর গান

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে

রবীন্দ্রনাথ ভূমাকে প্রেমের অঞ্জলি দিয়া অভিনন্দন ও বরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাছে সবই সুন্দর, সবই মধুময়। তিনি সর্বসুন্দরে পরম-

সুন্দরকে অনুভব করিতেছেন। প্রাচীন ঋষিদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া এই ঋষি কবি বলিতেছেন—

তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

—ঈশোপনিষৎ, ১৬

তোমার যে অতি শোভন কল্যাণতম রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে সর্বত্র দেখি। সেই পুরুষ যিনি, তিনি আমি।

এই বোধ যাহাতে মনের মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে এই জন্য কবি বলিতেছেন—'চেতন আমার কল্যাণরস-সরসে শতদল সম' প্রস্ফুটিত হইয়া থাকুক।

৭ নম্বর গান

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে

কবি রবীন্দ্রনাথ ভগবানের অতুল ঐশ্বর্য ও অপার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভগবান তথাকথিত নিরাকার নহেন, আবার সাকারও নহেন। তিনি অরূপ, অপরূপ, এবং এই জন্যই তিনি বহুরূপ, অনন্তরূপ। তাই কবি সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেন—

অপরূপে কত রূপ দরশন। ২২ নম্বর গান

১৩ নম্বর গান

আমার নয়ন-ভুলান এলে

এটি শারদোৎসবের গান। 'শারদোৎসব' নাটিকার অনেকগুলি গান এই গীতাঞ্জলি পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

কবির প্রেমাস্পদ পরম সুন্দর অভিসারে বাহির হইয়াছেন, যিনি নয়নভুলানো তাঁহাকে কবি হৃদয় মেলিয়া দেখিতেছেন। এই সুন্দরকে তো কেবল চোখে দেখিলে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় লওয়া হইবে না, তাঁহাকে হৃদয় মেলিয়াও দেখিতে হইবে, সর্বপ্রাণে অনুভব করিতে হইবে; বুঝিতে হইবে তিনি

ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতা এবং তিনি আবার অন্তরে ধীশক্তির প্রেরয়িতা—যিনি বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু প্রসব করেন, তিনিই মনের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধও উৎপাদন করেন।

১৬ নম্বর গান

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে

কবি আনন্দরূপম্ অমৃতম্ বিশ্বে দেদীপ্যমান দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, সেই আনন্দ-রূপ তাঁহার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। ভূমার আনন্দে ব্যক্তি বিশ্বচরাচরের মধ্যে ছড়াইয়া যায়, প্রেমের মন্দাকিনীধারায় স্বার্থপরতার মলিনতা ধৌত হইয়া যায়।

তুলনীয়—

দাদু ঘট-মেঁ সুখ আনন্দ হৈ তব সব ঠাহর হোই।
ঘট-মেঁ সুখ আনন্দ বিন সুখী ন দেখ্যা কোই॥
যে সব চরিত তুম্হারে মোহন মোহে সব ব্রহ্মংড খংডা।
মোহে পবন পানী পরমেশ্বর সব মুনি মোহে রবি চংডা॥
সায়র সপ্ত মোহে ধরণীধরা অষ্টকুলা পরবত মেরু মোহে।
তিন লোক মোহে জগজীবন সকল ভবন তেরী সেব সোহে॥
অগম অগোচর অপার অপরংপার কো য়হ তেরে চরিত ন জানহিঁ।
য়হ সোভা তুম্হকো সোহই সুন্দর বলি বলি জাউ দাদু ন জানহিঁ॥

হে মোহন, এই যে সব ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড, ইহা তোমারই লীলাচরিত, ইহারা সকলে আমাকে মুগ্ধ করে। পবন বায়ু রবি চন্দ্র সবই আমাকে মোহিত করে, হে পরমেশ্বর। সপ্ত সাগর অষ্টকুলাচল পর্বত মেরু সবই আমাকে মুগ্ধ করে, হে জগজ্জীবন। এই তিন লোক আমাকে মোহিত করে। সকল ভবনে তোমারই সেবা শোভা পাইতেছে। অগম্য অগোচর অপার অসীম যে এই তোমার চরিত তাহা তো আমি জানি না। এই শোভায় তুমি সুশোভিত হে সুন্দর, আমি দাদু তোমার বাহিরে যাইতেছি, তোমাকে তো আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না।

১৯ নম্বর ও ২১ নম্বর গান

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

কবির প্রেমাস্পদ তাঁহার জীবনে প্রেমাভিসারে আসিতেছেন রুদ্ররূপে।

২৩ নম্বর গান

তুমি কেমন ক'রে গান করো যে গুণী

যিনি কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ তাঁহার কাব্যরচনা এই বিশ্বচরাচর। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বকবির বিশ্বসঙ্গীত শুনিয়া অবাক্ হইয়াছেন এবং তিনি সেই বিশ্বসুরের সঙ্গে নিজের সুর মিলাইতে অজস্র গান রচনা করিয়া চলিয়াছেন। তাই কবি পরে বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে নিজের সুর মিলাইবার কথা অন্য একটি গানে বলিয়াছেন

আজিকে এই সকালবেলাতে
ব'সে আছি আমার প্রাণের সুরটি মেলাতে।

২৪, ২৫, ২৬ নম্বর গান

কবির মনে অনুরাগ জন্মিয়াছে বলিয়াই বিরহাশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আবার যখন বিরহ আসিয়াছে তখন ধীরতা মধুরতা তন্ময়তা তাঁহার চিত্ত পূর্ণ করিয়াছে। জগতের সঙ্গে জগদীশ্বরের মিলনের মধ্যে একটি চিরবিরহ আছে। এই জন্যই মিলন এত সুন্দর মধুর হয়, এবং মিলনের জন্য এত ব্যাকুলতা জাগ্রত হইয়া থাকে। সকল সৌন্দর্যের মধ্যে অনির্বচনীয়কে অনুভব করিবার ব্যগ্রতা এই বিরহ। কবি নিজের বিরহকে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছেন। ভক্তের যে বিরহ, সেই বিরহ-ব্যথা ভগবানের মধ্যেও সঞ্চারিত হইতেছে। তাই কবি বলিয়াছেন

তুমি আমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে তারে নানা সুরে,
আপনারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া।

—গীতিমাল্য

২৯ নম্বর গান

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে

কবি প্রিয়তমের জন্য বাসকসজ্জা করিয়া পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন

৩০ নম্বর গান

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়

কবি অহং ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে ব্যগ্র। খণ্ড ছাড়িয়া অখণ্ডকে অবলম্বন করিলে অখণ্ডের মধ্যে খণ্ডকেও পাওয়া হইয়া যাইবে। কবি অনুভব করিতে চাহিতেছেন যে

ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম্॥

৩১ নম্বর গান

দাও হে আমার ভয় ভেঙ্গে দাও

বরকে বধূর মিনতি—যিনি ছিলেন অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত তিনি হইবেন আজ হৃদয়েশ্বর। তুলনীয় খেয়ার 'বালিকা বধূ' কবিতা।

মানুষ স্বল্পবুদ্ধি। সে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে তাহা প্রায়ই ভ্রান্ত হয়। অতএব যিনি সব-কিছুর শেষ পর্যন্ত দেখিতে পান সেই চিন্ময় পরমেশ্বরের বিধানের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করা শ্রেয়। তাই কবি বলিতেছেন

যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে।

এমন কথা তিনি আগেও একাধিক বার বলিয়া আসিয়াছেন—

যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

—উৎসর্গ, পাগল

খুঁজিতে গিয়া বৃথা খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর।

—উৎসর্গ, চিঠি

৩৪ নম্বর গান

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন

এরা অর্থাৎ সামান্য তুচ্ছ ক্ষুদ্র যা কিছু। তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়—ভূমাকে নিত্য নিরন্তর নিজের চেতনার মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া রাখা।

নিহত মোর চেতনা'পরে রাখ
আলোকে ভরা উদার ত্রিভুবন।

৩৫ নম্বর গান

আমার মিলন লাগি' তুমি আসৃছ কবে থেকে

এই জগৎ যেমন বহমান চলমান, এই জগতের স্বামীও তেমনি নিত্য নবনবায়মান। লোক-লোকান্তরের ও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীব-অভিব্যক্তির যে যাত্রাপথ বাহিয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবন পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, সেই পথেই—যিনি সকল পথের অবসান, যিনি পরম পরিণাম, তিনি সঙ্গিরূপে পথিক-রূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেন। কবির জীবনে জীবনে লীলা করিবার জন্য তিনি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন। এই জন্যই তো এই পরিচিত জগদ্দৃশ্যের মধ্যে সেই অদৃশ্যের ছায়া পড়ে; এবং সেই মিলনানন্দের পরিচয় পাইয়া কবি বলিয়াছেন

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।

—৪৮ নম্বর গান

৩৬ নম্বর গান

এস হে এস সজল ঘন, বাদল বরিষণে

নববর্ষার আগমনে

বাথিয়ে উঠে নীপের বন
পুলক-ভরা ফুলে।
উছলি উঠে কলরোদন
নদীর কূলে কূলে।

এ কী আশ্চর্য বৈপরীত্যের একত্র সমাবেশ! যেখানে ব্যথা সেখানে পুলক, এবং সেখানেই আবার কলরোদন। ইহার কারণ

আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন-জলে,
বিরহ আজ মধুর হ'য়ে
করেছে প্রাণ ভোর।

—৪১ নম্বর গান

৪৫ নম্বর গান

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ

জগতের সমস্ত সৌন্দর্য ও আনন্দ প্রত্যেক ব্যক্তির উপভোগের জন্য আয়োজন করিয়া যজ্ঞেশ্বর নিমন্ত্রণ পাঠাইতেছেন।

তুলনীয়—

ভারী জল্‌সা আজ্‌ম্‌ দাবত, তুহি ইক মিহ্‌মান।

—জ্ঞানদাস বঘেলী

৫৮ নম্বর গান

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ, লহ

কবি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—আমি তো নিজেকে তোমার কাছে সম্প্রদান করিয়া দিতে পারিলাম না, তুমিই এখন আমাকে

করুণা করিয়া গ্রহণ করো। কিন্তু আমার মধ্যে কলুষ ও ফাঁকি আছে বলিয়া আমাকে সেই দোষে পরিত্যাগ করিয়ো না। তুলনীয়—৭৬ নম্বর গান।

৬০ নম্বর গান

এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে

রবীন্দ্রনাথ কবি হইয়া যেমন কবিত্ব-বাঁশীকে নিজের ফুৎকারে অনুপ্রাণিত করিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন, তেমনি ভগবানের হাতে কবি স্বয়ং যেন একটি বাঁশী, বিশ্বকবির ফুৎকারে এই মানব-কবির হৃদয়-রন্ধ্রে সুরের ধারা নির্গত হইতেছে। কবি মাত্রেই যেন পরমকবির এক একটি জীবন্ত কবিতা।

তুলনীয়—

ধন্য আমি বাঁশীতে তোর
আপন মুখের ফুঁক। —বাউল

৬১ নম্বর গান

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার

বিশ্ব যখন মোহসুপ্তিতে নিমগ্ন, তখন কবির সদাজাগ্রত চিত্তে পরমসুন্দরের সাড়া লাগে। কিন্তু তাঁহাকে তো কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়া উপলব্ধি করা যায় না, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অনন্তের ভিতর দিয়া তাঁহার ক্রমাগত আগমন।

সে যে আসে আসে আসে। —৬৩ নম্বর গান

৬২ নম্বর গান

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস

১৭ পৌষ, ১৩১৬ সালে রচিত হয় এবং ৬-ই মাঘ মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসরে গীত হয়। ইহা ভক্তকে, সাধককে উদ্দেশ করিয়া লিখিত।

৬৬ নম্বর গান

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে

মানবের জীবনযাত্রা তো অনাদি কালের কাহিনী। মানব ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে যিনি পূর্ণতম তাঁহারই সহিত মিলনের জন্য—নিজেকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার জন্য। মানব পূর্ণের সহিত মিলনের সাধনাই করে। যিনি নামরূপের অতীত, তাঁহাকে বহু নামে ডাকা এবং রূপে দেখা সম্ভব। তাই কবি সেই অনাম ও অরূপকে বলিয়াছেন 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার।' কেবল একাকী থাকায় কোনো আনন্দ নাই, এইজন্য ভগবান নিজেকে বহুতে পরিণত করিয়াছেন—প্রেম দেওয়া ও লওয়ার খেলা খেলিবার জন্য, এবং কবিও বুঝিয়াছেন—'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগলপ্রেমের স্রোতে'। এবং এই 'যুগলপ্রেমে' মগ্ন জীব 'পুরাতন প্রেমে নিত্য নূতন সাজে' জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

'সমুদ্রের প্রতি' 'প্রবাসী' 'সুদূর' ইত্যাদি কবিতা দ্রষ্টব্য।

৬৭ নম্বর গান

তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই

কারণ, আমি ক্ষুদ্র, আর তুমি বিরাট্, তুমি ভূমা।

৭৫ নম্বর গান

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি

চরম সত্য ও পরম সত্য হইতেছে রুদ্রের প্রসন্ন মুখ। অশান্তিকে অস্বীকার করিয়া যে শান্তি তাহা সত্য নয়। ইহা বুঝিয়াই কবি বজ্রের বাঁশি আর ঝড়ের আনন্দ-বীণার ঝঙ্কার নিজের জীবনে সাধিয়া লইতে চাহিতেছেন। কবি ত্যাগের সাধনাকে ও বেদনা-বরণের সাধনাকে সকল সাধনার চেয়ে বড় করিয়া জানিয়াছেন।

তুলনীয়—৭৮ নম্বর গান।

৮৪ নম্বর গান

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি

আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রাকে নৌযাত্রার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন অনেক দেশের অনেক কবি—ফরাসী কবি বোদ্লেয়ার বলিয়াছেন 'হে মৃত্যু! বৃদ্ধ কাপ্তেন! এবার নোঙর তোলো।'

— —

৮৯ নম্বর গান

চাই গো আমি তোমারে চাই,
তোমায় আমি চাই—
এই কথাটি সদাই মনে
বল্‌তে যেন পাই

মানব ভগবানকে চাহে, কিন্তু সেই বোধ সর্বদা জাগ্রত থাকে না। কবি সচেতন ভাবে সেই সাধনা করিতে চাহিতেছেন। পিতা নোঽসি—তুমি আমাদের পিতা, ইহা তো সত্য, কিন্তু পিতা বোধিঃ—তুমি যে আমাদের পিতা, এই বোধ যদি সচেতন হইয়া মনে না জাগ্রত থাকে তবে তাহা আমার জীবনে সত্য হইয়াও সত্য নয়।

—— -

৯৩ নম্বর গান

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করিনে।

বৈষ্ণবধর্ম মানবের সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখিয়া যে সম্ভ্রমের ভাব, তাহাকে বৈষ্ণব সাধকেরা প্রেম-সাধনার প্রথম ও নিম্ন সোপান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এইজন্য চৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রধানাতে সঙ্কুচিত প্রীতি।
কেবল শুদ্ধপ্রেম-ভক্ত ঐশ্বর্য না জানে।
ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ-সম্বন্ধ না মানে।

—চৈতন্যচরিতামৃত, ১৯শ পরিচ্ছেদ ; মধ্য, ৮ম দ্রষ্টব্য

অতএব ভগবানকে পিতা সখা ভাই প্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া সব সম্পর্কের মাধুর্য অনুভব করিতে হইবে এবং তিনি সর্ব মানবের মধ্যে বিরাজমান ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বপ্রেমিক কবি সর্বভূতে সর্বভূতেশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করেন—তিনি অনুভব করেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। কবির এই বিশ্বানুভূতি নূতন নহে, অতি শৈশব হইতে তিনি ইহা অনুভব করিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। তুলনীয়—'প্রভাত-উৎসব', 'স্রোত', 'এবার ফিরাও মোরে', ইত্যাদি।

নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি।
একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে সকল প্রেমের স্মৃতি॥

—অনন্ত প্রেম

৯৫ নম্বর গান দ্রষ্টব্য।

১০২ নম্বর গান

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ

কবি যেমন নিজের সার্থকতা জীবনদেবতার মাঝে পাইয়াছেন, তেমনি ইহাও বুঝিয়াছেন যে জীবনদেবতাও প্রেমিকের মতন কবির গানের পাত্রে আপনার সৃষ্টির আনন্দ-সুধা পান করেন। কবি তাঁহার প্রেমে পরমকবিকে সার্থক করেন, এবং নিজেও সার্থক হন। প্রেমে প্রেমের বিষয় ও প্রেমের আশ্রয় উভয়েই ধন্য হন।

১০৩ নম্বর গান

এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে

তুমি বিরাট্, তোমার আকাশ অনন্ত, তোমার আলোকধারা অফুরন্ত, আর আমার চিত্ত ক্ষুদ্র, আমার প্রেম অল্প। আমার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তি-দ্বারা তোমার বিরাট্ অনুভবকে আমি যেন কখনো খণ্ডিত না করি, তোমার অসীমতাকে আমি যেন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি টানিয়া প্রতিহত না করি।

১০৪ নম্বর গান

একলা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে

আমি একাকী ভগবানের প্রেমাভিসারে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে আমার আমিত্ব, অহঙ্কার, ছোট-আমি। প্রেমাভিসারে যে চলে, সে কি কাহারও সাম্‌নে প্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে? আমার লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু আমার ছোট-আমি তো ছোটলোক, সে ইহাতে লজ্জা অনুভব করে না, সঙ্গও ছাড়ে না, সে আমাদের মিলনে কেবল বাধা হইয়াই থাকে।

তুলনীয়—

পীতম বুলাওত অনহর-কী পার-সে,
কৌন বেশরম আজ তের সাথ জাঙ্গ। —কবীর

প্রিয়তম ডাকিতেছেন অন্ধকারের পার হইতে, এমন কে নির্লজ্জ আছে যে এই অভিসারের সঙ্গী হ'বে?

ভারততীর্থ

১০৭ নম্বর

(রচনার তারিখ ১৮-ই আষাঢ়, ১৩১৭)

কবির কাছে তাঁহার স্বদেশ বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি, কাজেই এই স্বদেশ বিশ্বেশ্বরের মন্দির, তীর্থস্থান, বিশ্বমানবের মিলন-ক্ষেত্র, জগন্নাথ-ক্ষেত্র। কেহ বিদেশী বা বিধর্মী বলিয়া কবির কাছে অবহেলিত বা অনাদৃত নহে, তাঁহার কাছে কেহ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ নহে।

তুলনীয়—

তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে র'বে টানিতে।

সকলের প্রেমে র'বে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।
সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা—এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গে পারি যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে॥

—নৈবেদ্য

'চণ্ডালিকা' নাটিকা দ্রষ্টব্য। এবং তুলনীয়—

Better pursue a pilgrimage
Through ancient and through modern times
To many peoples, various climes,
Where I may see saint, savage, sage,
Fuse their respective creeds in one
Before the general Father's throne!

—Robert Browning, *Christmas Eve*

Passage to India!
Lo, soul, seest thou not God's purpose from the first?
The earth to be spann'd, connected by net-work,
The races, neighbors, to marry and be given in marriage,
The oceans to be cross'd, the distant brought near,
The lands to be welded together.

—Whitman, *Passage to India*

অপমান

১০৯ নম্বর

(রচনার তারিখ ২০ আষাঢ়, ১৩১৭)

জাতিভেদের দ্বারা, স্ত্রীলোকদের প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা ভারতবর্ষ বহু বর্ষ ধরিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারই ফলে আজ সে বিশ্বসভায় নিজে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়িয়াছে—এই কথা কবি বহু স্থানে বারংবার বলিয়াছেন। মানুষকে অপমান করার পাপে ভারতবর্ষ ভগবানের ন্যায়-বিচারে অপমান-রূপ শাস্তিই প্রতিফল-স্বরূপে প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু ভগবান্ পতিতপাবন, তিনি কাহাকেও হীন পতিত বলিয়া অবহেলা করেন না।

তুলনীয়—

You cannot do wrong without suffering wrong; • The exclusionist does not see that he shuts out the door of heaven on himself, in striving to shut out others.

Essay on Compensation.
—Emerson

জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারী, প্রভু প্রেমের ভিখারী!
সে যে এসেছে এসেছে কাঙালের সভার মাঝে এসেছে এসেছে!
কোথা রইল ছত্র-দণ্ড, কোথা সিংহাসন,
কাঙালের সভার মাঝে পেতেছে আসন।
কোথা রইল ছত্র-দণ্ড ধূলাতে লুটায়,
পাতকীর চরণ-রেণু উড়ে পড়ে গায়।
পতিতের চরণ-রেণু শোভে তোমার গায়।
জ্ঞানের অগম্য, প্রেমে দাসের অনুদাস,
সবার চরণ তলে প্রভু তোমার বাস।

—বাউল

১২০ নম্বর গান

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক প'ড়ে

মন্দিরের মধ্যে সমস্ত মানব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে আরাধনা তাহা তো জগন্নাথের আরাধনা নহে; জগতের একটি প্রাণীকে যে ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখে, তাহার প্রণাম তো বিশ্বেশ্বরের পায়ে গিয়া পৌঁছায় না, কারণ

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি',
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে,
সবার পিছে সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।

—১০৮ নম্বর গান

সমস্তকে স্বীকার করিলে তবেই অনন্ত অসীম পরমেশ্বরের সম্যক্ ও সমগ্র উপলব্ধি হইবে, কিছুকে ত্যাগ করিয়া মুক্তি নাই। স্বয়ং ভগবান বলিয়া ফিরিতেছেন—

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে।
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে॥

—চৈতালি

১২১ নম্বর গান

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর

ভূমা এক দিকে বিশ্বাতীত, অন্য দিকে বিশ্বময়; এক দিকে নির্গুণ নেতিবাচক, অপর দিকে সগুণ; তিনি এক হইয়াও বহুত্বপূর্ণ জগতের আধার। একই আপনাকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া বহুর মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া বহুকে একসূত্রে ধারণ করিয়া আছেন—সূত্রে মণিগণা ইব। এই অনন্তের সুর সান্তের মধ্যে বাজে বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি যে আমরা বদ্ধ জীব নই, আমাদেরও মুক্তি আছে, আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, অ-মৃত। এই বৃহত্তর আনন্দের দিক্‌টা যাঁহার জীবনে যত বেশি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার মানবজন্ম তত বেশি সার্থক হইয়াছে। আমাদের কবি ঋষি তাঁহার জীবনে এই সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

১২২ নম্বর গান

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর

ভাগ্যে জীব নিজেকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র সত্তা মনে করে, তাই তো উভয়ের বিরহ-মিলনে এত আনন্দ। নহিলে ঈশ্বরের আপনাতে আপনি থাকাতেই বা কি আনন্দ, আর আমাদেরই বা ব্রহ্মনির্বাণে কি আনন্দ? এইজন্য বৈষ্ণব সাধকেরা বলিয়াছেন—

মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় উল্লাস॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১২৬ নম্বর গান

আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার

কবি পূর্বের অলঙ্কারবহুল ভাষা ত্যাগ করিয়া এখন সহজ সরল ভাষায় প্রাণের আকুতি ব্যক্ত করিতেছেন। নৈবেদ্য পর্যন্ত কবির ভাষা ছিল অলঙ্কার-ভূয়িষ্ঠা। পরের রচনায় প্রসাদগুণই হইয়াছে অলঙ্কার।

১৩১ নম্বর গান

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে

ভগবান্ নিজের সৃষ্টিতে, নিজের সৃষ্ট জীবে নিজেকে উপলব্ধি করেন। কবি যেন পরমচৈতন্যময়ের চেতনায় অনুপ্রাণিত হইতে পারেন, অথবা সেই চৈতন্যই হইয়া উঠিতে পারেন, এই প্রার্থনা নিরন্তর করিয়াছেন। এই ভাবের দ্বারা তাঁহার অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গান অনুপ্রাণিত। কবি মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া জ্ঞানের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন।

১৩৩ নম্বর গান

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি

আমাদের কবি কেবল কবি নহেন, তিনি গানের রাজা। তিনি গানের অঞ্জলি দিয়া প্রিয়তমের পূজা করেন। যখন মানুষের ভাব গভীর হয় তখন আর গদ্যে তাহা কুলায় না, তখন সে পদ্যের আশ্রয় লয়; সেই ভাব আরও গাঢ় ও গূঢ় হইলে তখন আর কবিতাতেও কুলায় না, তখন সে গানের সুরের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই কবি অন্যত্র বলিয়াছেন

মন দিয়ে যে নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে তাই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে।

১৩৪ নম্বর গান

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর

কারণ, তুমি অনন্ত, আর আমার জীবনযাত্রাও অনন্ত; আমি অনন্তপথযাত্রী।

১৩৫ নম্বর গান

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিনী পূরে

ফরাসী কবি পাস্কাল তাঁহার মিস্তেয়ার দ্য জেসুস কবিতায় যে ব্যাকুল স্পন্দনের কথা বলিয়াছেন, কবি বিশ্বপ্রাণের সেই স্পন্দন অনুভব করিতে চাহিতেছেন,—ইহা কেবল আনন্দের স্পন্দন। বিশ্বপ্রাণের অনুভূতি এবং সেই প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুভূতি হইতে এই আনন্দ স্বতঃই উৎপন্ন হয়। তুলনীয়—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে-প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে,……

সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট্ স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন —নৈবেদ্য

১৩৮ নম্বর গান

আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে, সত্য হবে

সত্য কালত্রয়াবাধিত, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে অপরিবর্তিত, আবার সত্য সচল সক্রিয়। এই সত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার সাধনাই সকল মনস্বী করিয়া থাকেন।

১৪২ নম্বর গান

মনকে আমার কায়াকে

কবি নিজের ক্ষুদ্র-আমিকে বিসর্জন দিয়া মায়ার পারে যাইতে চাহিতেছেন। এই যে আমি নিজেকে তাঁহা হইতে পৃথক্ ভাবি ইহাই তো মায়া। ইহা যদি হয়, তবে

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা।
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে,
মনকে, আমার কায়াকে।

১৪৪ নম্বর গান

নামটা যেদিন ঘুচবে নাথ

কবি নিজের অহঙ্কারের ক্ষুদ্রতার গণ্ডি হইতে, আপন মন-গড়া সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। উপাধি, খ্যাতি, বংশ-মর্যাদা ইত্যাদি সমস্তই মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনের বাধা।

১৪৭ নম্বর গান

জীবনে যত পূজা হলো না সারা

কবির চক্ষে সকল অসম্পূর্ণতাই পূর্ণতার অগ্রদূত, বিফলতার সোপান দিয়াই সফলতায় উপনীত হওয়া যায়।

১৫৬ নম্বর গান

শেষের মধ্যে অশেষ আছে

মৃত্যু যদি সকলের শেষ হয় তবে মৃত্যু ভয়ঙ্কর। কিন্তু আমাদের তো অধিষ্ঠান ভূমার মধ্যে—সেই ভূমা তো সত্য শাশ্বত অমৃত। তাই জীবন-মরণ একই জীবন-প্রবাহের অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যু জীবনের সম্পূর্ণতা-লাভের সোপান

বা যায়। এই সীমাবদ্ধ জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্ত থাকিয়া যায়, মরণের পরে যে অনন্ত জীবন আসে সেখানে সকল অভাবের সম্পূরণ হয়। জীবনের সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ গ্লানি ও অসম্পূর্ণতা মরণের পূতধারায় ধৌত হইয়া যায়—তাহার পরে অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ!

তুলনীয়—পূরবী কাব্যে 'শেষ' কবিতা।

রাজা

যে রূপক নাট্যের আরম্ভ হইয়াছিল শারদোৎসবে, তাহারই পর্যায়ভুক্ত এই রাজা নাটক। ইহা ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে এই নাটককে অভিনয়যোগ্য, সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিয়া কবি আর-একটি নাটিকা প্রকাশ করেন 'অরূপ-রতন'। সেই অরূপ-রতন নাটিকার ভূমিকায় কবি স্বয়ং এই নাটকদ্বয়ের মর্মকথা বিবৃত করিয়াছেন—

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে-অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুল্‌লে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ।......আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হলো না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।

—আমার ধর্ম, প্রবাসী, ১৩২৪ পৌষ

কবি আর এক জায়গায়ও বলিয়াছেন—

সুদর্শনা অন্ধকার ঘরের রাজাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন সুরঙ্গমা আর ঠাকুরদাদা। আপনার অভিজ্ঞতার ভিতরে ভগবানকে না পাইলে কি আর পাওয়া! পড়িয়া তো আছে শাস্ত্রের রাজপথ। কিন্তু 'অন্ধকারের স্বামী' চাহেন না আমরা সেই মজুর-খাটা, সরকারী পথ ধরিয়া তাঁহার মন্দিরে যাই। শাস্ত্রের আলোকে তিনি বিশেষ করিয়া আমারই নহেন, সেখানে তিনি সরকারী। এই অন্ধকার কক্ষে তিনি আমার চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, প্রেম-নিয়ন্ত্রিত সেবার দ্বারা বিশেষ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের।.........অন্ধকারের সাধনা যাঁহার সম্পূর্ণ হইয়াছে তিনি রাজাকে সব স্থানেই দেখিয়া থাকেন—ভুল তাঁহার হয় না। ঠাকুরদাদা এই সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, রাজাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই। সুরঙ্গমার পক্ষেও সেই কথা।......

এই নাটকখানির একদিকে অন্ধকার-গৃহচারিণী রাণী, অন্যদিকে বসন্তের উৎসবে উন্মত্ত বহুজনাকীর্ণা নগরী। কবি নাটকটিকে চিত্তাকর্ষক করিতে একটি নাটকীয় দ্বন্দ্বের dramatic contrast-এর সাহায্য লইয়াছেন। নাটকে এই রকম দৃশ্যগত দ্বন্দ্ব রচনা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষত্ব। 'ডাকঘরে' দেখিতে পাই পথিপার্শে বাতায়নে একাকী রুগ্ণ বালক অমল, সম্মুখের পথে স্ফীতকায় সংসার তাহার মোড়ল দইওয়ালা পাহারাওয়ালা ফকির ও ঠাকুরদার দল লইয়া ছুটিয়াছে। শারদোৎসবে বেতসিনী-তীরচারী বালক উপনন্দ ঋণশোধে ব্যস্ত; অন্যত্র ছুটির আনন্দে বালকের দল, ঠাকুরদাদা, লক্ষেশ্বর ও সম্রাট্ বিজয়াদিত্য। রক্তকরবীতেও একই দৃশ্য। রুদ্ধ ধনভাণ্ডারের দেওয়ালের বহু ঊর্ধ্বে ছোট্ট একটি বাতায়নের মতো এই সুবর্ণ-সন্ধানী যক্ষপুরীর বুকের উপরে রঞ্জনের ভালোবাসার কাজল-পরা নন্দিনী। এখানেও সেই একই পালা। অন্ধকার ঘরে সুদর্শনা। এই কক্ষটিতে রাজাকে তাঁহার উপলব্ধি করিতে হইবে প্রথমে; তার পরেই না তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিবে বাহিরের আলোকে।—রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের আলোচনা, শান্তিনিকেতন, ১৩৩২ শ্রাবণ।

রাণী সুদর্শনা সুবর্ণের রূপে ভুলিয়াছিলেন বলিয়া অপমানে অভিমানে রাজাকে আঘাত করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজা ইহাতে খুশী হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে ইহাতে সুদর্শনার ভ্রম ঘুচিবে।

রাণী ভুল করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার মুক্তির উপায় তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। সুবর্ণকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন—সুন্দর বলিয়াই। সুন্দরের প্রতি আসক্তিতেই তাঁহার রক্ষার বীজমন্ত্র। তিনি যখনই জানিতে পারিলেন এ সৌন্দর্য প্রকৃত নহে—ইহার সহিত সত্যের যোগ নাই, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এত বড় বঞ্চনা করেছি!' কিন্তু বঞ্চিত যাহা হইয়াছে তাহা রাণীর চোখ, হৃদয় নহে।......এতদিনে রাণীর ভুল ভাঙিল, চোখের উপর বিশ্বাস টুটিল, চোখে যাহা সুন্দর লাগে তাহার চেয়ে গভীরতর সৌন্দর্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা

জাগিল—তাঁহার অন্ধকার ঘরের সাধনা পূর্ণ হইল। এইবার তিনি অন্ধকার ঘরের স্বামীকে আলোকের প্রাসাদে পূজা দিতে পথের ধূলায় বাহির হইলেন। —রাজা নাটকের আলোচনা

রাজাকে পাইতে হইলে সকল অহঙ্কার ও অভিমান ত্যাগ করিয়া দীনবেশে পথের ধূলায় নামিতে হইবে—বিলাসে আরামে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তাঁহাকে তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারা জয় করিয়া পাইতে হইবে। যিনি "আঁধার ঘরের রাজা" তিনিই যে "দুঃখরাতের রাজা" (খেয়া , আগমন)।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতো এখানিও ভাবপ্রধান নাটক—ঘটনাপ্রধান নহে। প্রধানতঃ ইহার মধ্যে যে সংঘর্ষ তাহা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নহে—নায়ক-নায়িকার চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া। সংস্কৃত ভাষায় নাটককে দৃশ্য-কাব্য বলে। কিন্তু এই জাতীয় নাটকে কাব্যের অনেকটাই অদৃশ্য রহিয়া যায়। সবটা দেখিতে হইলে দৃষ্টির সহিত কল্পনার সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং এই শ্রেণীর নাটককে কল্পদৃশ্যকাব্য বলিলে অন্যায় হয় না।—রাজা নাটকের আলোচনা

'রাজা' নাটক রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যের' মাঝখানে লিখিত। সুতরাং যে অধ্যাত্ম-আকূতি ও আকাঙ্ক্ষা আমরা এই যুগের কাব্যের মধ্যে পাই, 'রাজা'য় তাহাই রূপ পাইয়াছে নাটকীয় ভাবে রূপকের মধ্যে, যেমন 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে পাইয়াছিলাম 'খেয়া'র রূপক কাব্য। 'রাজা'কে আমরা lyrical drama বলিব, অর্থাৎ ইহার বিষয়টি বাহিরের ঘটনার দ্বারা ভারাক্রান্ত নহে : উহা অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র অনুভূতির রূপ। সেইজন্য আমরা ইহাকে রূপক-নাট্য বলিব না, ইহাকে lyrical নাট্য বলিব।

—কাব্যপরিক্রমা, অজিতকুমার চক্রবর্তী

রাজা নাটকের নাট্যবস্তুটি একটি বৌদ্ধ গল্প হইতে লওয়া, কিন্তু কবির হাতে পড়িয়া তাহা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

এই রাজা নাটকের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবকেই কবি আবাহন করিয়াছেন। শারদোৎসবের ন্যায় ইহাও একখানি ঋতু-উৎসবের নাটক।

দ্রষ্টব্য—*God The Invisible King*—H. G. Wells (1917).

অচলায়তন

অচলায়তন নাটকটি ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রে সমগ্র ছাপা হয়। উৎসর্গের মধ্যে তারিখ ছিল ১৫ই আষাঢ় ১৩১৮। ইহা নাটক-রচনা শেষ হওয়ার তারিখ অনুমান করা যাইতে পারে। নাটকখানি শিলাইদহে লেখা। ইহার পরে কবি এই নাটকটি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কর্ন্‌ওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ীর ছাদে পাঠ করিয়া আমাদের শোনান।

১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে এই নাটককে সংক্ষিপ্ত করিয়া অভিনয়োপযোগী এক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার নাম রাখেন 'গুরু'। প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম গুরু রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অচলায়তন নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল। এখন এই অচলায়তন শব্দটি বাংলা ভাষায় একটি বিশেষ গূঢ়ার্থক মূল্যবান্ শব্দ হইয়া উঠিয়াছে।

এই নাটকের ব্যাখ্যা কবি স্বয়ং এইরূপ দিয়াছেন—

যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্ তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু ব'লেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই ক'রে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন ব'লে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙ্‌তে হচ্ছে। তিনি আস্‌বেন ব'লে কেউ প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু তিনি যে সমারোহ ক'রে আস্‌বেন তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চল্‌ছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী ব'লে ভুল করেছিল—তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বল্‌ল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল,—তাই তো যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, আপন সম্পদ ছেড়ে পথের ধুলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে। এই কথাটাই গীতালির একটি গানে আছে—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে,
আরেক হাতে হার,
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার!

—আমার ধর্ম, প্রবাসী, ১৩২৪ পৌষ

জগৎ সচল। এই সচলতার মধ্যে যে বা যাহা অচল হইয়া থাকিতে চায়, তাহাই একদিন অকস্মাৎ গুরুর আগমনে ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হয়, এবং তখন অনড়কে বাধ্য হইয়া নড়িতে হয়। আমাদের ভারতবর্ষ একটি প্রকাণ্ড অচলায়তন,—একজটা দেবীর কাল্পনিক ভয়ে, হাঁচি-টিকটিকি পাঁজি-পুঁথি গুরু পুরোহিত শাস্ত্র ইত্যাদি কত কিছুর নিষেধে সে হাজার বৎসর ঘরের দুয়ারই খুলে নাই। তাই মহাগুরু আসিয়াছেন দ্বার ভাঙিয়া মুসলমান আক্রমণের ভিতর দিয়া। তাহাতেও চৈতন্য হয় নাই। তাহার পরে গুরু আসিয়াছেন নানা ইউরোপীয় জাতির আক্রমণের ভিতর দিয়া। এখনো কি চৈতন্য হইয়াছে? এই পাষাণপ্রাচীর যে ভাঙিয়াও ভাঙিতে চায় না। তবে—'খাঁচাখানা দুল্‌ছে মৃদু হাওয়ায়'। হয়তো পিঞ্জরের বিহঙ্গ একদিন মুক্ত আকাশপ্রাঙ্গণে ডানা মেলিয়া উড়িবে। তখন সে নিষেধকে নিজে যাচাই করিয়া দেখিয়া মানা বা না-মানা স্থির করিবে।

শারদোৎসবের ন্যায় অচলায়তনে কোনো স্ত্রীলোকের ভূমিকা নাই।

এই নাটকের কথাবস্তুর পরিচয়-প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

উপাখ্যানটির মধ্যে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি—ইহারা পরস্পরের সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। অথচ একজন বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি, অপর জন মূর্তিমান নিষ্ঠা। পঞ্চক যাহা কিছু আচার, যাহা কিছু প্রাচীন প্রথা, যাহা কিছু নিষেধ তাহাকেই আঘাত করিবার জন্য উদগ্রভাবে ব্যস্ত। তাহারই জ্যেষ্ঠ মহাপঞ্চক নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর, আয়তনের সকল প্রাচীন প্রথার তাহার অচলা ভক্তি। মোটকথা, নিষ্ঠা ও নিষ্ক্রমণের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছে। কিন্তু কবি এই বিরোধকেই চরম বলিয়া স্বীকার করিলেন না। গুরু আসিলেন, অচলায়তনের প্রাচীর ধ্বংস হইল, বাহিরের আকাশ দৃশ্যমান হইল, বাহিরের বাতাস আয়তনের প্রাঙ্গণে বহিল। অস্পৃশ্য দর্ভক শোণপাংশু সকলে আসিল। মনে হইল পঞ্চকের জয়, বিদ্রোহেরই জয়। কিন্তু মহাপঞ্চকের নিষ্ঠাকে কেহ অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না। সেই বিধ্বস্ত আয়তনেই নূতন করিয়া সাধনার আয়োজন হইল, নিষ্ঠার মধ্যেই সত্যের রশ্মি আছে। চঞ্চলতাই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নহে, চঞ্চল বিদ্রোহ সমাহিত হইলে সত্যকে অন্তরে পাইবার অবসর হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের মনের মধ্যে যে কথাটি বিশেষ ভাবে জাগিতেছিল তাহারই রূপ পাই এই নাটকে। ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী ; তিনি চিরদিনই হিন্দুসমাজের জীর্ণ সংস্কার ও মলিন আচারকে আঘাত করিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক হিন্দু-ব্রাহ্ম-বিতর্কে তিনি নিজেকে হিন্দু বলিয়া হিন্দুজাতির সংস্কৃতির মূল আদর্শকেই সর্বোচ্চ স্থান দিলেন। তিনি ব্রাহ্ম বটে, তবে তিনি হিন্দুও। তিনি একাধারে পঞ্চকের বিদ্রোহ ও মহাপঞ্চকের নিষ্ঠা। হিন্দু-সমাজের অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিলে যখন সর্ব জাতি সর্ব মানব সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, সেই দিনই হিন্দু সার্থক। রবীন্দ্রনাথ সেই হিন্দুত্বকে বিশ্বাস করেন যাহা প্রগতিকে স্বীকার করে ও সংস্কৃতিকেও ত্যাগ করে না। এই সময়ের এই দ্বন্দ্ব তাঁহার অবচেতন মনে এই নাটকীয় রূপ লইয়াছিল।

—রবীন্দ্র-জীবনী

ডাকঘর

নাটিকা। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে, ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা তিন দিনে লেখা, শান্তিনিকেতনে কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। এই অভিনয় দেখিতে মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, মাননীয় মালবীয়জী, খাপাড়দে, লাজপৎ রায় প্রভৃতি বহু দেশ-সেবক সমবেত হইয়াছিলেন। অভিনয় অসাধারণ সুন্দর হইয়াছিল। এই সময়ে কবি 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গানটি রচনা করেন। সেই গান শুনিয়া মালবীয়জী বারংবার বলিয়াছিলেন—ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, হম্‌লোক ছায়াভঙ্গ-চকিতমূঢ়। 'রাজা' 'অচলায়তন' যেমন lyrical drama—ইহাও তেমনি।

মাধব সংসারী বৈষয়িক লোক। সে ধন সঞ্চয় করিয়াছে। কিন্তু তাহার সম্পত্তি যে ভোগ করিবে তাহার এমন কোনো নিকট আত্মীয় নাই। সে পরের ছেলে অমলকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছে, অমল তাহাকে পিসেমশায় বলে। পরকে আপন করিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য মাধবের সতত চেষ্টা, সে কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অমলকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরে যাইতে দেয় না। কিন্তু জগতে সব কিছুই চলিষ্ণু—অমলের জানালার পাশ দিয়া দইওয়ালা যায়, সুধা ফুল তুলিতে যায়, দূরে পাঁচমুড়া পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়, রাঙা মাটির পথ নিরুদ্দেশের ইঙ্গিত মেলিয়া দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে। সংসারী বিষয়ী লোক সব ছাড়িয়া নিজের হাতের তৈয়ারী গণ্ডির মধ্যে সব কিছু ভরিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু রাজার ডাকঘর হইতে অহরহ নিরন্তর চিঠি আসিতেছে দূরে চলিবার। যাহার মন আছে, দেখিবার মতন চোখ আছে, সে সেই চিঠি পড়িয়া তাহার মর্ম গ্রহণ করে। অমলের কাছে বিজ্ঞ বিষয়ী ও সংসারী মোড়ল উপহাস করিয়া সাদা কাগজ দিয়া বলে—এই তোমার রাজার চিঠি। কিন্তু সেই সাদা কাগজেই ঠাকুরদাদা রাজার আহ্বান ও নিমন্ত্রণ দেখিতে পান। জগতে যত আলো রং গন্ধ স্পর্শ সুর গান শব্দ ভালোবাসা সবই তো সেই রাজার ডাকঘরের মোহর-মারা চিঠি—সবই তো আমাদের ক্রমাগত ডাক দিতেছে যেখানে আছি সেখান হইতে বাহির হইয়া চলিবার জন্য, নূতনকে অচেনাকে অজানাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য। বিষয়ী সংসারাসক্ত

মাধব যতই কেন আগ্‌লাইয়া রাখুক না, একদিন রাজার ডাক-হরকরা মৃত্যু-রূপে আসিয়া হাজির-হইল, তখন আর অমলকে সে নিজের কাছে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিল না, অতি-সাবধানী কবিরাজের ব্যবস্থা পণ্ড হইল, মোড়লের উপহাস ব্যর্থ হইল। সেই রাজার ডাককে অবহেলা করেন নাই ঠাকুরদাদা। অমল চলিয়া গেল, কিন্তু সে রহিয়া গেল প্রেমের স্মৃতির মধ্যে—সুধা শেষ কথা বলিয়া গেল—"তাকে বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলে নি।" প্রেমেই তো সুধা—অ-মৃত—প্রেম কিছু হারায় না, সে কিছু ভোলে না।

এই নাটিকাটিতে "সুদূরের পিয়াসী" রবীন্দ্রনাথের রুদ্ধ জীবন হইতে বাহির হইয়া পড়িবার একটি করুণ ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে।

গীতিমাল্য

১৩১৮ সালের চৈত্র মাস হইতে ১৩২১ সালের আষাঢ় মাস পর্যন্ত সময়ের রচনা গান ও কবিতা একত্র করিয়া এই গীতিমাল্য প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরেজি ১৯১৪ সাল। ইহার গান ও কবিতাগুলি শান্তিনিকেতনে, শিলাইদহে, ইংলণ্ডে, জাহাজে ও রামগড় পাহাড়ে লেখা।

প্রেমময়কে কবি ইহার আগে গানের অঞ্জলি দিয়াছেন। কিন্তু দূর হইতে কেবলমাত্র সম্ভ্রমভবে গীতাঞ্জলি দিয়া ভক্ত কবিহৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইল না। কবি এবার প্রিয়তমের গলায় পরাইলেন গীতিমালা। গীতিমাল্যের ভাববস্তু নূতন নহে, তবে প্রকাশ নূতন। জীবাত্মা তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল সোনার তরীতে, পূজা করিল নৈবেদ্যে, পারে পৌঁছিয়াছিল খেয়াতে, তাহার পরে তীর্থরাজের চরণে সমর্পণ করিল গীতাঞ্জলি, এবং এই বারে তাঁহার কণ্ঠে অর্পণ করিল গীতিমাল্য। গীতাঞ্জলি-যুগের বিরহব্যথা কবির এখনো ঘুচে নাই। তবু যাঁহার বিরহে কবি কাতর তিনিও যে কবির সহিত মিলন-প্রয়াসী এই বোধের তৃপ্তি গীতিমাল্যে উঁকি মারিয়াছে। ভক্তের পূজা সঙ্গোপনের পূজা—প্রিয়ের কাছে অভিসার তো সঙ্গোপনেরই ব্যাপার—কৌন বে-শরম তেরে সাথ যাই—এইটি গীতিমাল্যের মূল সুর। কবি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, যিনি অন্তরতম,—তিনি নানা রূপের মধ্য দিয়া অন্তরকে স্পর্শ করিতে প্রয়াসী—বিশ্ব-প্রকৃতিও তাঁহারই স্পর্শের অঙ্গ।

আত্মবিক্রয়

৩১ নম্বর

আমাদের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাহা আমরা কাহাকেও কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসারে দিতে পারি না; তাহা আমাদের আয়ত্তের অতীত, তাহাতে আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নাই। মূল্য লইয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিলেই তাহার উপরকার আবরণটি মাত্র পাওয়া যায়, আসল জিনিসটি হাত হইতে সরিয়া যায়। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই, ইচ্ছা করিলেই বা চেষ্টা

করিলেই প্রকাশিত হইতে পারি না। কাহারো কাহারো এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে যে অঙ্গের ভিতরকার সত্যটিকে সে অত্যন্ত সহজেই টানিয়া বাহির করিয়া লইতে পারে।

(ছিন্নপত্র, কলিকাতা, ৭-ই অক্টোবর ১৮৯৪)

কবি নিজেকে সম্প্রদান করিতে চাহিতেছেন—বল লোভ কামনার কাছে নয়,—আনন্দময় সরলতার হাতে, অহেতুকী প্রীতির কাছে। কিন্তু তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য রাজার বল ব্যর্থ হইল, ধনীর লোভ-দেখানো ব্যর্থ হইল, সুন্দরীর রূপের প্রলোভনও ব্যর্থ হইল। অবশেষে তাঁহাকে খেলার সুখে বিনা মূল্যে জয় করিয়া লইল শিশু—অকারণ ও সরল ভালোবাসা কবির মনের উপর জয়ী হইল।

তুলনীয়: *God The Invisible King*—H. G. Wells (1917)

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them (his disciples).

And said Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.

St. Mathew, 18. 2-3.

গীতালি

এই পুস্তকখানিতে ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ৩রা কার্ত্তিক পর্যন্ত লেখা কবিতা ও গান স্থান পাইয়াছে। ইহা পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া বাহির হয় অগ্রহায়ণ মাসে—ইংরেজি ১৯১৪ সালে।

এই বইখানির সঙ্গে আমার অনেক সুখকর স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। ঐ সালের আশ্বিন মাসে আমি কবির কাছে কিছু দিন যাপন করিবার জন্য পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। একদিন কবি আমাকে বলিলেন—চারু, আমি যে খাতায় কবিতা লিখ্‌ছি সেই খাতাখানি রথী আর বৌমা আমাকে দিয়েছেন, তাঁরা আমার হস্তাক্ষর রক্ষা করবেন ব'লে। গানগুলি প্রেসে ছাপতে দিতে হবে, তুমি যদি এগুলি নকল ক'রে প্রেসের কপি তৈরি ক'রে দাও।

আমি ২১-এ আশ্বিন পর্যন্ত লেখা সমস্ত গান ও কবিতা নকল করিয়া কবিকে দিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এগুলি কেমন হইয়াছে? আমি বলিলাম—একটা গানের মানে আমি বুঝিতে পারি নাই। অন্যগুলি ভালোই হইয়াছে।

কবি আমার কথা শুনিয়া চটিয়া গেলেন, আমাকে রুষ্ট স্বরে বলিলেন—তুমি কিছু বোঝো না, এ ঠিক হয়েছে।

আমি আমার বুদ্ধির অল্পতা স্বীকার করিয়া লইলাম; এবং কবিকে গম্ভীর দেখিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। আমি আহারাদি করিয়া বেণুকুঞ্জে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। রাত্রি তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। হঠাৎ কবির আহ্বানে ঘুম ভাঙিয়া গেল—চারু, তুমি কি ঘুমিয়েছ?

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া এবং মশারি সরাইয়া কবিকে আমার বিছানায় বসাইলাম। তিনি বলিলেন—তুমি ঠিক বলেছ, ঐ কবিতাটার মানে আমিই বুঝতে পারি না। দেখ তো বদ্‌লে এনেছি, এখন হয়েছে কি না?

সেই পরে-লেখা কবিতাটি গীতালির মধ্যে ছাপা হয়েছে—সেটি ২৩ নম্বরের গান,—

যে থাকে থাক না দ্বারে,
যে যাবি যা না পারে।

কিন্তু পূর্বে যে গানটি লিখিয়াছিলেন, তাহাও সুন্দর হইয়াছিল, এখন আমি তাহা বুঝিতেছি। কবি আমাকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন তাহারই ক্ষোভ ভুলাইয়া দিবার জন্য গানটিকে বদল করিয়া আমাকে অত রাত্রে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন। পূর্বে রচিত ও পরিত্যক্ত গানটি নিম্নে উদ্ধার করিয়া রাখিয়া দিলাম—

কেন আর মিথ্যা আশা বারে বারে।
ওরে তোর হাত ধ'রে কেউ যাবে না রে,
এ তোমার রাত্রিশেষের ভোরের পাখী
তোমারেই একলা কেবল গেল ডাকি',
যা রে তুই বিজন পথে চ'লে যা রে।
ওদের ঐ হৃদয়-কুঁড়ি শিশির-রাতে
ব'সে রয় চোখের জলের অপেক্ষাতে।
মেটাতে পারবে না হে আঁধার নিশা
তোমার এই ফোটা ফুলের আলোর তৃষা,
সে যে তাই চেয়ে আছে পূবের পারে॥

কবির এই গানটিরই রচনার স্থান ও কাল ছিল ১৭ ভাদ্র সকাল, সুরুল; পরে যে গানটি রচনা করিয়া গীতালিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার রচনার স্থান শান্তিনিকেতন, এবং কাল আশ্বিন মাসের কোনো তারিখের রাত্রি। অথচ গীতালিতে যে গানটি আছে তাহার নীচে আগে রচিত গানেরই স্থান-কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে।

গীতালির উৎসর্গ-উপলক্ষ্যে যে আশীর্বাদী কবিতাটি আছে, তাহা কবির পুত্রকে ও পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। ইহা যে আকারে ছাপা হইয়াছে, তাহা তিন বার পরিবর্তনের পরে। প্রথমে আমি এক রকম নকল করি, পরে নকলের উপর কবি অনেক সংশোধন ও পরিবর্তন করেন, এবং অবশেষে তাহাও বাতিল করিয়া যাহা রচনা করেন তাহার মধ্যে পূর্বের রচনার অল্প কয়েক লাইন মাত্র রক্ষিত হইয়াছে।

ইহার পরে বর সঙ্গে আমরা বুদ্ধগয়াতে যাই ২৩-এ আশ্বিন। কতকগুলি কবিতা সেখানে এবং বুদ্ধগয়া হইতে 'বরাবর' পাহাড়ে বৌদ্ধ গুহা দেখিতে যাইবার পথে বেলা স্টেশনে ও পাল্কীর মধ্যে রচিত হয়।

গয়া হইতে কবির সহিত আমি এলাহাবাদে গেলাম। সেখানেও কতকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছিল। সেই কবিতাগুলিকে যখন ছাপিতে দেওয়া হইল,

তখন কবির রচনা এক অভিনব ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং সেই নূতন রকমের রচনাগুলি পরে 'বলাকা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

গীতালির প্রথম গানটি একটি গ্রীক ছন্দের অনুকরণে লিখিত।

কবির এত দিনের সব কান্না ব্যথা প্রিয়মিলনের সার্থকতার শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে গীতালিতে। গীতালিতে এই সার্থকতার স্বস্তির সুরই প্রধান। কবি 'নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন ব্যথা' সহ্য করার ভিতরে সিদ্ধির ও মুক্তির স্বাদও পাইয়াছেন। এখন প্রকৃতি এবং হৃদয় যেন পরস্পরের প্রতিচ্ছবি এবং রসস্বরূপের লীলাক্ষেত্র।

কবি আশীর্বাদ কবিতাটি প্রথমে লিখিয়াছিলেন—

আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম তাঁরে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
জেগেছি অনেক রাত্রি, ভেবেছি অনেক,
ক্ষণেক বা আশা হয়, আশঙ্কা ক্ষণেক।
হৃদয়ের তোলাপাড়া তুফানে ঢেউ—
মনে ভাবি আমি ছাড়া নাই বুঝি কেউ।
এমন করিয়া বলো কাটে কত কাল ;
মাঝি যে তাঁহারি হাতে ছেড়ে দিনু হাল।
আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে ;
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।
সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই,
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

পরে বদল করিয়া নিম্নলিখিত লাইনগুলি করিলেন—

সংসারে ক্ষণেক আশা, আশঙ্কা ক্ষণেক।

'এমন করিয়া বলো কাটে কতকাল'—লাইনটি কাটিয়া একবার লিখিলেন—

এ তরী আমারি ব'লে মরেছিনু ভেবে।

পুনরায় কাটিয়া করিলেন—

এ তরী আমারি ব'লে এত মরি ভেবে।

এবং পরের লাইনের 'হাল' কাটিয়া করিলেন 'এবে'।

'সংসারে ক্ষণেক আশা, আশঙ্কা ক্ষণেক'—লাইনের পরে যোগ করিলেন নূতন চারি লাইন—

সত্য ঢাকা পড়ে মোর ভয়ে ভাবনায়,
মিথ্যার মূরতি গড়ি ব্যর্থ বেদনায়।
বিশ্ব আনন্দের সৃষ্টি, আনন্দেই ভরা,
মোর সৃষ্টি মায়া দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

এই শেষ লাইনটি লিখিবার আগে লিখিতেছিলেন—'মায়া দিয়ে মোহ' এবং সেই অসমাপ্ত লাইন কাটিয়া শেষ লাইনটি লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু পরে যখন এই বই ছাপা হইল তখন কবি ইহার অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন দেখিলাম। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা বইয়ের সঙ্গে এই খসড়া পাঠ মিলাইয়া দেখিলে কবি-মনের একটু পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইবেন।

যাত্রাশেষ

১০৭ নম্বর

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের কার্তিক মাসের সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়;

যেমন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে নবপ্রভাতের আলোক প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে—দ্রঃ—"আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা"—(পূরবী, সমুদ্র), তেমনি মৃত্যুর মাঝে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে প্রাণ। রাত্রি যদি তাহার গভীর অন্ধকারের মধ্যে অরুণোদয়ের সংবাদ বহন করিয়া না আনিত তবে সৃষ্টি বিনষ্ট হইত। মানুষ দুঃখ শোক মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আস্বাদ পায় বলিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সেই উদয়াচলের—পরলোকের বা নবজীবনের পথে আমি তীর্থযাত্রী, আমি একাকী মৃত্যু-সন্ধ্যার অনুগামী হইয়া চলিয়াছি, আমার দিনান্ত অর্থাৎ জীবনাবসান মৃত্যুপারের দিগন্তে লুটাইয়া পড়িতেছে।

সেই নূতন জীবনের আভাসই তারায় তারায় স্পন্দিত। প্রত্যেক প্রকাশের পূর্বাবস্থা ধ্যান সমাধি—বীজকে বৃক্ষরূপে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ভূগর্ভবাস স্বীকার করিতে হয়; বাক্যে ও কর্মে পরিণত হইবার পূর্বে চিন্তাকে মনের গুহায় অজ্ঞাতবাস করিতে হয়। মরণোত্তর-কালের সুখস্বপ্ন তাই আমার চিত্তকে সাড়া দিতে বলে।

প্রত্যক্ষের পশ্চাতে অপ্রত্যক্ষ, রূপের পশ্চাতে অরূপ, জীবনের পশ্চাতে মৃত্যু। দিবসের আলোক নির্বাণ হইলেই দেখিতে পাই অনির্বাণ তারকার জ্যোতি; জীবনের অবসানেই দেখা দেয় পরলোকের আনন্দ ও সর্বাশ্রয়ের করুণা। অতএব আমি নির্ভয়ে আমার জীবন-সায়াহ্নের সকল সাধনা লইয়া—ম্লান দিবসের শেষের কুসুম চয়ন করিয়া—নবজীবনের কূলে যাত্রা করিয়া চলিয়াছি।

হে আমার জীবনাবসান, আমার সকল ভালোমন্দ তোমার মধ্যে নিহিত রহিল। হে অন্তর্যামী জীবনদেবতা, তোমার সঙ্গে আমার যে জন্ম-জন্মান্তরের যোগ তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। জীবনের অনেক সাধই অপূর্ণ রহিয়া গেল ইহাও স্বীকার করিতেছি।

জীবনের সফলতা বিফলতা সব মিলাইয়াই তো আমার এই আমিত্ব। অতএব কিছুই ফেলিয়া দিবার বা অবহেলা করিবার বস্তু নহে, সমস্ত মিলাইয়াই জীবনবিধাতা জীবনের পূর্ণ পরিণতি ঘটাইতেছেন। জগৎ নশ্বর, প্রত্যক্ষ। কিন্তু যাহা চিরন্তন অপরিণামী, তাহা অপ্রত্যক্ষ, অগোচর; তাহা প্রত্যক্ষের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষকে ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই হইল সৎ—সত্য, ভূমা, ব্রহ্ম। সকল ব্যর্থতা খণ্ডতা চেষ্টা ইচ্ছা মিলিয়াই সম্পূর্ণ সফলতা—'পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।'

ঋষি-কবির পারগামী দৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব বিরোধ অশান্তি বিফলতা প্রভৃতি সকল অসম্পূর্ণতাই একটা পূর্ণতার পূর্বসূচনা। কবি জানেন—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'। কবি সীমার মধ্যে অসীমতার সুসঙ্গতি দেখিতে পাইয়া আনন্দ-স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তিনি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বলিতে পারেন—

শেষের মধ্যে অশেষ আছে—এই কথাটি মনে
আজ্‌কে আমার গানের শেষে জাগ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।

—গীতাঞ্জলি

All we have willed or hoped or dreamed of good, shall exist.
Abt Vogler
—Robert Browning.

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী নাটকখানি ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসে লেখা, ইংরেজি ১৯১৬ সাল। বৈশাখ মাসে ১৩২৩ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয় হয়, জানুয়ারী মাসে পুনরায় কলিকাতায় অভিনয় হয় বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্য। নাটকের 'ফাল্গুনী' নামেই পরিচয় যে ইহা বসন্তের জয়গান। 'বসন্তের পালা' নামে 'ফাল্গুনী'র প্রবেশক ও ফাল্গুনী নাটক একত্র ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের 'সবুজপত্রে' জুড়িয়া প্রকাশিত হয়। '২২ সালের মাঘ সংখ্যায় ইহার অপর প্রবেশক 'বৈরাগ্য সাধন' প্রকাশিত হয়।

ফাল্গুনী নাটকের অন্তর্গত ভাব কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জীবনকে সত্য ব'লে জান্‌তে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই ব'লে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস ক'রেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখ্‌তে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস ক'রে তার সাম্‌নে দাড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দার মৃত্যুর তোরণ-দ্বারের মধ্যে আমাদের বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নব-জীবনের আনন্দে পৌছানো যায়। তাই যুবকেরা বল্‌লে,—আন্‌ব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী ক'রে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দেখ্‌তে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হ'য়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন ক'রে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব-বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চল্‌ছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তে হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চির-নবীন অমর মূর্তি প্রকাশ কর্‌বে ব'লে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বল্‌ছে—'যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ। যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌-দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—আমরা পথের বিচার করিনি; আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি,

আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তা হলে বসন্তের দশা কি হতো?'—বসন্তের কচি পাতার এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁক্‌ড়ে থাকতে পার্‌ত, তা হ'লে জরাই অমর হতো—তা হ'লে পুরাতন পুঁথির কাগজে সমস্ত অরণ্য হলুদে হয়ে যেত, সেই শুক্‌নো পাতার সরসর শব্দে আকাশ শিউরে উঠ্‌ত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন চির-নবীনতা প্রকাশ করে—এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ ক'রে জীবন্মৃত হ'য়ে থাকে—প্রাণবান্ বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

মানুষ তার জীবনকে সত্য ক'রে বড় ক'রে নূতন ক'রে পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে-জীবনটা বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, সে তো কেবলই মৃত্যুকে ভেদ ক'রে। মানুষ বলেছে—

মর্‌তে মর্‌তে মরণটারে
শেষ ক'রে দে বারে বারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেছে—

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারা জীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা।

—গীতিমাল্য

দিলে ব'লেই তোমার কোল ভ'রে উঠ্‌ল। তুমি আমাকে ফিরে ফিরে নব নব রূপান্তরে নূতন ক'রে ক'রে পাচ্ছ।

(৩য় শ্লোক)

আমাকে এই নানা ভাবে পাওয়াতেই তোমার আনন্দ। আমি এলাম অমনি সব শব্দিত হয়ে উঠ্‌ল—নইলে তার আগে সব স্তব্ধ ছিল। আমার মধ্যেই তোমার দুঃখ, আমি এসেছি ব'লেই তোমাকে দুঃখ দিলাম। আমি এলাম ব'লে যে আনন্দের উদ্বোধন হল, তার মধ্যে তেজ থাক্‌ত না, যদি দুঃখ তাকে না জ্বালাত—আমার দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই আনন্দশিখা জ্ব'লে উঠ্‌ছে? জীবনমরণের এই যে আন্দোলন,—এ আমায় নিয়েই হয়েছে। আমি এলাম ব'লেই তুমি এলে। আমার স্পর্শে তুমি আপনাকে স্পর্শ করলে, আমায় পেয়ে তোমার বক্ষ ভরে উঠ্‌ল।

(৪র্থ শ্লোক)

আমার মধ্যে কত অভাব ত্রুটি অসম্পূর্ণতা আছে, তাই আমার চোখে লজ্জা, মুখে আবরণ; আমি সেই আবরণের ভিতর দিয়ে তোমায় দেখ্‌তে পাই না। তাই আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে, পদে পদে বাধা আছে ব'লে জীবনে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হল না। কিন্তু আমি জানি যে আমি এমনি ভাবে আচ্ছন্ন আছি ব'লে তুমি অপেক্ষা ক'রে আছ—কবে এই আবরণ উদ্‌ঘাটিত হবে? এই আবরণ একদিন খ'সে প'ড়ে যাবে না তা নয়—কারণ তোমার আমাকে দেখ্‌বার জন্য কৌতূহলের অন্ত নেই। তুমি ক্রমশঃ আমার মধ্যে তোমার দৃষ্টি পেতে চাও। আমাকে দেখ্‌বে ব'লেই তুমি এত আলো জ্বালিয়েছ, তুমি আমার আত্মার সঙ্গে পরিচিত হবে বলেই তোমার এই সূর্যতারার আলো জ্বল্‌ছে।

[আলোচনা]

(১)

"আমি এলেম, এল তোমার দুঃখ"—বিশ্বের দুঃখ তো আমার সীমার মধ্যেই আছে। তোমার প্রকাশে যদি দুঃখ এসে থাকে, তবে সে তো আমিই বয়ে এনেছি। তোমার আপনার মধ্যে দুঃখ নেই, আমিই তাকে এনেছি। কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয়ে যায় নি। আমার এই দুঃখের ভিতর দিয়েই তোমার আনন্দের উপলব্ধি হচ্ছে। অদ্বৈতের মধ্যে যেটা দ্বৈত সেটাই বড় কথা। শুধু

monism তো negative। সীমা-সম্পর্কিত দুঃখের বিচিত্র লীলার ভিতরে যে আনন্দ সেটাই সত্যিকারের জিনিস।

এই কবিতায় "আমি" মানে হচ্ছে—সৃষ্ট জগৎ।

(২)

আমাদের দেহ হচ্ছে অসীমের প্রতিরূপ। সূর্যের আলো, প্রাণ, বাতাস, জল, আমার দেহ—এরা সব আকস্মিক জিনিস নয়, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই অসীমের background আছে। আমার মন যদি একটা isolated fact হয়, তবে আমি কিছুই জান্‌তে পারব না। কিন্তু আসলে আমার মনের একটা বাস্তবতার background আছে ব'লেই আমি বুদ্ধির ও চৈতন্যের জগৎকে পাচ্ছি।

বিজ্ঞান এ পর্যন্ত ব'লে এসেছে যে প্রাণ ও অপ্রাণের মধ্যে ছেদ আছে। প্রাণবান্ জিনিস প্রাণেই নিঃসৃত হচ্ছে, কম্পিত হচ্ছে। বিজ্ঞান একে Radio-activity-র গতিশীলতা বলেছে। কিন্তু জগতের প্রাণের এই গতিবেগ অসীমেরই গতিশীলতার একটা প্রকাশ। বিজ্ঞানবাদ অনুসারে অণু-পরমাণু কিছুই স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা নিজের বেগে চলেছে—nucleus-এর চারিদিকে electron-গুলি সৌরজগতের আবর্তনের মতো ঘুরছে, কিন্তু এদেরও অসীমের background আছে। আমরা কি বল্‌তে চাই যে, এই যে আমরা আপনাকে জান্‌ছি, আমাদের মনের সঙ্গে বিশ্বনিয়মের চিরন্তন যোগ রয়েছে, এটা কেবল একটা আকস্মিক যোগ; আর দেহমনের উপর যে personality আছে, তার কি infinite background নেই? এ হতেই পারে না। "অন্নং ব্রহ্ম"—আধিভৌতিক জগতেও অসীম আছেন, অসীমের আনন্দের মধ্যেই তাঁর personality-র বিকাশ। 'অন্ন' এক অর্থে impersonal। আপনাতে আপনার উপলব্ধি ও ঐক্যবোধের মধ্যে যে আনন্দ আছে, তাকেই personality-র বোধ বলা যায়। আমার personality তখনই দুঃখ পায়, যখন বাইরে কিংবা অন্তরে এই ঐক্যের বিচ্যুতি ঘটে।

শৈশব থেকে এ পর্যন্ত যে একটা ঐক্যধারার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি—যার মধ্যে আনন্দ আছে, সেই ঐক্যের ভাবটিকেই আমি personality বলেছি।

অসীমের personality ও আমার ঐক্যবোধের মধ্যে harmony আছে।

যখন অসীমস্বরূপ: দ্বৈতের মধ্যে ঐক্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন, তখনই তাঁর মধ্যে আনন্দ ও প্রেম জাগে। বন্ধুদের আত্মার প্রেমের মধ্যে এক জায়গায় বিচ্ছেদ আছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা ঐক্যসূত্র আছে। বিশ্বের মূলেও এই ব্যাপারটি আছে। আমি আর এক 'আমি'র প্রতিরূপ। আমার অন্তরের উপলব্ধিতে জীবলোকের নাট্যলীলা (drama of existence) আছে। আমার থাকার মধ্যে বিশ্বের মূলের এই থাকা আছে। আমি মানে একমাত্র 'আমি' নয়,—আমার ভোগ করা, দেখা, জানার উপরে যে আমিত্ব আছে তাই। আমি এসেছি বলেই দুঃখ আছে, আনন্দ আছে। আমি এসেছি বলেই এপার থেকে ওপারের চিরন্তন যোগাযোগ চলেছে।

বলাকা—৩০ নম্বর

এই দেহটির ভেলা নিয়ে

কবি এই কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

(১ম শ্লোক)

যে-দেহভেলা অবলম্বন ক'রে এতদিন জীবনস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিলুম, সেই ভেলাকে এবার ভাসিয়ে দাও। তাকে ফেলে দাও, সে চলে যাক্। তার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগ নেই, এবার তার কাজ ফুরোলো। অমুক ঘাটে পৌঁছব কি না, আমার কি হবে, আলো-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কোন্ পথ বেয়ে যাব?—এ-সব প্রশ্ন নাই করলুম, এর উত্তর নাই বা জান্লুম!

(২য় শ্লোক)

না-জানার দিকে যাত্রা করাই তো আমার আনন্দ। অজানাই আমাকে এখানে এনেছিলেন—তিনিই আমাকে আমার এই জন্মগ্রহণের দ্বারা জানাশোনার বন্ধনে বেঁধেছিলেন, আবার তিনিই তো সব গ্রন্থি খুলে সব চুকিয়ে দেবেন। আবার ঠিক সব খাপ খেয়ে যাবে, কোনোখানে অসামঞ্জস্য থাক্‌বে না। জানা এসে ব'সে ব'সে সব বাঁধে। তাই আমরা এখানে এসে সব ঘরকন্না গুছিয়ে নিই, নানা পরিচয়ের মধ্যে খুব ক'সে সব জেনে নিই, 'এ আমার অমুক, সে আমার অমুক'—এইসব জানাজানির ভিতরে বন্দী হই। এমন সময় হঠাৎ অজানা খামকা এসে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে জানার বাঁধন সব ছিঁড়ে দেয়।

(৩য় শ্লোক)

এই ভেলার যে হালের মাঝি সে তো অজানা। সেই অপরিচিতই আমার কর্ণধার। সে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অজানাই আমার জানার বন্ধন কেবলি ছিন্ন ক'রে ক'রে আমাকে মুক্তি দেয়। সে থেকে থেকে বার বার মুক্তি দিতে দিতে আমাকে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। তাই ত আমার সাম্‌নের দিকে যে অজানা আছে, তাকে আমি ভয় করতে চাইনে।—আমি জানি সেই আমার হালের মাঝি, সে আমার এই জীবনেও আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মৃত্যু হঠাৎ এসে আমাকে চমক লাগিয়ে দেয়। আকস্মিক ঘটনা আমাকে ত্রস্ত করে।—এমনি ক'রে নির্দয় যিনি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন ব'লে অপূর্বের অপরিচিতের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার ভয় ভাঙিয়ে দেন।

(৪র্থ শ্লোক)

তুমি ভাব্‌ছ যে, যেদিন চলে গেছে তাকেই ভালো জানি, অতএব তারই পুনরাবৃত্তি হোক, তাকেই বারে বারে ফিরে পাই। কিন্তু তুমি যে-কূল ছেড়েছ, সে-কূলে আর কিছুতেই ফিরে যাবে না। তোমার কি পিছনের পরেই একমাত্র নির্ভর? ঐ পিছনই কেবল বিশ্বাসযোগ্য? যা অতীত তাই কেবল তোমার প্রধান সম্পদ্, এম্‌নি কি তুমি ভাগ্যহারা? কেন তুমি বল্‌তে পার্‌লে না,—সাম্‌নের পরে তোমার বিশ্বাস আছে; সেখানে তোমার ভয় নেই? পিছন তোমাকে কিছুতে বেঁধে রাখবে না, এতেই তোমার আনন্দ হোক্!

(৫ম শ্লোক)

ঘণ্টা বেজেছে, সভা যে ভেঙে গেল,—নৌকা ছাড়্‌তে হবে, জোয়ার উঠেছে। তিনিই অজানা যাঁর সঙ্গে দেখা হবে ব'লে মনে করি, কিন্তু যাঁর মুখ দেখা আমার হয় না। তাঁকে জানি না ব'লে একটু ভয় হয় বই কি, একটু বুক দুলে ওঠে, মনে হয় কি জানি কেমন ক'রে অজানা আমার কাছে দেখা দেবে। এই শ্যামল পৃথিবী তার সূর্যালোক নিয়ে এবারকার মতো দেখা দিল; আবার অজানা কেমন ক'রে দেখা দেবে বল্‌তে পার? এই পৃথিবীতে জন্মমুহূর্ত থেকে সূর্যালোকে লোকালয়ের নানা দৃশ্য, নানা ঘটনা, নানা অবস্থার মধ্যে অজানাকে ক্রমশই জানার ভিতর দিয়ে স্পর্শ কর্‌তে কর্‌তে চলেছি। অজানাকে কেবলি জানা, না পাওয়াকে কেবলই পেতে থাকাকেই তো জীবন বলে। এই জীবনকে

তো ভালবেসেছি; অর্থাৎ, সেই অজানাকে লেগেছে ভালো। সমুদ্রের এপারে তাকে ভালো লেগেছিল, সমুদ্রের ওপারেও তাকে ভালো লাগবে।

বলাকা—৩১ নম্বর

নিত্য তোমার পায়ের কাছে

কবিতাটির কবিকৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

তোমার নিজের বিশ্বে তোমার অধিকারের কোনো খর্বতা, কোনো বাধা নেই। তোমার মধ্যে কোনো অভাব নেই, তুমি পূর্ণ। অভাব যদি না থাকে, তবে তো ঐশ্বর্য থাকার কোনো মানেই থাকে না। কেননা অভাবের অভাবকে তো ঐশ্বর্য বলে না, অভাবের পূর্ণতাকেই বলে ঐশ্বর্য। চাওয়া ব'লে তোমার কিছু নেই। সুতরাং পাওয়া ব'লে তোমার কিছু থাকৃতে পারে না। তা হলে তোমার ঐশ্বর্য, তোমার আনন্দ থাকে কই ?

তোমার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই ব'লেই আমার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজন সৃষ্টি করেছ। তোমার বিশ্বকে তুমি আমার ভিতর দিয়ে ফিরে পাচ্ছ, যেন হারানো ধনকে নতুন ক'রে লাভ করছ। তোমার যে সম্পদ্ তোমার ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ হয়েই আছে, সে তো তোমার পক্ষে অতীত; তাকেই তুমি নিয়ত আমার মধ্যে দিয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অভিমুখে বহমান করে দিচ্ছ।

প্রতিদিনের জাগরণ দিয়ে আমি প্রতিদিন সোনার সূর্যোদয় কিনে থাকি। আমাকে যদি না কিন্‌তে হত, তাহলে এ সূর্যোদয়ে কোথাও কোনো আনন্দ থাকৃত না; এ সূর্যোদয়ে প্রভাতী গান জাগৃত না। প্রতিদিন এ'কে নূতন ক'রে পাই ব'লেই তো এতে আনন্দের মূল্য লাগে। একে যাঁর পেতেই হয় না, তাঁর কাছে এর আনন্দ কোথায় ? তাই ত আমার পাওয়ার ভিতর দিয়েই তোমার প্রভাতের আনন্দ তোমাকে স্পর্শ করে।

তোমার হাতে রসের পরশ-পাথরখানি আছে। কিন্তু তোমার মধ্যে যদি রস সম্পূর্ণ হয়েই থাকে, তাহলে সেই পরশ-পাথরখানিকে তুমি চিন্‌বে কি ক'রে ? ক্ষণে ক্ষণে তুমি তাকে যাচাই করবে ব'লেই তো আমি আছি। তোমার প্রেমের স্পর্শমণি লেগে আমার চিত্ত সোনা হয়ে ওঠে; সেই সোনাই তোমার যথার্থ সম্পদ্; আমার অভাব, আমার অপূর্ণতা, আমার বাধার ভিতর দিয়েই তুমি তাকে লাভ কর। তোমার পরিপূর্ণতা যখন আমার শূন্যকে পূর্ণ করে, তখন তুমি আপন পূর্ণতার স্বরূপটিকে নতুন নতুন ক'রে দেখ্‌তে পাও,—তোমার প্রেম

আমার প্রেমের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে তোমার কাছে পৌঁছয়—তোমার কাছে তোমার প্রেমের পরিচয় আমারই মধ্যে।

বলাকা—৩২ নম্বর

আজ এই দিনের শেষে

আজ এই দিনের শেষে এই যে সন্ধ্যা আপন কালো কেশে সূর্যাস্তের মাণিক পরেছিল, তাকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে নিয়েছি। তাকে বিনাসূতায় এই কবিতায় গেঁথে নিয়ে চলার হার ক'রে নিলুম। এই মাত্র, এই ক্ষণে ঐ ঘুমিয়ে-পড়া চক্রবাকের নিদ্রার দ্বারা নীরব নির্জন পদ্মার তীরে সন্ধ্যা যেন তার নির্মাল্য নিয়ে, পূজায় নিবেদিত সোনার ফুলের মালা নিয়ে সমস্ত আকাশ পার হয়ে আমার মাথায় ছুঁইয়ে দেবে ব'লে এসেছিল। প্রকৃতি সন্ধ্যাকুসুমের এই মালা পূজার অর্ঘ্য রূপে নিবেদন করেছিল। সেই মালা সে আমার মাথায় ঠেকিয়ে গেল, আমি তা অন্তরে অনুভব করলুম। ঐ যে সন্ধ্যা আস্তে আস্তে অন্ধকার আকাশে নীহারিকাকে স্রোতে ভাসিয়ে দিল, ঐ যে আকাশে ছায়াপথে তারার দল ক্রমে ক্রমে স'রে যাচ্ছে, তা চোখের সাম্‌নে পদ্মার তরঙ্গহীন স্রোতের প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখ্‌ছি,—যেন সন্ধ্যা সেই তারার দলকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঐ যে সন্ধ্যা সোনার চেলি রাত্রের আঙিনায় অন্ধকারে বিছিয়ে দিয়েছে, সে যেন নিদ্রায় অলস দেহ নিয়ে সেই চেলি মেলে দিয়েছে। আর ঐ যে রাত্রির কালোঘোড়ার রথে চ'ড়ে সন্ধ্যা সপ্তর্ষির ছায়াপথে আগুনের ধূলো উড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিল—এই তো সব চোখ মেলে দেখ্‌লুম! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সন্ধ্যা এসেছিল, এত বড় কাণ্ড, এত ঘটা, কেবল একজন কবির জন্যই হল। তার কাছে এসে সন্ধ্যা তার করুণ স্পর্শ রেখে গেল। অনন্তকালের মধ্যে এমন অনুপম সন্ধ্যা একজন কবির কাছে দেখা দিল,—এত আয়োজন, এই আশ্চর্য ব্যাপার তাকে স্পর্শ করে চ'লে গেল। এমনি ক'রে তুমি এক নিমেষের পত্রপুটে অনন্তকালের ধনকে ভ'রে দাও—এমন যে অমৃত তা ক্ষণকালের ভিতরে সার্থক করে তোল—এই তো তোমার লীলা।

বলাকা—৩৩ নম্বর

জানি আমার পায়ের শব্দ

এই যে আমি চলেছি, জীবনের পথে নানা অভিজ্ঞতার ভিতরে আমার যে বিকাশ হচ্ছে, বিশ্বে এটা একটা সার্থক ব্যাপার। আমি আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে

আমার চৈতন্যে বিশ্বকে বহন ক'রে নিচ্ছি। আমি চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত ক'রে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হব, এর জন্যে বিশ্বে অপেক্ষা আছে। বিশ্ব আমার ক্রমিক বিকাশের দিকে চেয়ে আছে। আমার চিত্ত যতটুকু পরিণামে গিয়ে ঠেক্‌ছে তারই জন্য বিশ্ব প্রতীক্ষা ক'রে আছে।

আমার মধ্যে যে শক্তি যে আকাঙ্ক্ষা আমাকে চালাচ্ছে, তা বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বিশ্বের মধ্যেও এই অগ্রসর হবার, পরিব্যাপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা আছে—তা কেবল আমারই একলার সামগ্রী নয়। তাই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে বিশ্বে আনন্দ আছে। যদি আমার চলা এমন বিচ্ছিন্ন সত্য হত, তবে বিশ্বে এমন গতিবেগ থাকৃত না, বিশ্ব মুশ্‌ড়ে যেত। কিন্তু আসলে একটি বৃহৎ ক্ষেত্রে আমার আকাঙ্ক্ষার স্থান আছে। এই অনুভব ক'রে এই কবিতা লেখা।

(১ম শ্লোক)

আমার মধ্যে কি একান্ত নিঃসঙ্গতা আছে, চিত্ত ছাড়া বাইরে কি আমার কোনো সার্থকতা নেই? হাঁ, আছে। আমার দোসর আছেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার আকাঙ্ক্ষার সুর মিল্‌ছে। অসীমের পথে আমার চলার শব্দ তাঁর কানে ঠেক্‌ছে। এই বিশ্বের যে রূপরসগন্ধ আমার চিত্তে আঘাত কর্‌ছে, তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বের আনন্দ আমাকে নিয়েই পূর্ণতা লাভ কর্‌ছে। আমার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দের বিকাশ হচ্ছে। যখন আমার চিত্ত সঙ্কুচিত হয় না, আপনাকে উদ্ঘাটিত করে, তখনই এই সূর্য চন্দ্র তারা পূর্ণ আলো দেয়, সেই শুভক্ষণে বিশ্বের সৌন্দর্য সুন্দরতম হয়ে প্রকাশিত হয়। আমি পায়ে পায়ে এগোচ্ছি, আর বিশ্বজগৎ প্রতি পদক্ষেপে পুলকিত হয়ে উঠ্‌ছে। আমি যে চলেছি এর শব্দ কেউ শুন্‌ছে বা শুন্‌ছে না, তা আমি জানি না; কিন্তু আমার চলার ধ্বনি এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্চে। আমি জানি যে আমার এই যে আলো-অন্ধকার সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে যাত্রা, এর পদশব্দ একজন শুন্‌তে পাচ্ছেন।

(২য় শ্লোক)

এই যে জন্ম থেকে জন্মে নব নব জীবনের মধ্যে দিয়ে আমার পদ্মটির এক একটি দল উদ্ঘাটিত হচ্ছে, এ তো তোমারই চিত্ত-সরোবরের মধ্যে। তোমার মানস-সরোবরে আমি পদ্মটির মতো বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছি—নব নব জীবনে তার

দলগুলি খুলে যাচ্ছে। এই ব্যাপার দেখ্‌বার জন্য সকল গ্রহতারা চারিদিকে ভিড় ক'রে রয়েছে, এদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তারা সব আমারই জন্ত আলো দান ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

তোমার যে জগৎকে সৃষ্টি করেছ, তা যেন অন্ধকারের বৃত্তের উপর তোমার আলোর মঞ্জরী,—যেন তাতে একসঙ্গে অনেক ফুল ধ'রে রয়েছে। সেই মঞ্জরী তোমার দক্ষিণ হস্ত পূর্ণ ক'রে রয়েছে; কিন্তু তোমার স্বর্গ তো অমন ক'রে চোখের সামনে প্রকাশিত হয় না, সে লাজুক, সে আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তারার বিচিত্র প্রকাশের মতো একটি গুচ্ছে সে ফুটে ওঠে নি, সে যেন পাতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখা ফুলের মতো। কিন্তু তোমার এই গোপন স্বর্গটি যেখানে, সেখানেই তোমার সঙ্গে আমার পূর্ণ মিলন। তোমার লাজুক স্বর্গ প্রেমের নব নব বিকাশের ভিতরে একটি একটি দল মেলে দিচ্ছে, মঞ্জরীর মতো তার একেবারে পূর্ণবিকাশ হয় না। আমার অন্তরের ভিতরে তোমার সেই স্বর্গ, আমার প্রেমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার পাপড়িগুলি খুলে দিচ্ছে। সেই গোপন উদ্‌ঘাটনের দিকে তোমার দৃষ্টি। তাতেই তোমার আনন্দ।

বলাকা—৩৪ নম্বর

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে

১ম শ্লোক

আমি আজ আমার মনের জানালার দিকে আপনাকে স্থাপন করলুম—আমার মনকে বাইরের দিকে মেলে ধরলুম। তোমার চিত্ত যেখানে কাজ করছে সেখানে দৃষ্টি প্রসারিত করবার জন্যে তাকে যেন খুললুম। আমি নিজে কি ভাব্‌ছি, আমার নিজের কি সুখ-দুঃখ আছে, তার দিকে আমি আজ আর তাকালুম না, এবং তখন অনুভব করতে পারলুম যে, বিশ্বে তুমি আপন মনে কাজ করছ।

আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌লুম? আমি আজ আমার হৃদয়ের ডাককে বাইরে দেখ্‌লুম। আমি যখন অন্তরে নিবিষ্ট হ'য়ে থাকি, তখন অনুভব করতে পারি যে তুমি আমায় ডাকছ। তখন আমার মধ্যে তোমার যে ডাক রয়েছে তা এসে পৌঁছয়, তোমার-আমার মধ্যে যোগাযোগকে জানতে পারি—বিশ্বের মধ্যে তোমার কর্মচেষ্টাকে আমি অনুভব করতে পারি। আজ আমি

দেখ্‌লুম ফুলের মধ্যে পাতার মধ্যে তোমার ডাক রয়েছে। মনের জানালা খুলে দেখি যে তোমার ঐ অন্তরের বাণী চৈত্র মাসের সমস্ত পত্র-পুষ্পের মধ্যে বাইরে ছড়িয়ে আছে। তাই আজ আমার আর কোনো কর্ম নেই, তোমার ডাক শুনে আমি কেবল বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। অন্তরের ধ্যানের দ্বারা বাইরের ইন্দ্রিয়ানুভবের দরজা বন্ধ ক'রে যে ডাক মনের মধ্যে শুন্‌তে চেষ্টা করি, আজ সেই তোমার আহ্বান-বাণী যেন পাতায়-পাতায় ফুলে-ফলে চারিদিকে দেখ্‌লুম। আজ তাই কেবল চেয়ে আছি—আমার সব কর্ম ঘুচে গেছে।

২য় শ্লোক

আমি আমার নিজের সুরে যে গান গাই তা আবরণের মতো। কারণ, আমি গাইবার সময়ে তোমার বিশ্বরাগিণীকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলি। আজ আমার নিজের সুরের সেই পর্দা তোমার গানের দিকে উঠে গেল, তোমার সঙ্গীত আমার কাছে প্রকাশিত হলো। আমার নিজের গান যখন বন্ধ হয়েছে, তখন আমি অনুভব করছি—এই সকালের আলোই আমার নিজের গানের মতো। আজ আমার গানের দর্‌কার নেই; কারণ, প্রভাত-আকাশ আমারই গান প্রকাশ কর্‌ছে, কিন্তু সে গানের সুরটা তোমার। তাই আমার নিজের সুরের প্রয়োজন রইল না। আমারই সঙ্গীত সকালের আলো আর আকাশকে পূর্ণ ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে।

আজ আমার মনে হলো আমারই প্রাণ তোমার বিশ্বে তান তুলেছে; তোমার বিশ্বে ফুলের সৌন্দর্যের আর আকাশের গানের কোনো মানে থাকে না, যদি না আমার মন তাতে সাড়া দেয়। আমার মনের আনন্দের সঙ্গে তাদের যোগ আছে। বিশ্বের যা কিছু মধুর ও সুন্দর, তা আমার চিত্তে ধ্বনিত ও প্রতিফলিত হচ্ছে ব'লেই তা মধুর ও সুন্দর। যে-জগৎ আমার চেতনার মধ্যে সাড়া না পায় তা বোবা জগৎ। তাই আমার গানের সুরগুলিকে আজ তোমার জগৎ থেকে ফিরে শিখে নিতে হবে। আমার মন বিশ্বের শ্যামলতায় ও নীলিমায় যে আনন্দ পাচ্ছে তাই তো তোমার গান—সেই গান তো আমায় শিখে নিতে হচ্ছে। আমি আমার নিজের সুর ভুলে গিয়ে নিজের গানকে তোমার সুরে ধ্বনিত দেখ্‌ছি,—আর সে সুর তোমার কাছে শিখে নিচ্ছি।

বিশ্বে যা রমণীয়, যা মধুর দেখ্‌ছি—যার থেকে রস উপভোগ কর্‌ছি—তারা চিত্তের বাইরে কোনো বিচ্ছিন্ন সুন্দর বস্তু নয়। আমার মনের মধ্যে

যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাই এ-সবকে সুন্দর কর্‌ছে। বিশ্বের গাছ-পালা দেখে যে ভালো লাগ্‌ছে সেই ভালো লাগাটাই হচ্ছে তার সৌন্দর্য।

ফুলের মধ্যে আমারই গান আছে, কিন্তু সে গান কার সুরে বাজ্‌ছে? সে তো আমার নিজের সুরের সা রে গা মা নয়,—তা যে স্বতন্ত্র একটি সুরে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে। বিশ্বের সৌন্দর্যে আমার যে আনন্দসম্ভোগ, তার মধ্যে আমি আমার মনের গান পাচ্ছি, সে গান আমার নিজের বাঁধা সা রে গা মা সুর নয়—তা তোমার নিজেরই সুর। তাকেই আমি শিখে নিচ্ছি। আমি আনন্দিত না হ'লে আমার নিজের গান হ'তে পারত না।

আমি যখন নিষ্ক্রিয় থাকি তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার সুর শুনি; ফুলে পাতায় আমার নামে তোমার ডাককে দেখ্‌তে পাই। আজ তাই গাইতে চেষ্টা কর্‌ছি না—আমার খুশি মনকে বিশ্বে মেলে দিয়েছি। আজ ফুলগুলি যে সঙ্গীতের মতো জেগে উঠেছে, এতে আমার হাত আছে—আমার চিত্তই তাদের মাধুর্য দান করেছে—অথচ সেই সুর আমার নিজের নয়—সে গান ফুলেরই সুরে রচিত। আমার হৃদয়কে মেলে দিয়ে আমার গানকে তোমার সুরে শুন্‌তে পাবার সৌভাগ্য লাভ কর্‌ছি।

বলাকা—৩৫ নম্বর

আজ প্রভাতের আকাশটি এই

এই যে সকালে আকাশটি শিশিরে চকমক কর্‌ছে, ঝাউগাছগুলি রৌদ্রে ঝলমল কর্‌ছে—এরা বাইরের জিনিস হ'লে আজ কি অন্তরের এত কাছে আস্‌তে পারত? এই ঝাউ আর আকাশ এমন নিবিড় ভাবে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করেছে যে আমি অনুভব কর্‌ছি যে এরা যেন মনের ব্যাপারেরই অংশ—যেন এরা বস্তুজগতের ব্যাপার নয়। কারণ, এরা যদি কেবল বস্তুপিণ্ড দিয়েই গড়া হ'ত তবে এমন ক'রে আমার মনের মধ্যে স্থান পেতে পারত না,—বাইরেই থেকে যেত, তাদের সঙ্গে আমার অসীম ব্যবধান থেকে যেত।

আজ ঝাউগাছের ঝালর আর শিশির-ছলছল আকাশ এমন নিবিড় ভাবে আমার মনকে পূর্ণ করেছে যে আমার মনে হচ্ছে—এরা যেন আমার হৃদয়ে পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। বাইরের বিশ্ব যেন আমার মনেরই সামগ্রী, যেন অকূল মানসসরোবরে পদ্মের মতো ফুটে রয়েছে। আজ আমি এই ধুলোবালির

মধ্যে বস্তুবিশ্বেই কেবল স্থান পাইনি। আমি আজ জান্‌তে পার্‌লুম যে এই বিশ্বটি একটি বাণী, আর তার মধ্যে আমি একটি বাণী,—বিশ্বটি একটি গান, আর আমি তার মধ্যে একটি গান; এই বিশ্বের মহাপ্রাণের একটি প্রকাশ আমি, অন্ধকারের বুক-ফাটা তারার মতো। আজ যেন আমার অস্থিচর্ম নেই—আজ যেন আমি অন্ধকারের হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে উত্থিত অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল আলোক। আজ বিশ্ব আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

বলাকা—৩৬ নম্বর

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা

১৩২২ সালের কার্ত্তিক মাসের সবুজপত্রে 'বলাকা' শিরোনামে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই কবিতাটি কাশ্মীর শ্রীনগরে লেখা। কবি সন্ধ্যাবেলা বজরার ছাদে বসিয়াছিলেন। সেই সময়ে একঝাঁক বলাকা তাঁহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে কবি-চিত্তে যে ভাবতরঙ্গ খেলিয়া গেল, তাহাই এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই কবিতার বিষয় ও নাম হইতে সমগ্র বইয়েরই নাম হইয়াছে বলাকা। যাযাবর পাখীর ঝাঁক অনন্ত আকাশপথে উড়িয়া যাইবার সময়ে কবিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেল যে জগতের সমস্ত কিছুই যাযাবর, গমিষ্ণু,—প্রাণ হইতে জড়পদার্থ পর্যন্ত সবার মধ্যেই সঞ্চিত রহিয়াছে গতির আবেগ। যে গতিবেগ কবি আবাল্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া নানা কবিতায় নানা সময়ে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, সেই গতির বাণীই শুনাইয়া গেল বলাকার নিরুদ্দেশ যাত্রা—এবং সেই জন্য এই কবিতাটি হইয়াছে নিখিল জগতের তীর্থযাত্রার জয়গান। কবি দেশ ও কালের বাহিরে, লোক-লোকান্তরে ও কাল-কালান্তরে নিজেকে প্রসারিত করিয়া বিশ্বজগতে যে চিরন্তন গতিক্রিয়া আছে তাহাই অনুভব করিতেছেন—তাঁহার মন সেই বিবাগী হংসবলাকার যাত্রা দেখিয়া প্রাচীন ঋষির মতনই উদাত্ত স্বরে বলিয়া উঠিয়াছে—'শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্রগণ, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' সকলকে যাত্রা করিয়া চলিতে হইবে। কাহারও কোথাও স্থির হইয়া স্থগিত হইয়া গণ্ডিবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ-সীমায় বন্দী হইয়া থাকিবার হুকুম নাই।

যাযাবর পাখীরা যেমন নিজের বহুযত্নে গড়া পরিচিত আরামের বাসা ফেলিয়া অজ্ঞাত দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, নিখিল-প্রাণ তেমনি অনুভব করে—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।

—প্রবাসী

অতএব এখানে থামিলে চলিবে না—'আগে চল্ আগে চল্ ভাই।'

অন্ধকার নামিয়া আসিতেই ঝিলম নদীর বাঁকা জলধারা ঢাকা পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়া কবির মনে হইল যেন কেহ একখানি বাঁকা তলোয়ার কালো খাপের মধ্যে ভরিয়া রাখিল। এই রকম উপমা এক ইংরেজ কবির কবিতাতে দেখা যায়। ঐ কবি পাহাড়ের চূড়াকে খাপ-খোলা তলোয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন—

I'm homesick for my hills again.........
My hills again !
To see above the Severn plain
Unscabbarded against the sky
The blue high blade of Costwald lie;
—F. W. Harvey (born 1888).

এবং বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

রজনি ছোটি হো দিবস বাঢ়।
জনি কামদেব করবাল কাঢ়।

শীতের অবসানে বসন্তের আগমনের সূচনা করিয়া ক্রমশ রজনী ছোট ও দিবস বড় হইতেছে, যেন কামদেব কালো খাপের ভিতর হইতে চক্‌চকে তলোয়ার আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতেছেন।

দিনের আলোতে যখন ভাঁটা লাগিল, তখন রাত্রি কালির জোয়ার লইয়া উপস্থিত হইল—সেই জোয়ারের বন্যায় তারারা সব ফুলের মতন ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সেই আচ্ছন্ন অন্ধকার যেন সৃষ্টির অব্যক্ত গুম্‌রানো শব্দপুঞ্জের জমাট রূপ—সমস্ত প্রকৃতি যেন কথা কহিতে চাহিতেছে, কিন্তু স্বপ্নে যেমন কেবল অব্যক্ত একটা শব্দ হয়, তেমনি যেন অব্যক্ত এক বাণী অন্ধকার ভরিয়া রহিয়াছে বলিয়া কবির মনে হইতে লাগিল।

সহসা বিদ্যুৎ-ছটার ন্যায় হংসবলাকার পাখার শব্দ নিস্তব্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া আকাশের বুকে রেখা টানিয়া চলিয়া গেল। ঝড়ের মধ্যে যে গতির উন্মাদনা, সেই উন্মাদনার বশেই যেন বলাকা পক্ষবিস্তার করিয়া ছুটিয়া

চলিয়াছে। স্তব্ধতা যেন তপস্যা করিতেছিল মৌনী হইয়া, শব্দময়ী অপ্সরা সেই পক্ষধ্বনি তাহার মৌনতা স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিয়া গেল এবং সেই অঘটন ঘটিতে দেখিয়া দেওদার-বন শিহরিয়া ভাবিতে লাগিল—এ কী! এ কী! এ কী গো! সেই পাখার শব্দে নিশ্চলের অন্তরে চলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

কবি নিশ্চলেরও অন্তরে অন্তরে চির-চঞ্চলের আবেগ অনুভব করিতেছেন। বৈশাখের মেঘ যেভাবে কালবৈশাখী ঝড়ের তাড়নায় আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া চলে, তেমনি বাধাবন্ধহারা হইয়া পর্বতসকল যেন ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। বাস্তবিক, পর্বত অচল বলিয়া অভিহিত হইলেও তাহা তো অচল নহে, পর্বত অতি ধীরে হইলেও মানবের অগোচরে অগ্রসর হইয়া চলে, তাহারও বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে,—কত কত শিলা নির্ঝরে নদীতে খসিয়া পড়িয়া প্রবাহিত হইয়া দূর-দূরান্তে চলিয়াছে, শিলা ঘৃষ্ট হইয়া হইয়া পলিমাটি-রূপে সমুদ্রে উপনীত হইতেছে, সুতরাং পর্বতও চলিতেছে। গাছও চলিতেছে—ফলের মধ্যে সুস্বাদ ও সুরস সঞ্চার করিয়া প্রাণীদের প্রলুব্ধ করিতেছে তাহাদের বীজ দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া ফেলিতে। শালগাছের বীজের গায়ে পাখা গজায় দূরে উড়িয়া পড়িবার জন্য, কার্পাস ও শিমুল গাছের বীজের গায়ে তুলা জন্মায় বীজগুলিকে নানা স্থানে উড়াইয়া দিবার জন্য—এমনি করিয়া এক দেশের গাছ অন্য দেশে ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিয়াছে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে কবিকে কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।

—সুদূর

সেই হংসবলাকার পাখার বাণী নিখিলের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।'

স্তব্ধতার আবরণ মায়াজালের মতন স্তব্ধতার অন্তর্নিহিত গতির আবেগকে কবির অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল, সেই পাখা-বিবাগী পাখীরা যেন সেই আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া গেল। তখন কবি দেখিতে পাইলেন—মাটির উপরে তৃণদল বর্ধিত হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, ইহা যেন তাহাদের উড়িয়া চলিবারই প্রয়াস। মাটির নীচে কত কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ বীজ তাহাদের অঙ্কুর উদ্‌গত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহাও যেন তাহাদের ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিবার প্রয়াস। পর্বত চলিয়াছে, অরণ্য দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে

যাত্রা করিয়া চলিয়াছে, নক্ষত্রপুঞ্জও আবর্তিত হইতে হইতে কোন্ অজানা হইতে অজানার দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে—সেই অজানাকে না জানিতে পারার বিরহ-বেদনায় সমস্ত আকাশ ক্রন্দসী হইয়া উঠিয়াছে, নক্ষত্রগুলি যেন সেই কালো মেয়ের কপোলে আলোকময় অশ্রুবিন্দু রূপে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

তুলনীয়—

……শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন……

—পূরবী, সমুদ্র

মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কামনা ভাবনা লোকালয়ের তীরে তীরে এক শতাব্দী হইতে অন্য শতাব্দীতে, এক যুগ হইতে অন্য যুগে দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত বিশ্বশক্তি ও বিশ্বচেষ্টা যেন আকুল স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—এখানে থামিলে চলিবে না—চলো, চলো, চলো—চরৈবেতি! চরৈবেতি!

এই নিরন্তর চলিবার আহ্বান আমাদের ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন যুগে ধ্বনিত হইয়াছিল, আবার এই নবীন যুগে স্থবির জাতিকে চলার বাণী শুনাইলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছিলেন—

নানা শ্রান্তায় শ্রীর্ অস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপোনৃষদ্‌বরোজনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
- চরৈবেতি, চরৈবেতি।

হে রোহিত, চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে-ব্যক্তি চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইয়াছে তাহার আর শ্রীর ইয়ত্তা থাকে না। শ্রেষ্ঠ জনও যদি শুইয়া পড়িয়া থাকে তবে সে তুচ্ছ হইয়া যায়। যে চলিতেছে স্বয়ং দেবতা সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। অতএব হে রোহিত, বাহির হও বাহির হও, চলিতে থাকো।

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুর্ আত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
—চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে বিচরণ করে তাহার প্রতি পদক্ষেপে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার পথ সুষমাময় হইয়া উঠে, তাহার আত্মা নিত্য বৃহৎ হইতে থাকে এবং সে নিত্যই বৃহত্ত্বের ফললাভ করে। যে পথ সম্মুখে নিত্য উন্মুক্ত তাহাতে যে বিচরণ করে, তাহার

সকল পাপ শ্রমের দ্বারা হতবীর্য হইয়া মরিয়া মরিয়া তাহার পথের উপর শুইয়া পড়ে। অতএব চলো, চলো।

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু উদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
—চরৈবেতি, চরৈবেতি!

যে চলিতে থাকে সেই মধু লাভ করে, যে চলে সেই অমৃতময় স্বাদু ফল লাভ করে। ঐ দেখ সূর্যের কী দীপ্ত মহিমা—সে যে চলিতে চলিতে কখনো তন্দ্রাবিষ্ট হয় না। অতএব চলো, চলো!

তুলনীয়—

Not there, not there, my child! —Mrs Hemans.

You road, I enter upon and look around,
I believe you are not all that is here,
I believe that much unseen is also here.
Allons! whoever you are, come, travel with me!
Travelling with me you find what never tires.
Allons! we must not stop here,
Allons! the road is before us!
—*The Song of the Open Road,* Walt Whitman.

বলাকা—৩৭ নম্বর

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন

এই কবিতাটি ইউরোপের মহাযুদ্ধ স্মরণ করিয়া লেখা বলিয়া মনে হয়। যখন মরণে মরণে আলিঙ্গন লাগিয়াছে, মৃত্যুর গর্জন শোনা যাইতেছে, তখন কবি অনুভব করিতেছেন যে এই প্রলয়-তাণ্ডবের ভিতর দিয়া রুদ্র নূতনকে সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিতেছেন—মিথ্যা অন্যায় পাপের দ্বারা যখন সত্য আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন সেই সত্যকে গ্লানি-নির্মুক্ত করিবার জন্য এই আয়োজন। এই বিক্ষোভের ভিতর হইতেই নবযুগের উষার অভ্যুদয় হইবে—অতএব কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না, সকলকে চেষ্টা করিয়া অগ্রসর হইয়া নূতনকে সত্যকে ন্যায়কে আবাহন করিয়া লইতে হইবে। এই যে বিশ্বজোড়া সংঘাত লাগিয়াছে, এই যে রুদ্রের রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ কাহার দোষে হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক নাই। বিশ্বে যদি কোথাও একটু পাপ অন্যায় অসত্য প্রবল হইয়া উঠে তাহার জন্য বিশ্ববাসী সকল নরনারী দায়ী, এবং তাহার ফলভাগীও হইতে হয় সকলকে—

এ আমার এ তোমার পাপ।

যে পাপের ভার এতদিন নানা স্থানে নানা জনে জমাইয়া তুলিতেছিল, তাহারই আঘাতে রুদ্র আজ জাগ্রত হইয়াছেন—দেবতার ও মানবতার অপমান তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। ঐ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের সকলকে বলিতে হইবে—

তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য—এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক!

এই মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে হইবে, এই মিথ্যার বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইবে, এই পাপের পঙ্কে নামিয়া পুণ্যপঙ্কজ উদ্ধার করিতে হইবে। এই যে কত দেশের কত বীরহৃদয় শোণিত দিয়া পাপ অন্যায় ক্ষালন করিতে চাহিতেছে, এই যে কত মাতার ও স্ত্রীর অশ্রু ঝরিতেছে, ইহাতে কি পাপ দূর হইয়া পৃথিবীতে নূতন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না? এই যে এত দুঃখ ও আত্মবলিদান, ইহার জন্য তো বিশ্বেশ্বর বিশ্ববাসীর নিকট ঋণী হইতেছেন, তাঁহাকে তো পুণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। রাত্রি যেমন তপস্যা করিয়া দিবসকে ডাকিয়া আনে, তেমনি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুণ্যকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে। মানুষ যখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, তখন যে তাহার মধ্যে দেবত্বের অমর মহিমা ফুটিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় কবির মনে নাই।

বলাকা—৩৮ নম্বর

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কি বল্‌তে চায় বাণী

কবিতাটি শিলাইদহে লেখা। ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রে 'নূতন বসন' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কবি কাহারও নিকট হইতে একখানি নূতন বসন উপহার পাইয়াছিলেন। সেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া কবির মনে হইল—আমার সর্বদেহে আমার অন্তরে আমার চিন্তায় ভাবনায় আমার প্রেমে নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষার তো অন্ত নাই, সেই নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা যেন আজ নূতন বস্ত্ররূপে আমার সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া

ধরিয়াছে। গান যেমন বাঁধা সুর অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন তানের উচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তেমনি আমার দেহ নূতন কাপড় পাইয়া প্রতিদিনের বাঁধা গণ্ডিকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

যিনি চিরনূতন, তাঁহার কাছে আমার ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইয়া উপস্থিত হইতে ইচ্ছা হয়। তাই আজ এই নূতন বসন পরিধান করিয়া আপনাকে যেন এই প্রথম তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলাম বলিয়া মনে হইতেছে।

আমার হৃদয়ের প্রেমের রঙ অফুরন্ত—তবু তাহার তৃপ্তি নাই, সে আরো আরো আরো চায়। সেই রঙের নেশাতেই তো নানা রঙের বসন পরিয়া যিনি সকল রঙের রঙ্গী তাঁহার সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া তুলিতে চাই।

নীল রঙ অনন্তের অকূলের বর্ণ—তাই আকাশ নীল, সমুদ্র নীল, আমাদের ভগবান্ নীলমণি। আজ আমি সেই নীলবর্ণের বসন পরিধান করিয়া অনন্তের অনন্ততাকে আমার বসনের বর্ণে প্রতিফলিত দেখিতেছি। নদীর এ পার সবুজ, কিন্তু সে পার অজানা অচেনা সেই দূরের পারে নীলের পাড়—

দূরাদ্ অয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ !

আজ এই নীল বসন গায়ে দিয়া আমার দেহে-মনে দূরের ডাক লাগিয়াছে—যাহা আয়ত্ত তাহা ত্যাগ করিয়া অনায়ত্তকে ধরিতে যাত্রা করিতে হইবে, যেমন করিয়া দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া চলে বৃষ্টিভরা ঈশান কোণের নব মেঘ। যে দিক্ হইতে মনোহরণ কালোর বাঁশী বাজিতেছে, সেই দিকে কূল ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

বলাকা—৩৯ নম্বর

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে

মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত এই কবিতাটি। ১৩২২ সালের পৌষ মাসের সবুজপত্রে 'শেক্‌স্‌পীয়র' শিরোনামে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বলাকা—৪০ নম্বর

এইক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে

মানুষের অভিজ্ঞতার ধারা তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতরে ও চেতনার

ভিতরে সঞ্চিত হইয়া থাকে; মানুষ পুরুষানুক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে যে-সব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে, তাহারই পুঞ্জীভূত ফল তাহার বর্তমানের বোধ ও অনুভবটুকু। মানুষ যাহা অনুভব করে, তাহার অন্তরালে তাহার অবচেতনার মধ্যে কত কিছু জমা হইয়া রহিয়া যায় যাহার সম্পূর্ণ সন্ধান জানা যায় না। এই অনুভবের মধ্যে তাহার কত লক্ষ পূর্বপুরুষের এবং কত লক্ষ বৎসরের সঞ্চয় আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

বলাকা—৪১ নম্বর

যে কথা বলিতে চাই

মানুষ সমস্ত জীবন ভরিয়া এবং জন্ম-জন্মান্তরে পুরুষানুক্রমে যাহা অনুভব করে, তাহাই তাহার বর্তমান অনুভবে রূপ পায় এবং সেই বহুযুগসঞ্চিত আনন্দ তাহার মুহূর্তের অনুভূতির মধ্যে জাগিয়া উঠে। তাই সামান্যে তাহার এত আনন্দ, তুচ্ছ বস্তুতে এত সৌন্দর্য সে অনুভব করে। কবি এই আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করিবার সহজ বাণী অন্বেষণ করিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, কেমন করিয়া এই মুহূর্তের মধ্যে অনন্তের আবির্ভাবকে তিনি ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

বলাকা—৪২ নম্বর

তোমারে কি বারবার করেছিনু অপমান?

ভগবান্ মানুষের হৃদয়-দ্বারে বারে বারে নানা ছুতায় আসিয়া উপস্থিত হন—সকল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে চাহেন, সকল প্রেমের মধ্যে তাঁহারই প্রকাশ, প্রশংসা যশ নিন্দা দুঃখ সুখ সকলেরই মধ্য দিয়া তাঁহার আগমন আমাদের হৃদয়-দ্বারে। কিন্তু আমরা এমনি মূঢ় যে সংসারের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়া তাঁহার আগমনকে উপেক্ষা করি। তার পরে যখন সব কর্মাবসানে রজনীর অন্ধকারে একা বসিয়া নিজেকে একাকী বোধ হয়, তখন মনে পড়ে তিনি কত মাধুর্যের মধ্য দিয়া, কত রূপ-রসের মধ্য দিয়া আমাদের কাছে আসিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহার অভ্যর্থনা করি নাই। কিন্তু সেই ফিরিয়া যাওয়া তো নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতা নহে, সেই ফিরাইয়া দেওয়াই আমাদের মনে পড়াইয়া দিবে যে আমাদের কাছে তিনি অভিসারে আসিয়াছিলেন, এবং তিনি ফিরিয়া গেলেও আবার আসেন।

বলাকা—৪৩ নম্বর

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে ?

দুঃখ আসিয়া থাকে আসিয়াছে, তাহাতে ভাবনা কি ? এই জগতের তো সবই নশ্বর ; সুখ যদি ভাঙিয়া গিয়া থাকে, তবে দুঃখই কি চিরস্থায়ী হইবে ? সমস্তই কেবল মরিয়া মরিয়া চলিয়াছে—শৈশব মরিয়া কৈশোর, কৈশোর মরিয়া যৌবন, আবার যৌবন মরিয়া বার্ধক্য আসে,—এই এক দেহেই কতবার মৃত্যু ঘটে। এই জীবনে কত সুখ আসিয়াছে, গিয়াছে ; কত দুঃখ আসিয়াছে, তাহাও গিয়াছে। তবে এই দুঃখই কি বক্ষে চাপিয়া বিরাজ করিবে ? মানুষের সুখ দুঃখ ভয় ভাবনা সমস্ত মিলাইয়া নিরাকারই তো আকার গ্রহণ করিতে করিতে চলিতেছেন। অতএব হে জীবনপথের পথিক, হে অনন্ততীর্থযাত্রী, চলার আনন্দে গান গাহিয়া চলো, পথের ক্লেশ স্বীকার না করিলে পথের প্রান্তে গম্য স্থানে উপনীত হইবে কেমন করিয়া ? এই জীবনের অবসানও নূতন জীবনের দিকে যাত্রা, সেখানেও আবার নূতন সুখ নূতন প্রেম প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব ভয়-ভাবনা কিসের ? আমি কবি হইয়া জন্মিয়াছিলাম। সেই আনন্দ আমার পরজন্মের সমস্ত আনন্দে সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। যে জীবনদেবতা এই জন্মে আনন্দ লাভ করিলেন, তিনিই তো জন্মান্তরের সাথী হইয়া থাকিবেন। সে তো অধর—তাই,

তারে নিয়ে হ'ল না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,
এমনি ক'রে আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল বোনা—

চিরকাল চলিতে থাকিবে।

যৌবন

বলাকা—৪৪ নম্বর

কবিতাটি যৌবনের জয়গান।

যৌবন পথহীন সাগর-পারের পথিক ; তাহার ডানা চঞ্চল, অক্লান্ত। অজানার বুকে তাহাকে পাড়ি জমাইতে হইবে—জানার বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। ঝড়ে যে বজ্র আছে, তাহার মধ্যে যতই দুঃখবেদনা থাকুক না কেন, যৌবন তাহাকে ঝড় হইতে ছিন্ন করিয়া আনিতে পারে।

বিপদের মধ্য হইতে মরণকে মাথায় তুলিয়া লওয়ার মধ্যেই যৌবনের আনন্দ। সে আরাম চায় না, দুঃখবরণেই তাহার আনন্দ, তাহার তৃপ্তি। জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে বলিয়াছেন—জগৎ নিজেকে সমর্পণ করে না, জগৎকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে হয়। রবীন্দ্রনাথও যৌবনকে উদ্দেশ্য করিয়া সেই বাণীই উচ্চারণ করিয়াছেন—বলিয়াছেন, যৌবন সে তো 'ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে।'

যৌবন নিরাপদের চণ্ডীমণ্ডপে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় গতিবিহীন হইয়া বসিয়া থাকিবে কি? সে আয়ুর কাঙাল নয়, সে যে অমৃত-সন্ধানী মরণ-সন্ধানী,—মৃত্যুর অমৃত-মাধুরী সে আহরণ করিবে। মৃত্যু যে অমৃতের পাত্রকে বহন করিতেছে, "মৃত্যুর অন্তরে পশি' " সেই সুধারস সে সঞ্চয় করিয়া আনিবে। অবগুণ্ঠিতা মরণের মুখাবরণকে উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্যই তো তাহার যাত্রা!

যৌবনের অন্তরের আবেগ যদি জীবন্ত হয় তবে সে নিশ্চয়ই শাস্ত্রকারের পোকা-কাটা শুকনা তুলট কাগজের মধ্যে চলার বাণীর অন্বেষণ করিবে না। পুঁথির বাণীতে প্রাণ কই? যৌবনের বাণী তাই পুঁথির পাতায় নাই, আছে দক্ষিণ হাওয়ার বীণায়, আছে প্রলয়-মেঘে ঝড়ের ঝঙ্কারে। যে বাণী শুনিয়া অরণ্যে নবকিশলয়ের উদ্‌গম হয়, সেই বাণী যৌবনের; যে বাণী ঝড়-তুফানে ধ্বনিত হইতেছে, যে বাণী উন্মত্ত ঢেউয়ের 'পরে তাহার বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া চলে যৌবন তাহাকেই তো গ্রহণ করিবে, বরণ করিবে। যৌবনের বাণী মধুর, তার বাণী জীবন্ত।

যৌবন কি একটুখানি প্রাণের গণ্ডির মধ্যে আপনাকে বদ্ধ রাখিতে চায়? না, সে তো অফুরন্ত প্রাণের অধিকারী। সূর্যের আলোক যেমন শাণিত খড়্গের মত কুয়াসাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তেমনি যৌবনের প্রাণশক্তি জরার কুহেলিকাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিক। শুষ্ক পুষ্পাবরণকে বিদীর্ণ করিয়া যেমন সুন্দর সুকুমার জীবন্ত নবমুকুল ফুটিয়া উঠে, তেমনিভাবে জরার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লোক-লোকান্তরের অপার ক্ষেত্রে অনন্ত আলোকে নিত্য নব নব রূপে যৌবনের অমর কুসুম ফুটিয়া উঠুক।

কামনায় ও আসক্তিতে যৌবনের দুর্গতি। যৌবন কি ভোগের সংস্কারের 'আবর্জনার বোঝা-মাথায় আপন গ্লানি-ভারে' কুণ্ঠিত অক্ষম অকর্মণ্য হইয়া থাকিবে? ভোগের পঙ্ককুণ্ডে পচিয়া মরিবার জন্য যৌবনের আবির্ভাব হয় নাই। জরার আবর্জনার ভার বহিবার জন্য যৌবনের আবির্ভাব হয় নাই। প্রতিদিনকার

প্রভাত যে তাঁর আপন হাতে গড়া সোনার মুকুট যৌবনের ললাটে পরাইয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হইবে! যৌবন কি সেই স্বর্ণমুকুট ধারণ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিবে না? জরার আবর্জনার ভার বহিয়া যৌবন নিজেকে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ করিবে না, নিজের মর্যাদা নষ্ট করিবে না। তাহার কবি অগ্নি, দীপক তাহার রাগিণী। সূর্য তাহার মিতা ও প্রতিরূপ। যৌবনকে উহাদেরই মত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে হইবে।

যৌবন সুখের প্রত্যাশী নয়, আনন্দের প্রত্যাশী। তাই নব নব প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি লাভ করা তাহার জীবনের ধর্ম। নব নব বিকাশ আছে বলিয়া জগৎ যেমন চিরমধুর, চিরনূতন—যৌবনও তেমনি।

বিকাশের একটি স্তরের পর আর একটি স্তর অতিক্রম করার মধ্য দিয়াই যে নিত্য নবীন থাকা যায় একথা রবীন্দ্রনাথ অন্য বহুস্থানেই বলিয়াছেন। তুলনীয়—

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কূলকেই সর্বস্ব ক'রে বসে থাকতে পারে না, সে কূল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি,—সমস্তকে অতিক্রম ক'রে, বিপদকে উপেক্ষা ক'রে সে যে চলেছে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে, 'আরোর' দিকে প্রকাশের এই কূল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা,—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে ত' পথের চিহ্ন নেই, কিছু ত' দেখতে পাওয়া যায় না—না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য ত' নয়,—কেন না ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি, সে ত' বুদ্ধিমানের চলা,—তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কূলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। এই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়, কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার একটিমাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে বল্‌ছে, ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজ্‌ছে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে। ঐ দিকে

চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর-মেরুতে দক্ষিণ-মেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারংবার মরতে মরতে সমুদ্রপারের পথ বের করে, বারবার মরতে মরতে আকাশপারে ডানা মেলতে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে সব মহাজাতি কূলত্যাগিনী, তারাই এগোচ্ছে—ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না, তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো ক'রে কূল আঁকড়ে বসে রইলো—তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য-লীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

—জাপান-যাত্রী

ভগবানের বাঁশির ডাক, দুঃসাহসিক অভিসারে নূতনকে আহ্বান আমার বুকের মধ্যে বেজে ওঠে। তখন আমি বুঝতে পারি যে, সতর্ক বিজ্ঞতা বড় সত্য নয়, নবীনের দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বড় সত্য। কেননা এই অনভিজ্ঞতার ঔৎসুক্যের কাছেই সত্য বারে বারে নূতন শক্তিতে, নূতন মূর্তিতে প্রকাশ পায়। এই অভিজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ বলেই পুরাতনের পর্বতপ্রমাণ বাধা ভাঙে এবং অসাধ্যসাধন হতে থাকে।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস বুদ্ধির দুঃসাহস আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়াছে। কিন্তু ভালো-মানুষদের ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে, এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ বাহির করিয়া দেয় ইহারাই।

"Strive and thrive!" Cry, "Speed—fight on, fare ever
Thre as here!"

—*Asolondo,* Robert Browning.

বলাকা—৪৫ নম্বর

এই কবিতাটি প্রথমে ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের সবুজপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় 'নববর্ষের আশীর্বাদ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

কবি পুরাতনকে কখনো আমল দিতে চাহেন নাই। যৌবনে যখন 'কড়ি ও কোমল' রচনা করেন, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন—'হেথা হ'তে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।' সর্প যেমন তাহার জীর্ণ নির্মোক মোচন

করিয়া নব কলেবর ধারণ করে, তেমনি মানুষকে সমস্ত জীর্ণতা পরিহার করিয়া দুঃখের তপস্যা করিয়া অমর হইতে হইবে। কাল যেমন ক্রমাগত বর্তমান হইয়া চলিয়াছে, তেমনি মানবকেও অনন্তযাত্রাপথে চলিতে হইবে—পথের ধূলা গায়ে যদি লাগে, পথের কাঁটা পায়ে যদি বিঁধে, পথের সর্প যদি ফণা তুলিয়া পথরোধ করে, তবু চলিতে হইবে। যে তীর্থযাত্রী তাহার জন্য আরাম নহে, ঘরের মমতায় বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহার তো তীর্থে পৌছানো হইবে না। এই দুঃখ সহ্য করিয়া চলিতে পারার মধ্যেই তীর্থের মাহাত্ম্য, পুণ্যের আগ্রহ প্রকাশ পায়; এই দুঃখই তীর্থরাজের সুফল সম্প্রদান। দুঃখ বিরোধ বিপদ্ মৃত্যুর বোধেই অসীমের আবির্ভাব হয় মানবজীবনে। সেই সমস্তকে স্বীকার করিয়া যাত্রা করিয়া চলিতে হইবে নূতনের অভিসারে। যাহা কিছু কুসংস্কার আছে তাহা ত্যাগ করিয়া, যাহা কিছু আসক্তি আছে তাহা পরিহার করিয়া সেই অচেনা কাণ্ডারীকে অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলে পুরাতনের মোহ দূর হইয়া নূতনের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, যাত্রীর জীবন ধন্য হইবে।

পলাতকা

পলাতকার কতকগুলি কবিতা ১৩২৫ সালের সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে এই বই প্রকাশিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ যখন অসম ছন্দে বলাকার কবিতা রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গে অসম ছন্দে পদ্যে গল্প রচনা করিতেছিলেন এবং ছন্দময় গদ্যেও গল্প রচনা করিতেছিলেন। পদ্যে রচিত গল্পসমষ্টি হইল 'পলাতকা' এবং ছন্দময় গদ্যে রচিত গল্পসমষ্টি হইল 'লিপিকা'। লিপিকা গদ্যে রচিত হইলেও তাহা কবিতা-শ্রেণীতে গণ্য হইবার যোগ্য, তাহার গল্পগুলির মধ্যে আখ্যায়িকা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাব ও রসের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। এই দুই পুস্তকের মধ্যে কবি কত গভীর কথা কত সহজভাবে বলিয়াছেন, তাহা বই দুখানি পাঠ করিলে সহজেই অনুভব করা যায়। পলাতকার প্রত্যেক গাথার মধ্যে কবির তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, সমবেদনা, সামান্যের মধ্যেও অসামান্যতার আবিষ্কার, অত্যুচ্চ কবিত্বের সহিত গ্রথিত হইয়া আশ্চর্য রকমের সহজ ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। কড়ি ও কোমল হইতে ছোট কবিতায় ছোটগল্প বলিবার যে শক্তি কবি দেখাইয়াছিলেন, এবং যাহা কথা ও কাহিনীর মধ্যে পরিণতি লাভ করে—তাহারই পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে এই গল্পগুলিতে। কবিতা ও কাহিনী যে একসঙ্গে গাঁথা যাইতে পারে, তাহার পরিচয় দিলেন কবি এই পুস্তকে।

কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা দেবী এই সময়ে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অবধারিত। সেই বিদায়োন্মুখী কন্যার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কবির মনে হইয়াছিল যে, জগতের সব কিছুই পলাতকা। কাহাকেও এখানে ধরিয়া রাখা যায় না। সেই ভাব মনে লইয়া কবি যতগুলি গল্প লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশের নায়িকাই হইতেছে স্ত্রীলোক। প্রায় সব গল্পগুলির প্রতিপাদ্য হইয়াছে বিচ্ছেদ, বিদায় এবং মৃত্যু।

এই কাহিনীগুলিতে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ যোগ কবি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, এবং বৈষয়িক জগতের অন্তরালে যে এক অনির্বচনীয় ভাব-জগৎ আছে তাহার যবনিকা উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক কাহিনীর উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা ও আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া কবি এমন একটি মায়াকুহক

রচনা করিয়াছেন, যাহাতে সমস্ত কাহিনীটি সত্য হইয়া দরদে ব্যথায় মমতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভগবানের বরে অভিজাতবংশীয় কবিকে কখনো অভাবে দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতে হয় নাই, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হাস্তেই চিরকাল তাকাইয়া আসিয়াছেন। তথাপি কবি তাঁহার অসাধারণ সহমর্মিতার বশে হতভাগ্যদের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করিয়াছেন।

কিন্তু কবি তো জানেন যে 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?' এবং 'শেষের মধ্যেই অশেষ আছে।' আমরা যাহাকে শেষ বলি, যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহা তো অসমাপ্ত অবস্থানের একদেশের অসম্যক্‌ দর্শন। তাই তিনি শেষ কবিতায় সমস্ত কিছুকে 'শেষ প্রতিষ্ঠা' দিয়াছেন—মানুষের কাছে যাহা আসা-যাওয়া তাহা আধখানা অবস্থা প্রকাশ করে। সম্পূর্ণতার মধ্যে তো কেহ আসে না, যায়ও না। সব-কিছুই সেখানে 'আছে' হইয়া আছে। তাই কবি বলিয়াছেন—

> আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
> যে সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হ'য়ে রয়েছে সমান।

প্রথম কবিতাটির নাম পলাতকা। প্রকৃতির ডাকে পোষা হরিণ নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও অযত্নসুলভ খাদ্য-পানীয় ছাড়িয়া অনিশ্চিতের ও নিরুদ্দেশের সন্ধানে প্রতিপালকের বাড়ি ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেল। এই কাহিনীটির মধ্যে সমস্ত বইটির তত্ত্ব নিহিত আছে—হরিণ যেন বলিয়া গেল—

> বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।

মুক্তি

এই গল্প-কবিতাটি প্রথমে ১৩২৫ সালের সবুজপত্রের বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রমণীদিগকে সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া কেবলমাত্র গৃহকর্মের ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করার প্রতিবাদ এই কবিতাটি।

অন্তঃপুরিকা মরণাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া বলিতেছে—এই বিশ্বজগৎ তাহার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করিয়া বাইশ বছর ধরিয়া এই নিরানন্দ গৃহ-কোণের নাগপাশ ছেদন করিতে বারংবার ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছে; কিন্তু অন্তঃপুরের অন্ধকার কারাগারে ও রান্নাঘরের ধূমাচ্ছন্ন বন্দিশালায় সেই বাণী

পৌঁছিতে পারে নাই। আজ আসন্ন মৃত্যুকে শিয়রে করিয়া জানালার ফাঁকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মুখোমুখী করিয়া বসিয়া আছি। তাই আজ তাহার বাণী আমার প্রাণে প্রবেশ ক'রবার অবকাশ পাইয়াছে, আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি যে আমি সামান্যা নই,—আমি নারী, আমি মহীয়সী, আমি ভূমার অংশ এবং অল্পে সুখ নাই। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যসম্ভার, সে তো আমারই জন্য এত কাল অপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আমি যদি তাহার দিকে না চাহিতাম, তাহা হইলে সে তো থাকিয়াও নাই, আমার কাছে তো সে নাস্তি হইয়া যাইত।

মরণ আমার অনন্ত সম্ভাবনার ভিখারী—সে আমার সমস্তই গ্রহণ করিবে, আমার সকল সম্ভাবনা তাহার কাছে সমাদৃত হইবে। অবশেষে মরণের মধ্যে আমি যে স্বাধীনতার ও মুক্তির স্বাদ পাইব তাহা তো জীবনে আমি কোনো দিন পাই নাই। মরণ তো কেবল আমার প্রভু নয়, সে আমার স্বামীও ছিল; সে যে আমার কাছে আমার মাধুর্য আমার স্বামীর মতন হুকুম করিয়া আদায় করে না; সে ভিক্ষা করে, প্রার্থনা করে।

ফাঁকি

শ্বশুরবাড়ীতে গুরুজনের কাছে লজ্জায় বিনুর সঙ্গে তাহার স্বামীর মিলন ছিল বাধাগ্রস্ত, ছাড়াছ'ড়া। সে যখন রোগে পড়িয়া হাওয়া-বদলের জন্য প্রথম শ্বশুরবাড়ী ছাড়িল, তখন সকল বাধা অপসৃত হওয়াতে তাহাদের মিলন হইল অব্যাহত। সেই আনন্দে তাহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত হইয়া উঠিল পরিপূর্ণ—বিনুর মনে হইতে লাগিল, তাহাদের বিবাহের পরে এই যেন তাহাদের প্রথম মিলনের আনন্দযাত্রা—হানিমূন। সে মরিবার সময়ে স্বামীকে বলিয়া গেল—

এ জীবনের যা কিছু আর ভুলি,
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্য-সিঁদুর সম।
এ দুটি মাস সুধায় দিলে ভ'রে—
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ ক'রে।

কিন্তু বিনুর স্বামী তো বিনুকে এক জায়গায় ফাঁকি দিয়াছিল। বিনু রেলের কুলির বৌ রুক্মিণীকে পঁচিশ টাকা দিতে অনুরোধ করিয়াছিল। সে অনুরোধ তো রক্ষা করা হয় নাই! অথচ বিনু জানিয়া গেল যে, তাহার স্বামী তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য কোনো ত্রুটি কোথাও রাখে নাই। সেইজন্য বিনুর স্বামীর মনে

হইতে লাগিল যে, সে তাহার স্ত্রীর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও প্রেমের প্রতিদান সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। রুক্মিণীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিনুর স্বামী তাহার অপরাধের স্খালন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেই রুক্মিণীকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। প্রতিবিধান করিবার সুযোগ চিরতরেই হারাইয়া গেল। তাই বিনুর স্বামী আক্ষেপ করিয়া বলিল—

রয়ে গেলেম দায়ী,
মিথ্যা আমার হলো চিরস্থায়ী।

নিষ্কৃতি

এই কবিতা-কাহিনীটি ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। তখন ইহার যে নাম ছিল তাহাতে এই কবিতার ভাবটি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার নাম ছিল—'যেনাস্যাঃ পিতরো যাতাঃ।' এই মেয়েটির পিতৃপিতামহ যে পথে গিয়াছেন—বিপত্নীক হইয়া আবার বিবাহ করিতে তাহারা যেমন দ্বিধা করে নাই—সেও তেমনি তাহার পিতৃপিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল—বিধবা হইয়া বৈধব্যের তপস্যায় সেই কেবল শুষ্ক হইয়া সমস্ত প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে, আর পুরুষেরা যথেচ্ছাচার করিবে, এই বি-সম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, সেও তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুলিন ডাক্তারকে বিবাহ করিয়াছিল। এই কবিতাটির মধ্যে করুণ ও হাস্যরস গলাগলি করিয়া চলিয়াছে বলিয়া এটি পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

মালা

মালা কবিতায় কবিচিত্তের একটি দ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বন্দ্বটি বাণীর প্রসাদলাভ ও জনসমাজে কবিখ্যাতিলাভ—এই উভয়বিধ প্রতিকূল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। কবিহৃদয়ের নিভৃতে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান্, সে আকাঙ্ক্ষা বাণীর প্রসাদলাভ,—বাণীর সেবা করিয়া অন্তরাত্মার তৃপ্তি। কিন্তু এই নিভৃত আত্মতৃপ্তির প্রতিকূল আর একটি ভাবও কবির মনে বর্তমান, তাহা হইতেছে জনসমাজে কবিখ্যাতিলাভের বাসনা। বাণীবন্দনার পুরস্কার দ্বিবিধ—প্রথমতঃ কবির বিজন মনে বাণীর প্রসন্নতা লাভ করিয়া আত্ম-তৃপ্তি, দ্বিতীয়তঃ জনসমাজে কবি-যশ লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন। প্রথমটি আছে

গোপনে, রাণীর—মূর্তিমতী বাণীর কোলে পদ্মপাতার ডালায় বরণমালারূপে দ্বিতীয়টি রাণীর হাতে প্রকাশ্যে সোনার থালায় মণিময় বিজয়মালারূপে।

কবিমনে এই দুটি বিরুদ্ধ বস্তুর প্রতিই লোভ ছিল।

খ্যাতিলিপ্সু কবির দৃষ্টি রাণীর হাতের সোনার থালার মণির মালার প্রতি: তাঁহার আকাঙ্ক্ষা—

শূন্য করে থালা নেব বিজয়মালা!

কিন্তু কবির গভীর নিভৃত মনের কথা হইতেছে—

চাইনে বিজয়মালা!

* * * *

ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
তখন রাণীর আসন পড়ে বকুল বীথিকাতে
আমি একা বীণা বাজাই রাতে।

বিজন রাতে বাণীবন্দনার বীণা বাজানোতেই কবির আসল পুরস্কার।

কিন্তু খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা যখন এই আত্মতৃপ্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন সুরু হয় কবির আত্মদাহ, তখন গভীর বেদনায় তিনি বলেন—

এ কি দহনজ্বালা, আমার বিজয়মালা!

তখন তাঁহার মনে হয়—

বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে
ঘূর্ণী ধূলার মত।
মানুষ শত শত
ঘিরল আমায় দলে দলে—
কেউবা কৌতূহলে,
কেউবা স্তুতিচ্ছলে,
কেউবা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়!
হায় রে হায়
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়!

যখন যশস্বী কবির চতুর্দিকে 'ঘূর্ণী ধূলার মত মানুষ শত শত' স্তুতিনিন্দায় ব্যাপৃত হয়, তখন কিন্তু কবিচিত্তের প্রসন্নতা আবিল হইয়া যায়। কবির তখন মনে হয় 'বিজয়মালা' পাইয়া আত্মতৃপ্তি কোথায়?—

জীবন আমার জুড়ায় না যে;
বক্ষে বাজে

তোমার মালার ভার,—
এই যে পুরস্কার ?

কবির ভুল ভাঙিয়া যায়—তিনি উপলব্ধি করেন,

এ ত কেবল বাইরে আমার
গলায় মাথায় পরি,
কি দিয়ে যে হৃদয় ভরি
সেই তো খুঁজে মরি !

বিজয়মালা তিনি পান, কিন্তু অন্তরকে ভরিয়া তোলার সম্পদ্ লাভ তাঁহার হয় না বলিয়া কবির আর অতৃপ্তি ও অনুতাপের অন্ত থাকে না।

পদগৌরব অথবা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের যে দুরন্ত উদ্যম একদিন তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছিল তাহার চরিতার্থতা হয়—কবি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, জগৎ-কবি-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন তিনি লাভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাতে কবিমনে আক্ষেপ অনুশোচনাই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। পার্থিব খ্যাতিলাভের বাসনা ত্যাগ করিয়া কবি তখন খ্যাতিহীন নির্জনে আনন্দের নীড় রচনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। মূর্তিমতী বাণীর সভায় বিজয়মালা ছাড়া 'আর কোনো এক মালা' আছে কি না তাহা সন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। যে মালা তাঁহার চিত্তদাহ সৃষ্টি করিয়াছে, অন্য আর এক মালার আবিষ্কার করিয়া সেই জ্বালাটুকু কবি ভুলিতে চাহেন।

এমনি এক মালার সন্ধানও কবি পাইয়া যান। সে মালা 'বরণমালা'—বাণীর অনুগ্রহ, কবির কাব্যলক্ষ্মী, সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রসাদ ! উহাই কবির অন্তরকে তৃপ্তিতে ভরিয়া তোলে।

পলাতকা কাব্যের এই মালা কবিতায় কবিমনের যে অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সোনার তরী ও চিত্রার যুগেও কবির মধ্যে জাগিয়াছিল। চিত্রার যুগে তিনি 'আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর'—ইহার অধিক কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। 'সোনার তরী'র পুরস্কার কবিতায়ও দেখি যে, কবি রাজ-ভাণ্ডারের সমস্ত ধনসম্পদ্ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন—

কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে, ওই ফুলমালাখানি।

কবিপত্নীকেও রাজসভাপ্রত্যাগত কবি জানাইয়াছেন—

দেখো কী এনেছি বালা !
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,

আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।

এই মালাই 'বরণমালা', 'বিজয়মালা' নয়। রত্নময় 'বিজয়মালা' অপেক্ষা ফুলের 'বরণমালাই' কবির নিকট অধিকতর মূল্যবান্ ও তৃপ্তিদায়ক বলিয়া মনে হইয়াছে। কারণ বিজয়মালায় পার্থিব আকাঙ্ক্ষা মিটে বটে, কিন্তু হৃদয় প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে সমর্থ 'বিজয়মালা' নয়—বাণীর অনুগ্রহকণা। আত্মতৃপ্তিই কবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

কবি নিজে এ সম্বন্ধে এক জায়গায় বলিয়াছেন—

সকলের চেয়ে চরম সমাদর যা, তা বাইরে নেই, তা অন্তরে। যখন বাইরের খ্যাতির ঘটা ঘুচে যায়, একমাত্র তখনই তোমার আদর অন্তরে পেয়ে থাকি। সেটাই সমাদরের শেষ, তাতেই মুক্তি হয়। যা অপরের অপেক্ষা রাখে, তা আমার পক্ষে বন্ধন। লোকের কথার উপর, স্তুতিবাদের তারতম্যের উপর তার নিয়ত পরিবর্তন হয়। কিন্তু তোমার আলো যখন অন্তরে আসে, তখন আপন যথার্থ স্বরূপকে জানি ও তোমার চরম সমাদরে আমার বন্ধন মোচন হয়।

হারিয়ে যাওয়া

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সত্য হইতেছে নিত্য পদার্থ। তাহাকে বৈদিক ঋষিরা বলিয়াছেন ওঙ্কার। বিশ্বপ্রকৃতি সেই সত্যকে আগলাইয়া চলিয়াছেন, যেন তাহা কিছুতে আচ্ছন্ন না হয়। সেই সত্য যখন আচ্ছন্ন হয় তখন বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্বই লোপ পাইতে বসে। সত্য অব্যাহত না থাকিলে লোকের জীবনযাত্রা অচল হয়, সমাজ-ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়, সকলের পীড়া উপস্থিত হয়। তাই উপনিষদের ঋষিরা এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

—ঈশোপনিষৎ ১৫

মানুষও নিজের খেয়ালটিকে প্রদীপের মতো জ্বালাইয়া সমস্ত ঝড়-ঝাপ্‌টা হইতে বাঁচাইয়া চলিতে চায়; কিন্তু সেই খেয়াল সম্পন্ন করিতে না পারিলে, সে মনে করে তাহার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি যশোলিপ্সু সে যদি যশের একটু হানি দেখে, তবে সে মনে করে সর্বনাশ। তেমনি ধনলিপ্সু, রাজ্যলিপ্সু, এমন কি নিজের প্রিয়জনের প্রতি অধিক মমতাসম্পন্ন লোক, নিজের আসক্তির

বস্তুর একটু ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না ; মনে করে সে ক্ষতিতে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে। সে মনে রাখে না যে তাহার সেই ক্ষতিগ্রস্ত বস্তু ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবি স্বয়ং আমাকে যে ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা এই—

বামী যেমন দীপ-হাতে একটা অন্ধকার ঘুর্ণীসিঁড়ি বেয়ে চল্‌ছে, সমস্ত নক্ষত্রলোককে আমি সেই দীপ-হাতে ছোট মেয়েটির মতোই দেখ্‌ছি। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ যদি তার আলো নিবে যায়—তা হ'লে সে আপনাকে আর দেখ্‌তে পাবে না—অসীম অন্ধকারের মধ্যে একটা কান্না উঠ্‌বে—আমি হারিয়ে গিয়েছি।

অর্থাৎ, কবি বলিতে চাহিতেছেন যে, যে-আলোক বামীর কাছে তাহার পরিবেষ্টন সামগ্রীকে প্রকাশ করিতেছিল, তাহার নির্বাণ হওয়াতে সেই-সমস্ত পারিপার্শ্বিক সামগ্রী অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গেল, এবং যে পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা বামী আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল, সেই পারিপার্শ্বিকতার লোপ হওয়াতে বামীর মনে হইল সে নাই। তেমনি বিশ্বপ্রকৃতি মেয়েটিও অন্ধকার রাত্রির নীলাম্বরীর আঁচলের আড়ালে গ্রহনক্ষত্রের দীপশিখাগুলিকে আগ্‌লাইয়া বাঁচাইয়া চলিতেছে, গ্রহনক্ষত্রগুলিই যেন বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্ব সুপ্রকাশ করিতেছে, যদি কোনো দিন কোনো দুর্বিপাকে সেই আলোক নির্বাণ পায়, তবে প্রকৃতিই হারাইয়া যাইবে।

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখনই কোনো বিক্ষোভ, কোনো দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তখনই শিশুর সরল সব-ভোলা স্বভাবের মধ্যে নিজেকে প্রত্যাবর্তন করাইয়া সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছেন—মনের সমস্ত গ্লানি ভুলিতে চাহিয়াছেন। শিশু যেমন স্বভাব-নির্মল, তাহার গায়ের ধূলা-বালি যেমন তাহার মনে কোনো মালিন্য সঞ্চার করিতে পারে না, তাহার মনের সকল ক্ষোভ দুঃখ শিশু যেমন অনায়াসে অতি সত্বর ভুলিয়া সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে, সে যেমন হাঁসের মতন জলে থাকিয়াও গায়ে জলের লেশ লাগিতে দেয় না, কবিও তেমনি সমস্ত বিক্ষোভের দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও দুঃখাতীত ক্ষোভাতীত নির্মুক্ত অনাবিল হইয়া যাইতে চাহেন। এইজন্য কবি আযৌবন বারংবার এই শিশুলীলার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া শিশু হইয়া নির্মল আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। এই ভাব হইতেই কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার মহিলা কাব্যে মাতাকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় শিশু হইবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—

তুমি গড়েছিলে যাহা
আর আমি নই তাহা,
হে জননী করো পুন বালক আমায়।

এই শিশু ভোলানাথ বইখানি রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে স্বয়ং কবি বলিয়াছেন—

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখ্‌তে বসেছিলুম।...... প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আট্‌কা প'ড়ে সেদিন আমি......আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশু-লীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাট্‌লুম, মনটাকে স্নিগ্ধ কর্‌বার জন্যে, নির্মল কর্‌বার জন্যে, মুক্ত কর্‌বার জন্যে। —পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী

ভোলানাথ সেই যে কিছু সঞ্চয় করে না, যাহার কিছুতে মমতা নাই, যে সব-কিছু ধ্বংস করে, যে সব-কিছু ভুলিয়া যায়।

আমাদের দেশে বিশ্বেশ্বরকে বলা হইয়াছে—ভোলানাথ, ভোলা মহেশ্বর। শিব ভোলানাথ, তাঁহার খেলনা চন্দ্র সূর্য জীবন মরণ কীর্তি। শিশুর খেলনার মতন তাঁহার নিত্য নূতন উদ্‌ভাবন ও নিত্য নূতন ধ্বংস।

সৃষ্টি যদি ধ্বংস হইতে ধ্বংসান্তরে না যায়, তবে তো বস্তুর মুক্তি হয় না, সৃষ্টির গতি থাকে না, নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয় না। নূতন সৃষ্টি না হইলে খেলার ধারা রক্ষা হয় না। খেলনার শৃঙ্খল ভাঙিয়াই ভোলানাথের খেলা চলিয়াছে। বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ, কারণ তিনি কিছুই চিরন্তন করিয়া রাখেন না।

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি ভাঙিতে ভাঙিতে চলেন নূতন সৃষ্টি করিয়া; তাই তাঁহার সৃষ্টি বন্ধন হয় না। কিন্তু বয়স্ক মানুষ নিজেদের সৃষ্টিকে সঞ্চয় করে, তাই তাহাদের সৃষ্টি বন্ধন হইয়া উঠে।

শিশু ভোলানাথ—ভোলানাথ শিবেরই চেলা। সে বাহিরে বিত্তহীন, কিন্তু অন্তরে সে অমিতবিত্ত; চিত্ত তাহার বিত্তশালী, অন্তরে তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য। তাই সে এক খেলার অভাব নূতন খেলা দিয়া পূরণ করিয়া লইতে পারে। শিশুর কোনো লক্ষ্য নাই উদ্দেশ্য নাই বলিয়া সে পথ চলাতেই আনন্দ পায়; সে বলিতে পারে 'আমার পথ চলাতেই আনন্দ।' শিশু বর্তমানে আবদ্ধ; তাহার অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই। শিশুর নূতন সৃষ্টিতে আনন্দ; কারণ তাহার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিছাড়া উদ্দেশ্য নাই। অন্য লোকে পথকে লক্ষ্যের উপলক্ষ্য মনে করিয়া দুঃখ পায়। পরমেশ্বর যেমন সৃষ্টির লীলায় শূন্য আকাশকে পূর্ণ করেন, শিশুও তেমনি পথকে মুক্তির আনন্দে পূর্ণ করে। অহেতুক লীলায় শিশু ভোলানাথের সঙ্গে ভোলা মহেশ্বরের যোগ আছে।

সৃষ্টির মূলে এই লীলা—নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি, তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার জবাবদিহি নেই।

ছোট ছেলে ধূলোমাটি কাঠিকুটো নিয়ে সারাবেলা ব'সে ব'সে একটা কিছু গড়্‌ছে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে, গড়্‌বার শক্তি তার জীবন-যাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈফিয়ৎ স্বীকার ক'রে নিলুম; তবুও কথাটার মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াকার কথা হচ্ছে এই যে, তার সৃষ্টিকর্তা মন বলে 'হোক'। সেই বাণীকে বহন ক'রে ধূলোমাটি কুটোকাঠি সকলেই ব'লে ওঠে—'এই দেখ হয়েছে'। এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কল্পনায়। সাম্‌নে যখন তার একটা ঢিবি, তখন কল্পনা চল্‌ছে—'এই তো আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেল্লা!' তার ঐ ধূলোর স্তূপের ইসারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কেল্লার সত্তা মনে স্পষ্ট অনুভব কর্‌ছে। এই অনুভূতিতেই তার আনন্দ। গড়্‌বার শক্তিকে প্রকাশ কর্‌ছি ব'লে আনন্দ নয়, কেননা সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না; একটি রূপবিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি ব'লে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ লক্ষ্য ক'রে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা, তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী

আমাদের শাস্ত্রেও বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টিকে শিশুর খেলার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

বালকে যেমন খেলার ছলে ভাঙে-গড়ে, কোনো উদ্দেশ্য তাহার খেলার পিছনে থাকে না, সেইরূপ সেই বিশ্বকর্মাও এই বিশ্বটাকে লইয়া ভাঙিতেছেন ও গড়িতেছেন, নিজের কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য লইয়া কিছু করিতেছেন না। কারণ, তিনি তো নিত্যপূর্ণ আপ্তকাম। — বিষ্ণুপুরাণ ১।২।১৮

ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাস্ তস্য নিশাময়—গরুড়পুরাণ ১।৪।৫

কবি তাঁহার পূরবী কাব্যেও বিশ্বনাথকে শিশুর সহিত তুলনা করিয়াছেন—

এ কি সেই নিত্য শিশু, কিছু নাহি চাহে,—
নিজের খেলেনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে? —পূরবী, পদধ্বনি

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে যে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসি তাই চ'লে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যক নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভ'রে,
শিশু বোঝে মোরে। —পূরবী, পথ

রবীন্দ্রনাথ শিশুকে ভালোবাসিয়াছেন। সেই ভালোবাসার ফল হইতেছে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের সঙ্গে খেলা করিবার জন্য নানা নাটক গান প্রভৃতি রচনা। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে তাঁহার অতি নিকট প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—যেমন করিয়া দেখিয়াছিলেন ভিক্টর হ্যুগো। শিশুকে শিশুর নিজের দৃষ্টিতে কবি দেখিয়াছেন, কবি যেন স্বয়ং শিশু হইয়া গিয়াছেন; আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টেনিসনের ন্যায় দার্শনিক কবির দৃষ্টিতেও শিশুকে দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুর ও শৈশবের অনুরাগী কবি।

শিশু ভোলানাথ কাব্যখানি 'শিশু' কাব্যখানিরই জের বা তাহার পরিপূরক। শিশুর মন বুঝিতে হইলে ও তাহার মন পাইতে হইলে, শিশু না হইলে চলে না। কবির অন্তরে যে চির-শিশু রহিয়াছে তাহারই প্রাণের কথা কৌতুকে রঙ্গে রসে মাধুর্যে অপূর্ব সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এই দুইখানি পুস্তকের বাণীতে। যে বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি শিশুর মধ্যে আছে অস্ফুট ভাবে, তাহাকেই কবি বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এই দুই বইয়ের ভিতরে। শিশুর মনস্তত্ত্ব সুখ দুঃখ এমন প্রাণ দিয়া অনুভব ও প্রকাশ করিতে পৃথিবীর আর কোনো কবি পারেন নাই

মুক্তধারা

এই নাটকখানি ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এবং পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয় ঐ মাসেই। বইখানি লেখার তারিখ হইতেছে ১৩২৮ সালের পৌষ-সংক্রান্তি। লেখা হইয়াছিল শান্তিনিকেতনে।

এই বইখানির বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল ঐ ১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে, সমালোচনা লিখিয়াছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

উত্তরকূটের মহারাজা যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়া শিবতরাই রাজ্যের মুক্তধারা যন্ত্র দ্বারা রুদ্ধ করিয়াছেন। শিবতরাইয়ের প্রজাদের অন্নচলাচলের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশ মানাইবার এই কৌশল। যুবরাজ অভিজিৎ ঠিক রাজার পুত্র নন। রাজা মুক্তধারার ঝরণাতলায় তাঁহাকে কুড়াইয়া পুত্রবৎ পালন করিয়াছেন। তাঁহার শরীরে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে জ্যোতিষীরা বলিয়াছে। যুবরাজ অভিজিৎকে রাজা শিবতরাই শাসন করিবার ভার দিয়া পাঠাইলেন। অভিজিৎ সেখানে গিয়াই প্রজাদের সমস্ত অসুবিধা মোচন করিবার প্রযত্নে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি নন্দীসঙ্কটের গড় ভাঙিয়া দিলেন। উত্তর-কূটের স্বার্থে আঘাত লাগিল, উত্তরকূটের অধিবাসীরা বিরক্ত হইয়া উঠিল। কাজেই অভিজিৎকে শিবতরাই ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু যুবরাজ অভিজিৎ গৌরীশিখরের দিকে চাহিয়া প্রায়ই ভাবিতেন—'যে-সব পথ এখনো কাটা হয়নি, ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবী কালের পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।' তিনি প্রায়ই বলেন—'আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাট্‌বার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।' কারণ, তিনি জানিয়াছিলেন যে কোন্‌ ঘরছাড়া মা তাঁহাকে পথের ধারে মুক্তধারার পাশে জন্ম দিয়া তাঁহাকে বিশ্ববাসী করিয়া দিয়াছেন, তিনি কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ জাতির লোক নহেন।

অভিজিৎ দেখিলেন যে যন্ত্ররাজ বিভূতি বাঁধ বাঁধিয়া মুক্তধারা বন্ধ করিয়াছেন, শিবতরাইয়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ইহাতে উত্তরকূটের অধিবাসীদের আনন্দের উৎসব হইতেছে। কিন্তু এই বাঁধ বাঁধিবার জন্য কত মজুরকে জোর করিয়া ধরিয়া কাজে লাগানো হইয়াছিল। তাহাদের অনেকে ফিরে নাই। এই

উৎসবের মধ্যে সেই-সব সন্তানহারা মায়ের কান্না শোনা যাইতেছে। অম্বা কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—সুমন, আমার সুমন……। পাগলা বটুক সকলকে সাবধান করিয়া হাঁকিতেছে—সাবধান বাবা, সাবধান, যেও না ও পথে……বলি দেবে, নরবলি……।

অভিজিৎ মনে করিতে লাগিলেন—রাজ্যলোভে স্বার্থলোলুপতায় মানুষ মানুষকে দলন করিয়া দানব হইয়া উঠে; 'হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝ্‌তে পার্‌লুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ।' তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন সেই-সব বাধা দূর করিয়া দিবার জন্য।

যুবরাজ রাজাজ্ঞায় বন্দী হইলেন। বন্দিশালায় আগুন লাগিল। খুড়া-মহারাজ যুবরাজকে উদ্ধার করিয়া নিজের রাজ্যে মোহনগড়ে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু যুবরাজ সেই স্নেহের বন্ধনও অস্বীকার করিলেন।

যুবরাজ কারাগারে নাই শুনিয়া উত্তরকূটবাসীরা উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। হঠাৎ অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে তাহারা শুনিল দূরে মুক্তধারায় বাঁধ ভাঙার শব্দ। রুদ্ধ জলোচ্ছ্বাস গর্জন করিয়া ছুটিয়াছে।

কুমার সঞ্জয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে যুবরাজ অভিজিৎ মুক্তধারাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যন্ত্ররাজ-বিভূতির যন্ত্রকে তিনি আঘাত করিয়া ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়া যন্ত্রও তাঁহাকে প্রত্যাঘাত করিয়াছে। যুবরাজ স্রোতে পড়িয়া গিয়াছেন এবং মুক্তধারা যুবরাজের আহত দেহকে কোলে তুলিয়া লইয়া দূরে দূরান্তরে কোথায় লইয়া গিয়াছে।

এই অভিজিৎ হইতেছেন সকল স্বার্থমুক্ত সঙ্কীর্ণতামুক্ত মানবাত্মার প্রতিনিধি—যে মানবাত্মা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দূরের আহ্বানে চলিতে চায়। যেখানে স্বকৃত বা পরকৃত বন্ধন, তাহাকেই আঘাত করিয়া মুক্ত করাই হইতেছে তাহার জীবনের সাধনা ও সার্থকতা। লোভের দ্বারা কল্যাণ যখন বন্ধন লাভ করে, তখনই পাপ প্রবল হইয়া উঠে; এবং সেই পাপক্ষালন করিতে মহাপ্রাণকে বলি দিতে হয়। যেখানে পাপ সেখানে অশান্তি; সেখানে অবিশ্বাস, সেখানে উৎপীড়ন। একের পাপে অপরে পীড়া ভোগ করে; রাজার স্বার্থের জন্য অম্বার ছেলে সুমন মরে; বটুক দুটি নাতি হারাইয়া পাগল হইয়া পথে পথে রুদ্রকে জাগাইয়া ফিরে এবং পিতার লোভের শাস্তি গ্রহণ করেন পুত্র অভিজিৎ। যিনি সকল কিছুকে জয় করিয়া মুক্ত তিনিই অভিজিৎ। জগতে তো এইরূপই যুগে যুগে হইয়াছে—জগতের দুঃখ পাপ একজন মহাপ্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তোলে—

ইহারই জন্য বুদ্ধদেব রাজপুত্র হইয়া সন্ন্যাসী, যীশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইলেন, মহম্মদ মরুভূমিতে পলাতক হইলেন। যে রুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে, সে হইয়াছে অভি—ভৈরব তাহাকে পথ দেখাইয়া আত্মদানের দিকে লইয়া চলেন।

মুক্তধারার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবাল্যের বাণী নিহিত আছে—সকল বাধা ও গণ্ডি ভাঙিয়া মুক্তধারায় নিজেকে ভাসাইয়া দিতে হইবে, তবেই মনুষ্যত্বের সম্মান সংরক্ষিত হইবে।

এই নাটকের খুড়ামহারাজের মধ্যে বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের অথবা 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'পরিত্রাণ' নাটকের রাজা বসন্তরায়ের একটু আদল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারও মধ্যে সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছেন—যিনি সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে রাজাকেও ভয় করেন না, এবং অম্লান বদনে সমস্ত শাস্তি অন্যায় হইলেও অপ্রতিবাদে বহন করেন। ইনি ন্যায় ও সত্যের এবং সহ্যশক্তি ও ক্ষমার আধার।

মুক্তধারা নাটকে এই রকম মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ছাড়া কবিত্ব আছে প্রচুর—অভিজিতের কথায়, ধনঞ্জয়ের গানে, ভৈরবপন্থীদের গানে। এই নাটকে পরাধীন জাতির উপর বিজেতাদের যে নির্দয় ব্যবহারের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহা সত্ত্বেও যখন স্কুলের গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদের বিজেতার জয়গান মুখস্থ করাইতেছে দেখি, তখন সমস্ত বিজিত জাতির দুর্গতির লজ্জা ও মনস্তাপ যেন ভাষা পাইয়াছে মনে হয়, এবং এই-সমস্তের প্রতিবাদ হইতেছে যুবরাজ অভিজিৎ। অভিজিৎ যেন একটি মানুষ নহেন, তিনি যেন মূর্তিমান্ মহামনের মনস্তত্ত্ব।

দ্রষ্টব্য—মুক্তধারা—অবনীনাথ রায়, বিচিত্রা ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ।

প্রবাহিণী

প্রবাহিণী পুস্তকে প্রায় সমস্তই গান। নানা সময়ের খণ্ড রচনা একত্র করিয়া বই প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালে। রবীন্দ্রনাথ গানের রাজা, তিনি প্রায় আড়াই হাজার গান রচনা করিয়াছেন। সেই-সমস্ত গানের পরিচয় দেওয়া দুরূহ কর্ম। অতএব এই বইয়ের মাধুর্যের সন্ধানের ভার পাঠকদের উপর দিয়াই আমি নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলাম। প্রবাহিণী বিচিত্র রসের ও ভাবের লিরিক ও গানের প্রবাহিণী।

চিরন্তন

এই গানটি 'চির-আমি' শিরোনামে ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অমর কবি বলিতেছেন যে যখন তিনি এই রবীন্দ্রনাথ নামক বিশেষ ব্যক্তি-রূপে এ জগতে বিদ্যমান থাকিবেন না, তখনও তিনি এখানে সকল শোভা মাধুর্য প্রেম ও লীলার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবেন ভাব-রূপে। যখন বিশ্ববাসী তাঁহার নাম ভুলিয়া যাইবে, যখন তাঁহার তানপুরার উপর অবহেলার ও বিস্মৃতির ধূলা জমিবে, কেহ আর তাঁহার কাব্য আলোচনা করিবে না, ফুলের বাগান কাঁটায় ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, তখনও তিনি যাহা আজ দিয়া গেলেন তাহার প্রভাব সকলের অজ্ঞাতসারে কাজ করিতে থাকিবে। তিনি বিশ্ববাসীকে যে ভাব-সম্পদ্ দিয়া যাইতেছেন, যে ভাষা ও ছন্দ দিতেছেন, যে প্রকাশ-ভঙ্গিমা শিখাইয়া যাইতেছেন, তাহা তো তাহাদের কাছে থাকিয়াই গেল। যদিও বা তাহারা স্বয়ং কবিকে ভুলে তথাপি তাঁহার দানের ফল তো তাহারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের অজ্ঞাতসারেও ভোগ করিতে থাকিবে। অতএব কবি চিরকাল থাকিবেন, তিনি চিরন্তন, তিনি অমর।

পূরবী

১৯২২ বা ১৩২৮ সালে শিশু ভোলানাথ প্রকাশ করার পরে কবি ১৩৩০ সাল পর্যন্ত অনেক দিন কোনো কবিতা লিখেন নাই; কেবল গান বা নাটক লিখিতেছিলেন। আমরা মনে করিতেছিলাম কবির কবিত্বের উৎস বুঝি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে রসের অলকনন্দা-ধারা বুঝি আর বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিতে প্রবাহিত হইবে না।

১৩৩০ সালের মাঘ মাসের শেষের দিকে এক দিন কবির এক চিঠি পাইলাম—"চারু, খাতায় কতকগুলো কবিতা জমেছে। লুঠেরারা নজর দিতে আরম্ভ করেছে। লুঠ হ'য়ে যাবার আগে তুমি যদি একদিন আস তা হ'লে তোমাকে শোনাতে পারি।"

আমি উৎফুল্ল হইয়া কবি-সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম। প্রাতঃকাল। কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ীর তিন-তলায় কবি ছিলেন। আমার সেখানেই ডাক পড়িল। কবি একখানি খাতা হইতে কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যখন শুনিলাম—

'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি!'
'মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এলো তাহা
বুঝিতে পারো তুমি?'
'দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হলো যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী!'

তখন আমার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আমি কবিকে বলিলাম—এই সব কবিতা যেন আপনার যৌবনের কবিতার মতন হয়েছে। সেই সোনার তরী, চিত্রার যুগের কবিতার কথা মনে পড়ছে।

ইহাতে কবি সন্তুষ্ট হইয়া হাসিয়া রঙ্গভরা স্বরে বলিলেন—তবে যে বড় তোমরা বলো যে আমি আর কবিতা লিখতে পারিনে।

ইহার পরে কবি আমাকে বলিলেন—নাও, বেছে নাও, এর মধ্যে তুমি কোন্‌টা নেবে? বেশি লোভ কর্‌লে চল্‌বে না, অনেক দাবী মেটাতে হবে আমাকে। তুমি একটা বেছে নাও—একটা।

আমি উপরের তিনটি কবিতাই পছন্দ করিলাম সব চেয়ে। তখন কবি আবার হাসিয়া বলিলেন—এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

আমি তখন বলিলাম—ইহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া লওয়া কঠিন। তবে প্রথম দুটির মধ্যে যেটি হয় আপনি দেন—ওদের মধ্যে তারতম্য করা আমার পক্ষে কঠিন।

তখন কবি বলিলেন—তুমি অত্যন্ত চালাক। তবে তুমি দুটোই নাও। অন্যের ভাগে না হয় কিছু কম পড়্‌বে।

আমি সেই কবিতা দুটি লইয়া আসিলাম। তখন প্রবাসীর ফাল্গুন মাসের সংখ্যা ছাপা হইয়া গিয়াছে, কাগজ বাহির হইবে। আমি ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীর ক্রোড়পত্র করিয়া আলাদা ছাপিয়া প্রথম উল্লিখিত কবিতাটি প্রকাশ করিলাম। পরের মাসে চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'মাঘের বুকে সকৌতুকে' কবিতাটি প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ইহার পরে কবি চীন জাপান দক্ষিণ-আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে যান। কবিতাগুলি কোনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই তাহাদের টানে অনেক অন্য কবিতাও লেখা হইতে লাগিল। পরিশেষে দেশে ফিরিয়া ১৩৩২ সালের শ্রাবণ মাসে পুস্তক প্রকাশ করিলেন।

কবি মনে করিয়াছিলেন বঙ্গভারতীকে এই তাঁহার শেষ অর্ঘ্য নিবেদন—তাঁহার জীবনের বিদায়ের পূর্বক্ষণে পূরবীর তান। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কবিতাতে এই বিদায়-রাগিণী বাজিয়াছে—পূরবী, যাত্রা, পদধ্বনি, শেষ, অবসান, মৃত্যুর আহ্বান, সমাপন, শেষ বসন্ত, বৈতরণী, কঙ্কাল, ইত্যাদি। এই বইয়ের একটি বিভাগের নাম 'পূরবী' অন্য একটির নাম 'পথিক'।

কবি এই কাব্যে জীবনসন্ধ্যায় সারা জীবনের লাভ-লোক্‌সান স্মরণ করিয়া দেখিয়াছেন। সেই স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়া উঠিয়াছে কবির কৈশোর এবং যৌবন। পঁচিশে বৈশাখ, তপোভঙ্গ, আগমনী, লীলাসঙ্গিনী, কৃতজ্ঞ, ভাবী কাল, কিশোর প্রেম, প্রভাতী, তৃতীয়া, বিরহিণী, বদল প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবির কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ চিরযুবা। তিনি পূরবীর করুণ সুর ধরিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে, তাঁর মন তো আনন্দ-নিকেতন—তাই সেই পূরবীর সুরের সঙ্গে বিভাসের মিশ্রণ ঘটিয়া গিয়াছে। কবি ফাল্গুনী নাটকে বলিয়াছিলেন—"মোদের পাকবে না চুল গো!" তাহার আগে ক্ষণিকাতে যদিও তিনি বলিয়াছিলেন—

পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী যে!—

তথাপি তাঁহার মনের বয়সটা একটু বেশি যৌবন-ঘেঁষা। তাই যৌবনের বিজয়-ঘোষণা কবির বৃদ্ধবয়সের রচনাতেও আমরা দেখিতে পাই—বলাকা কাব্যে তিনি যৌবন ও নবীনকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু এই পূরবীতে কবি যেন যৌবনের সীমা পার হইয়া আসিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া গত যৌবনের স্তুতিবাদ করিতেছেন। তাই ইহার কবিতায় যৌবনোল্লাসের মধ্যে একটু করুণ সুর মিশিয়া রহিয়াছে। কবি জীবন-সায়াহ্নে পূরবীর সুর ধরিয়া যখন বলিলেন—

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ। —লীলা-সঙ্গিনী

এবং তিনি ক্রমে যখন বৈতরণী-তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন সেই বৈতরণী-নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গের চাঞ্চল্য নিজের চিত্তে অনুভব করিয়া তাঁহার জীবন দেবতাকে বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথী?
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙীন শিখার বাতি? —খেলা

কবি তখন মনে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন—

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি। —তপোভঙ্গ

কবি চিরকালই অনাসক্ত অনন্তপথযাত্রী পথিক। তিনি আকৈশোর যে-সব রচনা করিয়াছেন তাহাতে কেবল এই কথাই বলিয়াছেন যে সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে। এই জীবন-সায়াহ্নে যখন কবি জীবন-সীমার একেবারে প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন মনে করিতেছেন, তখন তাঁহার মনে সমস্ত ছাড়িয়া অনন্তের মনে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার প্রতীক্ষাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে,—তখন কবি অনুভব করিতেছেন—

পারের ঘাটা পাঠালো তরী ছায়ার পাল তুলে
আজি আমার প্রাণের উপকূলে। -অবসান

তাঁহার সৃষ্টিকর্তা তাঁহাকে—

ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়-তিমিরে। —সৃষ্টিকর্তা

সর্বহারার উপকূলে আসিয়া কবির মন বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে রঙীন হইয়া

উঠিয়াছে। কিন্তু কবি তো আগেই জোর করিয়া বলিয়া আসিয়াছেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। —মুক্তি

কবি এক দিকে অনাসক্ত সন্ন্যাসী, আবার অন্য দিকে সর্বানুভূতির আনন্দ-পিয়াসী —তাই তিনি তাঁহার জীবনদেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন যে—

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।

একদিকে তিনি সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সকল গণ্ডি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন; আবার অন্যদিকে জীবনের সকল অনুভবের আনন্দ সম্ভোগ করিতেও তাঁহার কম আগ্রহ নহে—রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত জীবনের বিচিত্র রস ও আনন্দের আস্বাদনে সর্বদাই উন্মুখ। কবির কাছে এই জীবন মিথ্যা নহে, আবার এই জীবনই সর্বস্ব নহে। তিনি মানুষের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া প্রেম সম্ভোগ করিতে চাহেন। বিশ্বপ্রকৃতির শোভার মধ্যে ডুবিয়া তাহার সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে চাহেন। পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের এক অপূর্ব সম্পদ। তাই কবি জীবনের প্রান্তে উপনীত হইয়া আবার নিজের জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন। স্থান ও কালের বাধা অতিক্রম করিয়া, কবিচিত্ত নিজের কৈশোর-স্মৃতির মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অতীতের সৌন্দর্যে ও রসে ভরা দিনগুলিকে ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা যখনই মনের মধ্যে জাগিয়াছে, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের সম্ভাবনাও কবিকে উন্মনা করিয়াছে। সেইজন্য পূরবীর কবিতাগুলির মধ্যে শরতের মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মত হাসি ও অশ্রু একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

তাই কবি বলিয়াছেন—

এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

—পূরবী, পূরবী

অশ্রু-হাসির যুগল ধারা
ছুটে আমার ডাইনে বামে।
অচল গানের সাগর-মাঝে
চপল গানের যাত্রা থামে।

—পূরবী, প্রবাহিণী

যে জীবনদেবতা কবির আশৈশবের দোসর হইয়া নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া কবিকে এই বৃদ্ধ বয়সে আনিয়া উপনীত করিয়াছেন, তিনি কবিকে তাঁহার শৈশবের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে ডাক দিলেন।

কবির "লীলাসঙ্গিনী" আজ তাঁহার দ্বারে "শেষ পূজারিণী"-রূপে আবির্ভূতা হইয়া কবির মনোহরণ করিতেছেন—কবিকে আবার তিনি যৌবনে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

কবির এই দ্বিতীয় যৌবন প্রথম যৌবন অপেক্ষা মহত্তর ও মহিমময়; তাঁহার এই দ্বিজত্ব শরতের পরিণতি এবং বসন্তের প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য দ্বারা মণ্ডিত।

গ্যেটে যেমন শকুন্তলা নাটককে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

তেমনি আমরাও কবির এই পূরবী কাব্যে বসন্তের মুকুল, গ্রীষ্মের ফল, ও মানস-রসায়ন সৌন্দর্যসম্ভার একত্র দেখিতে পাই। পূরবীর মধ্যে চিরতরুণ চিত্তের তারুণ্য ও রসানুভূতি এবং ভাবুক বৃদ্ধ দার্শনিকের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাসম্ভূত প্রজ্ঞা একত্র সম্মিলিত হইয়াছে; এই-সব কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞা ভাব-চাঞ্চল্যকে নিয়মিত করিয়াছে। অনুভূতি ও প্রজ্ঞার মিলনে যে-সব কবিতার জন্ম হয়, সেই-সব কবিতাই কালের ভাণ্ডারে স্থায়ী হয়। কবি বার্ন্‌স্ কর্তৃক লিখিত Auld Lang Syne, Highland Mary প্রভৃতি কবিতাগুলি অনুভূতির দিক্ হইতে সুন্দর হইলেও, শেলী বা ব্রাউনিং প্রভৃতির কবিতার ন্যায় গভীর চিন্তাঘন নয় বলিয়া অক্ষয় নয়। অনুভূতি ও প্রজ্ঞার মিলনে যে-সব কবিতার জন্ম হয়, সেগুলিকে বুঝিতে হইলে অনুভূতি ও প্রজ্ঞা দিয়াই বুঝিতে হয়। এই সম্পদ্ খুব বেশী লোকের থাকে না। কাজেই এইরকম কবিতার বই দুই-দশ-জন রসিক ভাবুক প্রাজ্ঞ ছাড়া সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিতে পারে না—সাধারণের কাছে এই রকম কবিতা কঠিন দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়; তাহাতে রসের অল্পতা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে। গভীর বিষয় বুঝিতে হইলে সময় ও সাধনার আবশ্যক করে।

কবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বকে অজিতকুমার চক্রবর্তী এক কথায় বলিয়াছেন—'সর্বানুভূতি'। কাজী আব্‌দুল ওদুদ বলিয়াছেন দুই কথায়—'অতি-তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সন্ধানপরতা'। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—তাঁহার গানের মাত্র একটি পালা, সেটি হইতেছে—সীমার মধ্যে অসীমের, অংশের মধ্যে সম্পূর্ণের অনুসন্ধান ও অনুভব। ইহা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আর-একটি বিশেষত্ব আমি নির্দেশ করিতে চাই, তাহা তাঁহার মনের এক দুর্নিবার গতিবেগ—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনো খানে!' এই চলার বেগে কবি যেন মহোরগের ন্যায়

জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে খোলস বদল করিয়া চলিয়াছেন; বিচিত্র ধরণের বা স্টাইলের কবিতা তিনি পরে পরে লিখিয়া আসিয়াছেন। একখানি বইয়ের বন্ধনে কতকগুলি কবিতা আবদ্ধ হইলেই, কবির নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা সেই গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া, সেই মাড়ানো পথ ছাড়িয়া আবার নূতন পথে নূতন রূপের সন্ধানে বহির্গত হইয়াছে। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবন বিশ্বমানবের কাছে সংস্কার-মুক্তির এক অমূল্য উপহার। এইজন্য তিনি নৈবেদ্য হইতে প্রবাহিণী পর্যন্ত প্রবাহিত অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সেই একের আরাধনার একতারা বাজাইতে বাজাইতে কবিচিত্ত থাকিয়া থাকিয়া বিচিত্রতার সন্ধানে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে; সে একতারা ফেলিয়া নানান্‌-তারা বীণা-যন্ত্র তুলিয়া লইয়াছে। কারণ, কবি অনুভব করিয়াছেন—যিনি এক, তিনিই আবার রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব—যিনি অরূপ, তিনিই বহুরূপ ও অপরূপ।

কবির এই যে চলা তাহা সবকিছুকে ডিঙাইয়া উড়িয়া চলা নহে,—ইহা পা দিয়া পথ মাড়াইয়া মাড়াইয়া মাটিকে স্পর্শ করিয়া অনুভব করিয়া চলা—কিন্তু ছুটিয়া চলা। 'যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা', তেমনি কবি তাঁহার জীবনপথের প্রত্যেক বস্তুকে একবার অবলম্বন করিয়া পরক্ষণেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। কবির এই চলা যেন রস-সমুদ্রে সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া সাঁতার কাটিয়া চলা। যাহার কিছু নাই সে ত্যাগ করিবে কি?—"শূন্য ঘড়া উপুড় করাকে তো ত্যাগ বলে না। ঝরণার স্বরূপটাই হচ্ছে নিয়ত ত্যাগ, সেটা সম্ভব হয়েছে নিয়ত গ্রহণে।" তাই কবি বলিয়াছেন—

আমি যে সব নিতে চাই রে,
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে!

এই পুস্তকের কবিতাগুলি যেমন পূরবী ও বিভাস রাগিণীর মিশ্রণে এবং গভীর ভাব ও লীলার মিশ্রণে অপূর্ব সুন্দর হইয়াছে, তেমনি ইহার কবিতার ভাবানুযায়ী নব নব ছন্দ এবং কুশলী কবির শব্দযোজনার নিপুণতায় ইহা অপূর্ব সৃষ্টি হইয়াছে।

তপোভঙ্গ

(কবিতাটি চিরযুবা কবির সদানন্দ প্রাণশক্তির উচ্ছল প্রকাশ। মহাকাল সন্ন্যাসী, সর্বরিক্ত ভোলানাথ। কিন্তু সেই কালের অধীশ্বর তো সকল কালের সংবাদ জানেন, তিনি কি কবির যৌবন-কালের খবরটি ভুলিয়া বসিয়া আছেন?

বসন্তের অবসানে কিংশুক-মঞ্জরী ঝরিয়া গিয়াছে, তাহারই সঙ্গে 'শূন্যের অকূলে তা'রা অযত্নে গেল কি সব ভাসি ?' হাওয়ার খেলায় মেঘের মতন সেই যৌবন-স্মৃতি কি—'গেল বিস্মৃতির ঘাটে ?' ভোলানাথ কি ভুলিয়াছেন যে একদিন কবির সেই যৌবন-দিনগুলি তাঁহার রুদ্র-রূপকে কী শোভায় সৌন্দর্যে সাজাইয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ভরিয়া দিয়াছিল ? সেদিন তো সন্ন্যাসীর সব তপস্যা ভুলাইয়া দিয়া কবি তাঁহাকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং সেই ক্ষেপার আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে কবি কত ছন্দ কত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—সর্বহারাকে তিনি নিত্য-নূতনের লীলায় মগ্ন করিয়া মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেদিনকার আনন্দ-রসের পানপাত্র কি মহাকালের তাণ্ডবে আজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেছে ?

কবি অনুভব করিতেছেন যে, সেই সুধাপাত্র নিঃস্ব হইয়া রিক্ত হইয়া যায় নাই, তাহা সন্ন্যাসীর জটার অন্তরালে গোপন করা আছে মাত্র। কালের রাখাল মহাকাল তাঁহার শিঙা বাজাইয়া সমস্ত আনন্দকে তাঁহার মধ্যে সংহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, আবার অবকাশ পাইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন বলিয়াই।

> বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
> বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন,
> তারি সম্ভাষণ।

কবি তো সন্ন্যাসীর তপস্যাকে অধিক দিন সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার কাজই যে রিক্তকে সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়া তোলা, বিনাশের মধ্যে সৃষ্টির আবাহন করা, দুঃখিতকে সুখে আনন্দে বিহ্বল করিয়া তোলা। তাই কবি বলিতেছেন—

> তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
> স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
> তব তপোবনে।
> দুর্জয়ের জয়মালা
> পূর্ণ করে মোর ডালা,
> উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
> ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
> কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
> মোর গান হানি'।

সামঞ্জস্য হয় ; এবং চলা স্থগিত হইলেই সেই সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়, তখন বস্তু ভার হইয়া উঠে। যখন কোনো ভারী বাঁকে করিয়া ভার বহন করে, তখন যতক্ষণ সে চলে ততক্ষণ তাহার চলার দোলা লাগিয়া তালে তালে তাহার কাঁধের বাঁকও দুলিতে দুলিতে চলিতে থাকে, তাই তাহার কাঁধের ভার বহন করা সাধ্য হয় ; কিন্তু যখন সে চলা থামাইয়া স্থির হয়, তখন তাহার কাঁধের ভার দুর্বহ বোঝা হইয়া তাহাকে পীড়া দেয়।

গতিপ্রবাহ কোনো রকমে প্রতিহত হইলেই তৎক্ষণাৎ বস্তুস্তূপ জড়ো হইয়া উঠে। বের্গ্‌সঁও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। স্থিতিতে বস্তুর স্তূপ জমা হইয়া উঠিলে তাহার রূপের বৈচিত্র্য ফুটিবার অবকাশ লুপ্ত হইয়া যায়। বস্তুর আত্মদানে, তাহার নিজেকে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দেওয়াতে জন্মাইতেছে প্রাণ, আর তাহার সঞ্চয়ে জাগিতেছে মৃত্যু। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে বস্তু হইতেছে তাপ চাপ পরমাণু-সংস্থান প্রভৃতির বিচিত্র রূপান্তর মাত্র—অণু-পরমাণু গতিরই সমষ্টি মাত্র—ইলেক্‌ট্রন প্রোটন ধারণাতীত গতিশীল। তাই একটি বস্তু তাপ ও পরমাণু-সংস্থানের তারতম্যে বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে—একই বস্তু হাইড্রোজেন-অক্‌সিজেনের সমবায়ে উৎপন্ন যে জল, সেটি কখনো তরল হইয়া নদীতে প্রবাহিত হইতেছে, কখনো বাষ্পীভূত মেঘ হইয়া আকাশে উড়িতেছে, কখনো প্রতপ্ত তাপ হইয়া এঞ্জিনে গতি সঞ্চার করিতেছে, আবার কখনো বা জমাট কঠিন হইয়া তুষারপর্বতে পরিণত হইতেছে এবং আপনার আকার-সংঘাতে টাইটানিক জাহাজ চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। নদীর জলে যখন ডুব দেওয়া যায়, তখন মাথার উপর দিয়া কত জলরাশি প্রবাহিত হইয়া যায়। তাহার ভার বোধ করা যায় না, কারণ সেই অগাধ জলরাশি সচল বহমান। কিন্তু এক কলসী জল তুলিয়া মাথায় চাপাইলে তাহা দুর্বহ বোধ হয়, কারণ সেটা স্থির। বস্তু যখন চলে তখন তাহার ভার ভার থাকে না, বস্তু-প্রবাহ থামিলেই তাহা ভার হইয়া পড়ে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বস্তু কেবল গতির বাধা মাত্র—বেগ যখন কোনো অবস্থায় স্থিরতা লাভ করে তখন সেই বাধার ফলে বস্তুতে পরিণত হয়। গতিবেগ বাধা পাইলে চলন্ত ট্রেনের কলিশনের মতন উচ্ছ্রিত হইয়া উঁচু দেয়াল হইয়া উঠে।

কবি চঞ্চলা কাল-নদীকে অথবা ভব-নদীকে দুই রূপে দেখিয়াছেন—ভৈরবী বৈরাগিণী রূপে, এবং চঞ্চলা নটী অপ্সরী রূপে।

বৈরাগিণী কোথাও সংসক্ত হইয়া না থাকিয়া ক্রমাগত যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়া চলিয়াছে তাহাতেই জগৎ-সঙ্গীতের অনাহত সুর উৎপন্ন হইতেছে।

দূর অসীমের প্রেম সর্বনাশা, সমস্ত সঞ্চয় ও বর্তমানতাকে বিনাশ করিতে করিতে তাহার যাত্রা। সেই অভিসারিকার চলার দোলা লাগিয়া দোলার বেগে তাহার বক্ষের হার ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে নক্ষত্রের মণি উৎপন্ন হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এই চলার বেগে তাহার কানে বিদ্যুতের দুল দুলিতে থাকে—যেমন ভাগবতে অভিসারিকা গোপিকাদের কানের দুল দুলিয়া দুলিয়া আগে বাড়িয়া বাড়িয়া কোন্ দিকে কৃষ্ণ আছেন তাহা নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল, তেমনি এই অভিসারিকার সমস্ত কিছু চলার বেগে তাহাকে অসীমের দিক নির্দেশ করিয়া দিতেছে। সেই অভিসারিকার অঞ্চল হইতেছে তৃণ-পল্লব ফুল-ফল—তাহাও চলার বেগে দুলিতেছে চলিতেছে। বিশ্বের মধ্যে এবং মানুষের জীবনে সমাজে ইতিহাসের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে চলার যে লীলা হইতেছে, তাহার অপরূপতা প্রত্যক্ষ করিয়া কবি যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছেন—তাঁহার কবিতার ছন্দে সেই নৃত্যের দোলা লাগিয়াছে।

মহাকাল নিত্যগতিশীল, তাই যে-মুহূর্তকে বলি—'তুমি আছ', অমনি সেটা 'নাই' হইয়া যায়। এই জন্য বের্গ্‌সঁ বলিয়াছেন যে বর্তমান বলিয়া কিছু নাই, যে মুহূর্তে যাহাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তাহা অতীত হইয়া যায়—অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ—আর তাহাদের মধ্যে হাইফেন্ হইয়া আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান। যাহা থাকিয়াও নাই, যাহা এক মুহূর্তে থাকিয়া সেই মুহূর্তেই নাই হইয়া যায়, তাহা রিক্ত; তাহাতে কোনো আবর্জনা কলুষ লাগিতে পারে না, তাই তাহা পবিত্র। ক্রমাগত এই থাকা ও না-থাকার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কালের যাত্রা—তাহারই চরণস্পর্শে ধূলি তাহার মলিনতা ভোলে, এবং মৃত্যু প্রাণে পর্যবসিত হইয়া চলে। এই মহাকাল যদি স্থগিত হইয়া যায়, তবে সমস্ত বিশ্ব জড় হইয়া যাইবে, আকারহীন chaos হইয়া পড়িবে। যাহা অপরিবর্তিত তাহা জড় জীবনহীন। নটীর নৃত্যের ছন্দে মৃত্যু জীবন হইয়া উঠিতেছে, সৃজন-প্রলয়ের চিহ্নশূন্য নির্মল আকাশে নিখিল বিশ্ব বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

যে চঞ্চলা গ্রহ-নক্ষত্রে সর্বত্র নৃত্য করিতেছে, সে-ই প্রাণীর জীবনের মাঝেও নৃত্য করিতেছে—প্রাণ অর্থ ই হইতেছে—'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ

চলা।' সমুদ্রের তরঙ্গে যে চলা, যে দোলা, তাহাও সেই ভৈরবিণী বৈরাগিণী নটীরই চলা। সেই চলার বেগে প্রাণ যেন ঝরনা-ধারার মতো যুগে যুগে রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চলিয়া আসিতেছে—জন্মজন্মান্তরের রূপ ঘুচাইয়া ঘুচাইয়া এবং ইহজন্মের ও আবাল্যের রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রাণের যাত্রা।

কবি সেই কালস্রোতে ভাসিয়া এই জন্মে মহাকবি হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রাণ-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এ জীবন-কূলের সমস্ত সঞ্চয় ধন মান যশ ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইয়া চলিতে হইবে ; নদীর কূল যেমন নদীর ধারাকে প্রবাহিত করিবার জন্যই আবশ্যক, তাহাকে বদ্ধ করিবার জন্য নয় ; তেমনি মানবের জীবনের সমস্ত উপার্জন তাহাকে অগ্রসর করিয়া অসীমের অনন্তের পানে লইয়া যাইবার কাজে যদি না লাগে তবে তাহা বন্ধন হইয়া উঠিবে। কবি ক্রমাগত অতল আঁধারের ভিতর দিয়া অকূল আলোকে যাত্রা করিতে বলিতেছেন। জীবনের ধর্মই হইতেছে অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে ও প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে যাতায়াত।

তুলনীয়—

And see the spangly gloom froth up and boil.
—Keats, *The Pot of Basil,* xli.

Yet all experience is an arch wherethro'
Gleams that untravell'd world, whose margin fades
For ever and for ever when I move.
—Tennyson, *Ulysses.*

দ্রষ্টব্য—বার্গসোঁ—বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ, উত্তরা ১৩৪০ অগ্রহায়ণ।

বলাকা—১০ নম্বর

হে প্রিয় আজি এ প্রাতে

১৩২১ সালের মাঘ মাসের সবুজপত্রের ৬৬২ পৃষ্ঠায় 'উপহার' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

মানুষ সচেতন ভাবে পুণ্যলোভে ভগবান্‌কে যাহা সম্প্রদান করে তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের সমগ্র চরিত্র ও জীবন যদি পুণ্যময় হইয়া উঠে, যদি তাহার জীবনযাত্রাই ভগবানের নির্দেশানুরূপ হয়, তবে তাহার জীবনের প্রত্যেক কর্মে প্রত্যেক চিন্তায় প্রত্যেক ইচ্ছায় ভগবানের আনন্দ ও তৃপ্তি হইবার

কথা। পুণ্যলোভে যদি দান করি, অথচ আমার স্বভাব যদি দয়ালু না হয়; পুণ্যলোভে যদি পূজা করি, অথচ আমার মনে যদি পূজার ভাব স্থায়ী হইয়া না থাকে; তবে সেই-সব অনুষ্ঠান পণ্ডশ্রম মাত্র। আর যদি মহানির্বাণ-তন্ত্রের আদর্শ—যৎ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ, যদি গীতার অনুশাসন—

যৎ করোষি যদ্ অশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদ্ অর্পণম্॥

জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভগবান্ স্বয়ং প্রসাদ বিতরণ করেন আনন্দে আমার জীবনের সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করিয়া।

রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের বিষয় নয়, ইহা বাহিরের কাহারও নির্দেশের মুখাপেক্ষী নয়—গুরু মোল্লা বেদ কোরান যে-রকম বলিবে কেবল সেইটুকু পালন করাতেই ধর্ম পর্যবসিত নয়। ইহা যদি প্রতি মুহূর্তে মানবের জীবনে প্রকাশ পায়, যদি ইহা জীবনেরই অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া উঠে তবেই তাহা প্রকৃত ধর্মপদবাচ্য ও পরমেশ্বরের প্রীতিতে গ্রহণীয় হয়। এ সম্বন্ধে কবি বহু পূর্বেই লিখিয়াছেন—

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হ'য়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত ক'রে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ীর শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হ'য়ে মরতে পারি। যা মুখে বলছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি, তা যে আমাদের পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট সাজিয়ে গ'ড়ে তুলছে।

—ছিন্নপত্র (কুষ্টিয়া, ৫ই অক্টোবর ১৮৯৫)

বিচার

বলাকা—১১ নম্বর

এই কবিতাটি প্রথমে ১৩২১ সালের সবুজপত্রের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

১ম স্ট্যাঞ্জা

রিপু উদ্দাম হইয়া উঠিলে পূর্ণকে আচ্ছন্ন ও ম্লান করে। পূর্ণের সৌন্দর্য উপলব্ধি না করিয়া যাহারা তাঁহাকে খণ্ডিত করিয়া প্রচ্ছন্ন করে, তাহারা তাঁহাকে

অপমান করে। কবি এই অপমানের বিচার প্রার্থনা করিতেছেন সেই পূর্ণাৎ পূর্ণের কাছে।

কিন্তু বিচার তো প্রার্থনা করিবার আগেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিচার তো নিরন্তর চলিতেছে। কলুষিতকে ক্রমাগত বিচার করিতেছে যাহা পবিত্র, যাহা সুন্দর। যে নিজেই অসুন্দর সে কখনো কলুষিতের বিচার করিতে পারে না। কলুষিতের বিচার চলে তাহার বিপরীত সুন্দরের দ্বারা—মাতালকে বিচার করিতেছে শান্ত সপ্তর্ষি নিরবচ্ছিন্ন ও অকুণ্ঠিত শুচিতার এবং সৌন্দর্যের আদর্শ মানদণ্ডে—সৌন্দর্য নিজেই কদর্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও বিচার। নৈতিক ধিক্কারই নীতিভ্রংশের চরম বিচার। যখন বিধাতা অনাচারী পাপীদেরও জন্য তাঁহার বিচারশালায় সুরভি পুষ্প পবিত্র সমীরণ ও বিহঙ্গকূজন আয়োজন করিয়া রাখেন, তখন সেই পাপীরা এই করুণার প্রভাবে সেই সুন্দরকে আর অস্বীকার করিতে পারে না।

২য় স্ট্যাঞ্জা

যেখানে ন্যায্য অধিকার, সত্য স্বত্ব নাই—সেখানে নিজের লোভকে প্রবল করিয়া তোলা চুরি—সেই চুরি যেখানেই করা হোক, তাহা সুন্দরের ভাণ্ডারেই করা হইয়া থাকে; এবং সেই অনাচারের ফলে যিনি প্রেমে সব দিতে প্রস্তুত তাঁহাকে অপমান করা হয়; তখন প্রেমই আহত হয়, কারণ প্রেমের প্রতি অত্যাচার প্রেমেরই ব্যভিচার। কবি অপমানের শাস্তি প্রার্থনা করিতেছেন প্রেমিকের কাছে।

কিন্তু তাঁহার শাস্তি তো না চাহিতেই চলিতেছে—অনাচারীর পাপের জন্য যখন তাহার জননীর অশ্রু ঝরে, সতী স্ত্রী স্বামীর অনাচারের লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনিদ্র হইয়া সমস্ত রাত্রি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহার সৎপথে প্রত্যাবর্তনের জন্য, পাপীর অনাচারে যখন তাহার বন্ধুর হৃদয়ে ব্যথা লাগে, তখনই তো তাহার শাস্তি ও বিচার চলিতে থাকে।

৩য় স্ট্যাঞ্জা

যে যেখানেই চুরি করুক না কেন, পরস্বাপহরণ মাত্রই পরমেশ্বরের ভাণ্ডারে চুরি; কারণ,—

ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

এই অপরাধের গুরুত্ব এত অধিক যে কবি তাহার জন্য কোনো শাস্তি বা বিচার প্রার্থনা করিতে সাহস করিলেন না, তিনি সেই দুর্বৃত্তের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করিলেন—তাহার এই অপরাধ রুদ্র দয়া করিয়া মুছিয়া ফেলুন, রুদ্রের দণ্ড ভোগ করিতে হইলে সে তো একেবারে পিষ্ট বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু রুদ্রের কাছে তো প্রশ্রয় নাই, যেখানে সংশোধনের কোনো পথ না থাকে সেখানে তিনি ধ্বংস করিয়া তাহার সংশোধন করেন। সুন্দর যেমন অসুন্দরের বিচারক, এবং প্রেম যেমন অপ্রেমের বিচারক, তেমনি চোরকে বিচার করে তাহার পুঞ্জীভূত পাপ। নৈতিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে রুদ্র জাগ্রত হইয়া ন্যায়দণ্ড ধারণ করেন। মানুষ অপরের সহিত সম্পর্কে সত্য ও ন্যায়পরায়ণ হইয়া থাকিবে ইহাই হইল বিধাতার বিধান। সেই বিধান না মানিয়া যে সেই সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া জগতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, রুদ্র তাহার বিচার করেন—এ বিচার লোকনিন্দায়, নৈতিক ধিক্‌কারে, তাহার অধঃপতনে। রুদ্র সমস্ত আবর্জনা মার্জনা করেন, অপসারিত করেন। তিনি কোনো মলিনতাকে উপেক্ষা করেন না, ক্ষমা করেন না। মার্জনা অর্থই ধ্বংস। পুরাতন অপসারিত না হইলে নূতনের সৃজন হয় না এবং নূতনের সৃজনেই রুদ্রের মার্জনা প্রকাশ পায়।

নির্দয় গতির মধ্যে কবি যেমন আনন্দ দর্শন করেন, নির্মম রুদ্রের ভিতরও তেমনি তিনি মার্জনা করুণা লক্ষ্য করেন।

তুলনীয়—

Throw away thy rod,
Throw away thy warth;
O my God,
Take the gentle path!
Then let wrath remove;
Love will do the deed;
For with love
Stony hearts will bleed.

—Herbert, (17th cent.), *Discipline.*

প্রতীক্ষা

বলাকা—১২ নম্বর

ভগবানের কাছে অজস্র দান পাই আমরা। তাঁহার দয়ার দান আমরা আমাদের বন্ধনে পরিণত করি নিজেদের আসক্তির দ্বারা; তাঁহার দানের

অনেক অমর্যাদাও করি আমরা। কিন্তু যখন মানুষ ভগবানের দানের সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সেই অজস্র বিপুল ঋণের বোঝা তাহার কাছে দুর্বহ হইয়া উঠে। ভগবানের কাছে অযাচিত দান এত পাওয়া যায় যে সেই প্রশ্রয়ে আমাদের চাওয়াও ক্রমাগত বাড়িয়া চলে, চাওয়ার ও ভিক্ষুকপনার আর অন্ত থাকে না। এই ভিক্ষুক-জীবনে ক্লান্ত হইয়া কবি নিজেকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিতে চাহিতেছেন—আমি তোমাকে এইবার দিব এবং আমার সর্বস্ব দিয়া তোমার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও যদি পারি শোধ করিব। আকাশ যেমন সমস্ত কিছুকে ধারণ করিয়া থাকিয়াও নির্লিপ্ত নির্মল শূন্য রিক্ত, তেমনি আমি তোমার হাতে নিজেকে দিয়া তোমার অজস্র দান পাইয়াও ভারমুক্ত হইয়া থাকিব—যাহা আমি তোমার হাত হইতে বরমাল্যরূপে পাইয়াছি, তাহাই তোমাকে ফিরাইয়া দিয়া তোমাকে জীবনে বরণ করিয়া লইব, আমাদের মালা-বদল হইয়া যাইবে।

বলাকা—১৩ নম্বর

পউষের পাতা ঝরা তপোবনে

পৌষ মাস যেন তপস্বী—সে সর্বরিক্ত হইয়া পূর্ণতার সাধনা করে। সেই পৌষ মাসের তপোবনে হঠাৎ বসন্তকালের মাতাল বাতাস কেমন করিয়া প্রবেশ করিল—শীতের দিনে বসন্তের হাওয়া বহিয়া গেল। ইহাতে কবির মনে হইল যেন বার্ধক্যের দিনে মনের মধ্যে যৌবনের স্মৃতির উদয় হইয়াছে। শীতের অন্তরে যেমন অমর হইয়া বসন্ত লুকাইয়া থাকে, তেমনি বার্ধক্যের জরার অন্তরালে যৌবন-স্মৃতি অমর হইয়া থাকে এবং তাহা এক একটা সামান্য উপলক্ষ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। এই বার্ধক্যের যে জীর্ণতা তাহারও পরপারে আবার এক নবযৌবন অপেক্ষা করিয়া আছে, জন্ম-জন্মান্তরের যৌবনের মালা আমারই গলায় দুলিয়াছে ও দুলিবে।

তুলনীয়—

যৌবন বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি। —পূরবী

বলাকা—১৪ নম্বর

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে

মাধবী লতায় ফুল ফুটিয়াছে। তাহা দেখিয়া কবি ভাবিতেছেন—

"এই আনন্দ-ছবি যুগযুগান্তর প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তা বিকশিত হ'ল। যে সত্য অপ্রকাশিত ছিল, আজ তা রূপ ধরে ফুটে উঠেছে। বহিঃপ্রকৃতিতে এই মাধবীর বিকাশ যেমন সত্য, তেমনি আজ আমার মনে যে আনন্দ জাগ্রত হ'ল, সেও তেমনি সত্য। একটি আমার বাহিরে এবং অন্যটি আমার অন্তরে। তাই বলে তারা পরস্পরের তুলনায় কেউ বা বেশি কেউ বা কম সত্য নয়।

"মানুষের যে আনন্দধারা আমি কবিতায় প্রকাশ করলাম, তা তো একান্ত ভাবেই আমার কল্পনা থেকে উদ্ভূত নয়। রূপদক্ষ শিল্পী কাব্যে ও চিত্রে যে সৌন্দর্যকে রূপদান করে, যে আনন্দকে ফুটিয়ে তোলে, তা তো সেই রসমাধুর্য যা মানুষের কত প্রেমে অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিল।—মানুষের সেই অব্যক্ত উদ্যম কবি বা শিল্পীর রচনায় রচিত হয়ে ওঠে। এই রচিত হয়ে ওঠ্‌বার তপস্যা গূঢ়ভাবে সকল মানুষের মনের ভিতরে আছে। সকল মানুষেরই মন আপনার বিচিত্র ভাবোদ্যমকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা করছে। সেই সকলের ইচ্ছা ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে রূপ লাভ ক'রে সফল হয়ে উঠ্‌ছে। আমাদের মনে যে-সকল ইচ্ছার উদ্যম, আনন্দের উদ্যম, অন্তর্গূঢ় হ'য়ে আন্দোলিত হচ্ছে, তারাই হচ্ছে মানুষের সকল সৃষ্টির মূল-শক্তি। তারাই চিত্রীর তুলিকায়, কবির লেখনীতে, মূর্তিকারের ক্ষোদনীযন্ত্রে কেমন ক'রে প্রকাশিত হতে থাকে।

"অনেক সময়ে 'বসন্ত-কাননে একটু হাসি' আমাদের মনে যে আনন্দ জাগিয়ে দিয়ে যায়, মনে হয়, হয়তো এ কোনো দিন বাইরে কিছুতে বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে না। কিন্তু মনে আশা আছে যে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে না। লোহিতসাগর দিয়ে যেতে যেতে আমি একবার আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখেছিলুম। তখন মনে হয়েছিল যে এই অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সমাবেশকে তো ধ'রে রাখ্‌তে পারলুম না, ভাব্‌লুম যে বাইরের প্রকৃতির রূপের উচ্ছ্বাস আমার মনে ছায়া দিয়ে চলে গেল, সে ছায়াও তো মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এই যে অমৃতমুহূর্তে সৌন্দর্যে ডুব দিলুম, এর শেষ পরিণতি অপ্রকাশের বেদনার মধ্যে নয়—এই অনুভূতি আমার অন্তরলোকে আপন জায়গা ক'রে নিলে। সেই আমার অন্তরলোক সকল মানুষের অন্তরলোকের সামিল। সেইখানে এই-সমস্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ ও লয়। আকাশে মেঘের প্রকাশ ও লয়, অরণ্যে মাধবীর বিকাশ ও ঝ'রে পড়ার মতোই

সৃষ্টিলীলার আন্দোলন হচ্ছে বাহির থেকে অন্তরে, আবার অন্তর থেকে বাহিরে। আজ আমার চিত্তে যে আনন্দ দেখা দিয়েছে, সে যদিও আমার চিত্তের মধ্যেই আছে, তবু তার মধ্যে একটি বেরিয়ে আসবার প্রয়াস আছে। তাই সে ধাক্কা দিচ্ছে রুদ্ধদ্বারে। সমস্ত মানুষের মন জুড়ে এই ধাক্কাটি নিরন্তর চল্‌ছে। সেই ধাক্কাটি হচ্ছে বেরিয়ে আস্‌বার ইচ্ছা। ইচ্ছা নানা উপলক্ষ্যে জাগ্রত হচ্ছে ব'লেই মানবসমাজে সৃষ্টির কাজ চল্‌ছে। এর প্রেরণা, ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো আবশ্যকের প্রেরণা নয়, কেবলমাত্র প্রকাশের প্রেরণা। অতএব লোহিতসমুদ্রে আকাশের যে বর্ণভঙ্গিমা আমার মনের মধ্যে একদিন আনন্দের ঢেউ হয়ে উঠেছিল, সেই ঢেউ নিশ্চয় আমার রচনার সাধনায় বারবার ঠেলা দিয়েছে। আজ বসন্তে বাইবে যে মাধবীমঞ্জরী আমার অন্তরে আনন্দরূপ নিয়েছে, সে আমার মনের সাধারণ প্রকাশচেষ্টার মধ্যে একটি শক্তিরূপে বয়ে গেল—আমার নানা গানের নানা সুরে তার দোলা লাগ্‌বে—আমি কি তা জান্‌তে পাব্‌ব ?"

বিশ্বপ্রকৃতির শক্তি যেমন ফুল হইয়া বিকশিত হয়, অন্তর-প্রকৃতির শক্তিও তেমনি আনন্দসৃষ্টির রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়।

বলাকা—১৬ নম্বর

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি

১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসের সবুজপত্রের ৬৮৭ পৃষ্ঠায় ইহা 'রূপ' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গতি যে কেবল গতিতে পর্যবসিত থাকিতে চায় না, তাহার লক্ষ্য যে সকল সময়েই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়া, নিরাকার হইতে সাকার হওয়া, এই পরম সত্যটি এই কবিতার প্রতিপাদ্য। এই কবিতাটিতে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে।

গতিতে বস্তুর রূপ ফুটিয়া উঠে, আর স্থিতিতে বস্তুর স্তূপ জমা হইয়া একাকার হইয়া যায়। ('চঞ্চলা' কবিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) কবি নিজে এই কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন—

১ম শ্লোক

"চারিদিকে বিশ্বের বস্তুরাশি যেন হাহা ক'রে হেসে উঠেছে। ধূলোতে বালিতে তাদের করতালি হচ্ছে, তারা উন্মত্তভাবে নৃত্য কর্‌ছে। বস্তুর সংঘাতে

বস্তুর যে-লীলা হচ্ছে, যেন তারই কোলাহল শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে রূপের মত্ততা। রূপ বস্তুর আকারে গতি পেয়েছে, তার সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে।

"চারিদিকে বস্তু-পুঞ্জ সত্তা ধারণ ক'রে প্রকাশের মত্ততায় মেতে উঠেছে। তাই দেখে কবির মন তাদের খেলার সাথী হতে চায়। বস্তুর দল কবির ভাবনা-কামনাকে বলছে, আমাদের খেলার সঙ্গী হও—লক্ষ্যগোচর হও, ধুলাবালির মধ্যে রূপ ধারণ করে।

২য় শ্লোক

"মানুষের যে অব্যক্ত স্বপ্নের দল তারা যেন কূল পেলে বেঁচে যায়। তারা অপ্রকাশকে পেরিয়ে বস্তুর ডাঙায় সৃষ্টির সঙ্গে মিল্‌তে চায়। তারা যেন মজ্জমান প্রাণীর মতো অতলের নীচ থেকে ইটকাঠের মুষ্টি দিয়ে ধরণী আঁকড়ে ডাঙায় উঠতে চায়।

"এমনি ক'রে মানুষের চিত্তের চিন্তাগুলি বাইরে কঠিন আকার ধারণ করছে। মানুষের শহরগুলি আর কিছু নয়, তারা মানুষের ভাবনা ও কামনারই ব্যক্ত প্রকাশ। কোনো শহর কেবল কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি নয়। মানুষের যে-স্পর্শাতীত প্ল্যান, চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা রূপ-জগতে সুস্পষ্ট হতে চাচ্ছে, তারাই যেন লোহা-লক্কড়ের ভিতর দিয়ে এই শহরে স্পর্শগোচর হয়েছে। দিল্লীনগরীতে কত সম্রাট্ এসেছে, আবার তারা চলে গেছে, ম'রে গেছে। কিন্তু দিল্লীতে তাদের ভাবনা, ইচ্ছা, প্রতাপ কালে কালে স্তরে স্তরে জ'লে উঠে ইটকাঠের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ ক'রে এই মহানগরী তৈরী ক'রে গেছে। চিত্তের বেদনাকে বাদ দিলে বস্তুগুলি কেবলমাত্র খোলস হয়ে দাঁড়ায়; চিত্তের যে কঠিন চেষ্টা নিজেকে রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছে, সেই চেষ্টাতেই নগর নগরী হয়েছে।

৩য় শ্লোক

"যে-সকল চেষ্টা রূপ ধারণ করতে পারল, তাদের তো আজ দেখ্‌ছি; কিন্তু যেগুলি এখনো ব্যক্ত হয়নি, তারাও যে র'য়ে গেছে। অতীতের পূর্বপিতামহদের কামনা, ধ্যান-তপস্যা কি লুপ্ত হয়ে গেছে? না, তারা শূন্যে শূন্যে কানাকানি ক'রে ফিরছে, তারা বলছে, 'তোমাদের বাণী পেলে আপনাদের প্রকাশ করি। আমাদের কোনো আধার নেই, তোমাদের বাণী সেই আধার দেবে। আমরা যে অন্তরের কথা বল্‌তে চাই, শ্রুত হতে চাই।' লোকালয়ের তীরে তীরে এমনি কত অশ্রুত বাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের হাতে আলো নেই। কিন্তু অতীতের

সেই অব্যক্ত ইচ্ছা-চেষ্টা বর্তমান কালের আলোর তীর্থে, প্রকাশের ঘাটে উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছে। তারা সব পুরাকালের আলোকহীন যাত্রী। প্রকাশের ঘাটে উঠ্‌তে পার্‌লে তারা বাঁচে।

"তারা চিত্ত-গুহা ছেড়ে ছুটেছে। তারা রূপ পাবার আশায় অন্ধ-মরু পাড়ি দিয়ে চলেছে। তারা আকারের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিরাকারকে আঘাত করেছে। তারা কতদিন ধ'রে অব্যক্ত মরু পার হবার জন্য যাত্রা করেছে— বল্‌ছে 'কোথায় গেলে আকার পাই?' তারা প্রকাশ হবার জন্য কবির সাহায্য প্রার্থনা কর্‌ছে।

৪র্থ শ্লোক

"আমাদের ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগে, আমরা সবাই তাকে রূপ দিতে পারি না। কিন্তু তারা সব পাড়ি দিয়েছে। কে জানে কোন্ ঘাটে তারা উঠ্‌বে?

"একদিন তারা নূতন আলোতে বিকশিত হবে। কত যুগ-যুগান্তর আগে মানুষের মনে প্রেমের জন্য, শান্তির জন্য যে-সকল আকুল তৃষ্ণা জেগেছিল, তারা যুগে যুগে মানব-সমাজের নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কোনো না কোনো ব্যবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে। পুরাযুগের মানুষদের চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষার দল একযুগের পাড়ি শেষ ক'রে নবযুগে রূপের বন্দরে এসে ঠেক্‌ল। আজকের দিনে যে-সকল ব্যক্তিবিশেষ প্রচ্ছন্নতার ভিতরে থেকে কত গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তপস্যা কর্‌ছে, তাদের অপূর্ণ কামনাগুলিও পাড়ি দিয়ে বসেছে— হয়তো তারা কোনো ভাবী কালে অপূর্ব-আলোতে প্রকাশিত হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু কত পুরাতন, দূরবর্তী অতীতের ইতিহাসে এদের জন্ম হয়েছিল, তখন তো কেউ জান্‌তে পার্‌বে না। আজ তারা বাসাছাড়া পাখীর দলের মতো মানস-লোকের নীড় ত্যাগ ক'রে ডানা মেলেছে। তারা যেদিন বাসায় পৌঁছবে, সেদিন কোন্ নীড় ত্যাগ ক'রে তারা এসেছে তা কেউ জানবে না।

"আমার ভাবনা-কামনা নিয়ে কোন্ এক কবি যে কবিতা লিখ্‌বে, কোন্ এক চিত্রকর যে ছবি আঁক্‌বে, কোন্ এক রাজপুরীতে যে হর্ম্য তৈরী হবে, আজ দেশে তাদের কোনো চিহ্ন নেই। আজ সেইসব অরচিত যজ্ঞভূমির উদ্দেশে বর্তমানের মানুষ ভাবী কালের দিকে মুখ ক'রে তীর্থযাত্রীর মতো চলেছে। হয়তো কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রামের রণশৃঙ্গের ফুৎকারে আজকের দিনে আরব্ধ তপস্যার আহ্বান রয়েছে। ফরাসীবিপ্লবে মানুষের যুগ-সঞ্চিত ইচ্ছা ও বেদনার আহ্বান

ছিল। তাই তারা ডাক শুন্‌তে পেয়ে সংগ্রাম-স্থলে এসে পৌঁছেছিল। যে ইচ্ছা আজ ফললাভ করতে পারল না, ভাবী কালের কোন্ ভীষণ সংগ্রামে তাদের ডাক রয়েছে।"

জগতে অসংখ্য অশ্রুত বাণী অতৃপ্ত বাসনা ব্যক্ত হইয়া আকার পাইবার জন্য ছটফট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; বর্তমানের নিষ্ফলতা ও অপ্রকাশ ভাবী কালে সফলতা ও প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যাকুল। অমূর্ত নিরাকার চিত্তবেদনাগুলি আধারের অন্বেষণে অস্থির। এইজন্য ইহারা সব গতি। এই বেদনাগুলি সত্য বলিয়া গতিও সত্য। কিন্তু এই বেদনা যেমন কেবলমাত্র বেদনাতেই পর্যবসিত থাকিতে চায় না, গতিও তেমনি চিরকাল কেবল গতি হইয়াই থাকিতে চায় না। এইজন্য আমাদের ভাষায় সুব্যবস্থার নাম গতি; আর দুর্ব্যবস্থার নাম দুর্গতি। চিত্তের বেদনা এক আধারেই নিজেকে চিরদিন বদ্ধ রাখে না, ক্রমাগতই সে আধার হইতে আধারে গতিশীল। এজন্য তাজমহল সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' বের্গ্‌সঁ আধার স্বীকার করেন না; গতি চিরকালই গতি, গতিই কাল। নগর প্রভৃতি স্থিতিশীল জিনিস কল্পনা মাত্র, বুদ্ধির সৃষ্টি; সত্যের হিসাবে ইহার মূল্য শূন্য।

বলাকা—১৭ নম্বর

হে ভুবন আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো

ভালোবাসাতেই বস্তুর আনন্দদানের ক্ষমতা প্রকাশ পায়; আলো যখন দ্রষ্টার মনে আনন্দের উদ্বোধন করে, তখনই বিশ্বভুবনের সঙ্গে মনের মিলন ঘটে। দ্রষ্টা প্রেমের দৃষ্টি দিয়া বস্তুর আনন্দ ও সত্য সত্তা উপলব্ধি করিলে তবেই বস্তুর পূর্ণতা লাভ হয়।

আমার প্রেম ভুবনের গোপন অথচ চিরন্তন মাধুর্য ও সত্যকে উদ্ঘাটন করিয়া আমার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। আমার প্রেম-উপহারের প্রতীক্ষাতেই ভুবনের সমস্ত বাসকসজ্জা।

কবি এই কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন :—

১ম শ্লোক

যতক্ষণ বিশ্বকে ভালোবাসি নি ততক্ষণ আমার জীবনে তার দান কিছু কম পড়েছিল, তখন তার আলোতে সব সম্পদ্ পূর্ণ হয় নি। কারণ, যখন আলোর মধ্যে আনন্দকে দেখি তখনই আমার কাছে তার সার্থকতা আছে। কেবল এই ব্যাপারটি যখন আমার কাছে সপ্রমাণ হল, তখনও তার আসল তাৎপর্য (significance) আমার কাছে সুস্পষ্ট হয় নি। কিন্তু যখন ভুবনের দিকে চেয়ে থেকে আনন্দের উদ্বোধন হল, তখন যে আলো আমার মনের সঙ্গে মিলন সম্পাদন করল তার সত্য আমার কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। আমি যতক্ষণ ভুবনকে ভালোবাসি নি, ততক্ষণ সমস্ত আকাশ দীপ হাতে চেয়ে ছিল—আমার আনন্দের দ্বারা তার আলোর সত্য পূর্ণতা লাভ করবে বলে। আকাশ সূর্যচন্দ্র-তারার বাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে—কখন্ আমি প্রেমের আনন্দদৃষ্টি দিয়ে তার সত্যকে উপলব্ধি করব। সে বহুবৎসর ধ'রে দীপ জ্বালিয়ে আমার আনন্দে তার সার্থকতা খুঁজছিল।

২য় শ্লোক

যেদিন প্রেম গান গেয়ে এল—তোমার সঙ্গে আমার মিলন হল; সেদিন কি যেন কানাকানি হল। ভুবনের সঙ্গে আমার পরিণয় হল, সে বল্লে—আমি তোমায় বরণ করলুম। আমার প্রেম বিশ্বের গলায় আপন মালা পরিয়ে দিয়ে হেসে দাঁড়াল। সে তার দিকে হেসে চাইল—তারপর একটা কিছু দিল, যা গোপন বস্তু কিন্তু যা চিরদিনের জিনিস। সে তাকে সেই আনন্দসম্পদ্ দিয়ে গেল যা তার তারার আলোয় চিরদিনের মতো গাঁথা হয়ে রইল। এই সম্পদ্ উপহার পাবে ব'লেই ভুবন তারার দীপ জ্বালিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে পথ চেয়ে ব'সে ছিল—কবে আমার প্রেমের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হবে, সে এসে ভুবনের গলায় মালা পরিয়ে দেবে! তারার আলোর মধ্যে এই প্রতীক্ষা ছিল। যেদিন প্রেম এল, সেদিন সে এমন কিছু দিয়ে গেল যা ধ্রুব-তারায় ধ্রুব হয়ে রইল, যা ভুবনকে পরিপূর্ণতা দান করল।

বলাকা—১৮ নম্বর

১ম শ্লোক

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি

"আমি যতক্ষণ স্থির হয়ে আছি, ততক্ষণ বস্তুসমূহ ভার-স্বরূপ হয়ে থাকে।

তখন জীবনের বোঝা, সঞ্চয়, ধন,—আমার পক্ষে দুর্বহ হয়। যখন আমার চলা বন্ধ হয়ে যায়, তখন ধনজন যা কিছু জমতে থাকে তা কিছুই চলে না, তারা আমাকে ঘিরে ফেলে। সেই সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য আমি জেগে আছি। বইয়ের পোকা যেমন তার পাতার মধ্যে ব'সে ব'সে তাদের কাটে আর খায়, তেমনি আমি এই জায়গায় ব'সে ব'সে কেবল খাচ্ছি আর জমাচ্ছি। আমার চোখে ঘুম নেই—মনের মাথায় বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে। দুঃখ নূতন নূতন হয়ে বেড়ে চলেছে, বোঝাই হয়ে উঠ্‌ছে। আমি স্থির হয়ে আছি ব'লে সতর্ক বুদ্ধির ভারে, সংশয়ের শীতে জীবনের চুল পেকে গেল, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

২য় শ্লোক

"আমি যেই চল্‌তে সুরু কর্‌লেম, অমনি মন তার মাথায় পিঠে যে বোঝা চারিদিক থেকে এঁটে দিয়েছিল, বিশ্বের সঙ্গে সংঘাতের দ্বারা তার আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, ব্যাথার সঞ্চয়ের ক্ষয় হল। চলার সংঘর্ষে আনন্দের আবেগে যে আবরণ জড়িয়ে ধরেছিল তা ক্ষয় হতে থাকে। মন মতামতের (opinion-এর) দুর্গে বন্ধ হয়ে বাঁধা আইডিয়ার মধ্যে থাক্‌লে বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যা চলে না, স্থির হয়ে জমতে থাকে তা মলিনতার আবর্জনা। মন যতই নতুন পরিবর্তনের মধ্যে চল্‌ছে ততই সে নব নব সম্পদে ভূষিত হচ্ছে। সনাতনের অচলতার দ্বারা মন নবীভূত (purified) হতে পারে না। চলার স্নানেই সকল বস্তু ধৌত নির্মল হয়ে যাচ্ছে। জরা জীবনকে যে পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন করে রাখে, জীবনের চলার প্রাণশক্তি (vigour) সেই সঞ্চিত স্তূপকে ফেলে এগিয়ে চলে। স্থবিরতা কেবলই পুরাতনকে আঁকড়ায়। সে বোঝা ফেলে দিয়ে হাল্‌কা হতে চায় না। তাই সে মলিন স্তূপের দ্বারা জড়িত হয়ে থাকে। এর থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে মনকে নিত্যনবীন পথে চালনা করা। চলার আনন্দরস পান ক'রে মনের যৌবন বিকশিত হয়।

৩য় শ্লোক

"আমি থাম্‌ব না। আমি বল্‌ব না যে, 'আমার চলা সারা হয়ে গেল,— সুতরাং এখন আমি যা সঞ্চয় করেছি তাই দিয়ে থুয়ে আমি গৃহস্থ হয়ে বস্‌লাম।' —আমি যাত্রী, আমি সম্মুখপানে চল্‌ব। কে পিছন থেকে ডাকছে, আমি তার কথা শুন্‌ব না। আমি আর সঞ্চয়-স্থবিরতা-মৃত্যুর গোপন প্রেমে ঘরের কোণে লুকাব না। আমি ঘর-ছাড়া হয়ে পথের পথিক হব। আমি চিরযৌবনকে

মালা পরাব। ঐ যে চিরযৌবন চলেছে পথিকের বেশে, তাকে আমি আমার যা-কিছু নিজের রচনা, সৃষ্টি, নিজের যে-সব দেবার জিনিস সমস্তই দেব। যে বার্ধক্য সঞ্চয়ের দুর্গে সতর্ক বুদ্ধির দেওয়ালে বদ্ধ হয়ে ব'সে আছে, তার আয়োজনকে আজ দূরে ফেলে দিয়ে আমি হাল্‌কা হয়ে চল্‌ব।

৩য় শ্লোক

"হে আমার মন, অনন্ত গগন যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ হয়ে গেছে। যে রথ তোমায় নিয়ে চলেছে, বিশ্বকবি তার মধ্যে ব'সে আছেন। গ্রহতারারবি যাত্রার গান গাইতে গাইতে চলেছে। মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলার আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে।"

১৯ নম্বর

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে

কবি এই কবিতায় বলিতে চাহিয়াছেন যে—মৃত্যুর ভিতর দিয়া না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন হয় না। সীমাকে পদে পদে মরিয়া পুনরুজ্জীবিত হইতে হয়। মৃত্যু annihilation নয়। তাহা যদি হইত, তবে বিশ্বের প্রকাশ এমন সুন্দর হইত না। মৃত্যুতে রূপের বিনাশ নয়, রূপের নবীনতা সম্পাদন হয়। এই কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ—

১ম শ্লোক

আমি জগৎকে ভালো বেসেছি ব'লে আমার আনন্দ আছে। আমি জীবন দিয়ে এই বিশ্বকে ঘিরে ঘিরে বেষ্টন ক'রে রেখেছি। আমি বিশ্বের প্রভাত-সন্ধ্যায় আলো-অন্ধকারকে আমার চেতনা দিয়ে পূর্ণ করেছি—তারা আমার চৈতন্যের ধারার উপর দিয়ে ভেসে গেছে। আমি অনুভব করেছি যে জীবন ভুবনের সঙ্গে মিলে গেছে, এরা তফাৎ নয়। আমি জীবনকে আলাদা ভালোবাসি না ব'লে আমার কাছে জগতের আলোকে ভালোবাসা মানেই আমার প্রাণকে ভালোবাসা। আমি জীবনকে কখনো জগৎ-ছাড়া দেখি না, তাই আমার ভয় হয় না পাছে জগতের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়। আমি যদি জগৎ থেকে দূরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতুম, তবে এই অনুভূতি হয় তো থাকত না। কিন্তু আমি জগতে বাস করছি ব'লে আমার কাছে জীবন ও ভুবনের ভালোবাসা এক হ'য়ে আছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগৎ ও আমার চৈতন্য এক

হয়ে গেছে ব'লে, চৈতন্য থেকে বিরহিত জগৎটা আমার কাছে একটা abstraction। জীবন ও ভুবন যখন মিলিত হচ্ছে, তখনই উভয়ে সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করছে।

২য় শ্লোক

—এও যেমন একটা সত্য, তেমনি এই বস্তুবিশ্বে একদিন আমাকে মরতে হবে এই ব্যাপারটাও তেমন সত্য। এমন একদিন আসবে, যখন আমার যে বাণী ফুলের মতো ফোটে, তা বাতাসের স্পর্শে ফুটে উঠবে না। আমার চোখ প্রতিদিন আলো আহরণ করছে, কিন্তু সেইদিন আমার চোখের সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন আমার হৃদয় অরুণোদয়ের আহ্বানে ছুটছে, সেদিন তা ছুটবে না। একদিন রজনী কানে কানে তার রহস্যবার্তা বলবে না—সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কাজ ফুরিয়ে যাবে। তাই পার্থিব জীবনের যে এমনি ক'রে অবসান হবে এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

৩য় শ্লোক

জগৎ জীবনকে এমন একান্ত ক'রে চাচ্ছে। আলো-অন্ধকারের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে সে কত ক'রে জগৎকে চাচ্ছে এবং উভয়ের মিলনের দ্বারা এই চাওয়ার সার্থকতা হচ্ছে। এ সত্য। তেমনি একদিন এই জগতের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, আমাকে মরতে হবে, সেও সত্য। তবে কি ক'রে এই contradiction হতে পারে, এই দুই সত্যের মধ্যে কি মিল নেই? যদি মিল না থাকে, তবে জগৎকে যে চাইলুম, সে যে আমাকে ভোলালে, তা যে একটা মস্ত প্রবঞ্চনায় গিয়ে ঠেকল। বিশ্বের সঙ্গে জীবনের যে আনন্দ-সম্বন্ধ স্থাপিত হল তা যদি একদিন মিথ্যা হয়ে যায়, যদি এমন ক'রে সব ছাড়তে হয়, তবে তো কোনো মানে থাকে না।

অথচ কোনো ক্রূরতা তো বিশ্বে বলীরেখা আঁকে নি। যদি বিশ্ব এতদিন এত বড় প্রবঞ্চনাকে বহন ক'রে এসে থাকে, যদি মৃত্যুর নিরর্থকতায় সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,—তবে তার কোনো চিহ্ন এই পৃথিবীতে কেন দেখছি না? তা হ'লে তো বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য থাকত না। পুষ্পকে কীট কাটলে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি মৃত্যুও সত্য হত তবে সব মৃত্যু বিশ্বে তার দংশনের ছিদ্র ফুটো রেখে দিয়ে যেত। তবে মৃত্যুকীট অনায়াসে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো ক'রে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্য ফোটা

ফুলের মতো আমার সাম্‌নে রয়েছে? এই সৌন্দর্যের emphasis-এর মানেই হচ্ছে যে মৃত্যুই সর্বগ্রাসী abyss নয়, মৃত্যুই চরম সত্য নয়। যদি তাই হত, তবে তার প্রত্যেক দংশন ভুবনকে ছিদ্রে আচ্ছন্ন ক'রে কালো ক'রে শুকিয়ে ফেল্‌ত।

আলোচনা

(১)

"এমন একান্ত ক'রে চাওয়া"—এমন করে যে জগৎকে চাচ্ছি আর এমন ক'রে যে জগৎকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, এই দুটোই যদি সমান সত্য হয়েও দুটো contradictory হয় তবে জগতে এই ভয়ানক অসামঞ্জস্যের ভার এই প্রবঞ্চনা থেকে যেত, তার সৌন্দর্যের মধ্যে ক্রূরতার চিহ্ন দেখ্‌তাম। কিন্তু তা তো কোথাও দেখি না। তবে এই দুই সত্যের মিল কোথায়?

এর উত্তর এই কবিতায় নেই,—কিন্তু সেটাকে এম্‌নি ভাবে বলা যেতে পারে।—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন (renewal) হয় না। ['ফাল্গুনী'তে আমি এই কথাই বলেছি। 'ফাল্গুনী' 'বলাকা'র সমসাময়িক।] সীমাকে পদে পদে মর্‌তে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণসঞ্চার না হলে সে যে জীবন্মৃত হয়ে রইল। রূপ (form) যদি স্থবির হয়—fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবে সেই অচলরূপেই তার সমাধি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে রইল তবে তো তার প্রসারণশীলতা (elasticity) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখ্‌তে পাই প্রথার গণ্ডিতে বদ্ধ হয়ে থাকার দরুন মানুষের মনের প্রসারণশীলতা যখন চ'লে গেল, তখন আবার একটা নবযুগ তার বাণীকে বহন ক'রে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিল। অসীমের প্রকাশ (manifestation) সীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরম অবসান নয়—মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক্, তার negative দিক্‌টার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তার প্রবাহকে পুনঃপ্রবর্তিত করা।

এই নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতির বোঝাকে যে বইতে হবে, তা নয়। মানুষের জীবনের শৈশবকাল থেকে একটা ঐক্যধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে—বিস্মৃতির সিংহদ্বার দিয়ে সেই ধারাকে আসতে হয়েছে। আমাদের

সচেতন জীবনের মধ্যেও কত বিস্মৃতির ফাঁক আছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ রয়েছে। যে সত্য আমাদের দেহে আবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তা আজ আমার চেতনার আলোয় বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আলোরও মেয়াদ (term) আছে, এই বেড়ারও অবসান আছে।

এক এক সময় ঠেলা আসে, তখন তার ধাক্কায় সব বিদীর্ণ হয়ে যায়। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের অবস্থানও ঠিক এই রকমের। সে যতক্ষণ পরিণতি লাভ করেছে, ততক্ষণ তার বৃদ্ধি সেই সীমাবদ্ধ জায়গাতেই আছে। কিন্তু এই পরিণতির শেষ হলেই তাকে বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে যেতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনেরও এমনি ক'রে adjustment হয়, তার পরিণতির দ্বারকে ভাঙ্‌তে হয়—বিশালতর মুক্তিক্ষেত্রের জন্য।

এটা কোনো দার্শনিক speculation-এর কথা নয়, এ হচ্ছে poetry-র কথা—সত্যের positive দিক্ হচ্ছে আনন্দ। কিন্তু তার negative দিক্‌ও আছে। যদি সেটাকেই বড় ক'রে দেখ্‌তুম তবে পদে পদে মৃত্যুর পদচিহ্ন চোখে পড়্‌ত। কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি জরারই ছায়ার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে, সে চলেছে। যা দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে সত্যের positive দিক্‌টা। তবে এ দুটো দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যখন সীমার রূপের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া অসীমের অন্য গতি নেই, তখন তাকে কারাগারকে ভেঙে ফেলেই বার বার শাশ্বত স্বরূপকে দেখাতে হবে।

(২)

ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে আমার বিলাতে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তাঁরও এই মত। আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা চক্র (cycle) আছে, সেটাকে যখন সম্পূর্ণ কর্‌ব তখন স্মৃতির ধারা পূর্ণতা লাভ কর্‌বে। এখন আমার মনে নেই আমার পূর্বেকার জীবনে কি হয়েছিল, এখন আমার সাম্‌নের দিকেই গতি। একটা অধ্যায় যখন পূর্ণ হবে, তখন পিছন ও সাম্‌নের সঙ্গে আমার যোগ হবে।

'জীবনদেবতা'র group-এর কবিতাগুলিতেও এই ব্যাপারটি ঘটেছে। আমার প্রথম কবিতাগুলিতে আমি নিজেই জানি না কি বল্‌তে চেয়েছি। 'কে সে, জানি নাই তারে'—এই ভাবের মধ্যে দিয়ে grope কর্‌তে কর্‌তে অজ্ঞাতভাবে আমার কবিতার ভিতর দিয়ে একটা অভিজ্ঞতাকে পেলুম। আমার চক্র সম্পূর্ণ

হল, আমার অনুভূতির রেখাটি আবর্তন করে এসে আরেক বিন্দুতে মিল্‌ল,—ঐক্যটি পরিস্ফুট হল, আমি বুঝতে পারলুম।

তেমনি করে জীবনের এক একটা চক্ররেখা (cycle) আছে। যখন তা সম্পূর্ণ হবে, তখন অনুভূতির ভিতর দিয়ে মর্মগত (significant) সত্যটিকে বুঝতে পারা যাবে। নভেল্ যখন সবটা শেষ করি, তখনই সব অধ্যায়ের সমষ্টিগত উপাখ্যানধারাটি পূর্ণ হয়। পিছনে যা ফেলে চল্‌লুম, তা দেখ্‌বার সময় নেই—আমাকে সাম্‌নে চল্‌তে হচ্ছে। চলা যখন শেষ হয়ে চক্র পূর্ণ হ'ল, তখন সম্মুখ-পশ্চাৎ মিলিত হল, আমার স্মৃতিগুলি ঐক্যধারায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

তর্কের দ্বারা এই সত্যের প্রমাণ হয় না, এ ব্যাপার আমাদের instinct-এর। যে পাখীর ছানা (chick) ডিমের খোলসের মধ্যে আছে, তার কাছে প্রমাণ নেই যে বাইরে একটা জগৎ আছে। তার আবেষ্টনটি বাইরের জগতের সম্পূর্ণ উল্টা। কিন্তু এই বাইরের জগতের প্রমাণ আছে তার instinct-এ—তারই প্রেরণায় সে ক্রমাগত খোলসে ঘা দিচ্ছে। তার ভিতরে তাগিদ (impulse) আছে, তার বিশ্বাস তাকে ব'লে দিচ্ছে,—'এখানে স্থিতি, এখানে গতি নয়, কৃত্রিম আশ্রয়কে ভেঙে ফেল।' অথচ খোলসের গণ্ডির মধ্যে এই মুক্ত জগতের কোনো প্রমাণ নেই।

মানুষের অভিজ্ঞতাও তেমনি আমরা দেখ্‌তে পাই। সব ধর্মের system-এ একটা অকৃতজ্ঞতার ভাব আছে ; তা কেবল বল্‌ছে যে এই যে যা দেখ্‌ছ তা শেষ কথা (absolute) নয়। সব ধর্মতন্ত্র বল্‌ছে যে বিরুদ্ধে যেতে হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বর্তমান আছে যে, যা দেখেছি তার চেয়ে যা অগোচর অপ্রত্যক্ষ তা ঢের বেশী মূল্যবান্। সেই প্রেরণা, বিদ্রোহ আমাদের instinct-এ আছে। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এ তো ঠিক কথাই—বিষয়ী লোকেরা এই কথা বল্‌ছে। কিন্তু মানুষ কিছুতেই মনে কর্‌তে পার্‌ছে না যে এতেই সব শেষ। সে তর্ক করুক আর যাই করুক, তার instinct তার দেওয়ালে এই ধাক্কা মার্‌তে ত্রুটি কর্‌ছে না ; যা প্রত্যক্ষ-গোচর তাকে সে আঘাত কর্‌ছে, ঠোকর মার্‌ছে।

সব মনুষ্যত্বের বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই প্রেরণা (urging) চ'লে আস্‌ছে। যা প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক, যাকে তর্কের দ্বারা বোঝান যায়—তাকে মানুষ অবিশ্বাস ক'রে এসেছে। বর্বরদের তো এ বিদ্রোহের ভাব নেই, কারণ তাদের জ্ঞানানুশীলন (culture) নেই। যখন আমার বুদ্ধি আমাকে স্থির রাখ্‌তে

পার্‌ল না, এগিয়ে নিয়ে গেল, তখন সত্যকে পেলুম। যে সত্য আমার গণ্ডিকে অতিক্রম করে বর্তমান আছে, তাকে তখন আমি লাভ কর্‌লুম। মানুষ যেমন জ্ঞান-জগতে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি আমার অধ্যাত্মজগতের যে আবেষ্টন আছে, তার মধ্যেকার সত্যকে নেবার জন্য আমার personality-তে 'ভূমৈব সুখম' এই বিশ্বাসের প্রেরণা রয়েছে। আমরা জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে মেনে নিচ্ছি না, তাই ক্রমাগত আবেষ্টনে ঠোকর দিচ্ছি। এই বিশ্বাসের দ্বারা যারা অনুপ্রাণিত, 'অমৃতাস্তে ভবন্তি',—তারাই অমৃতকে লাভ করে।

(৩)

প্রত্যেক form-এর মধ্যে দুটো জিনিস রয়েছে—খানিকটা তার প্রকাশিত আর বাকিটা তার আচ্ছন্ন। যা আচ্ছন্ন রয়েছে, একটা বিরুদ্ধ শক্তি তাকে ঘা না দিলে তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। মৃত্যু প্রকাশের প্রবাহকে ক্রমাগত মুক্তিদান ক'রে চলেছে। মৃত্যুতে form-এর কোনো বিনাশ হয় না, তার renewal বা নূতন নূতন প্রকাশ হয়।

বলাকা—২১ নম্বর

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর

এই কবিতাটি ৮-ই মাঘ ১৩২১ সালে লেখা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রচনা হইয়াছিল ২৯-এ পৌষ কবির মনে। কবি এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে ছিলাম আমি। ২৯-এ পৌষ রেল-গাড়িতে তিনি ২০ নম্বরের কবিতাটি রচনা করেন। রেল-গাড়িতে আসিতে আসিতে কবি দেখিলেন যে রেল-লাইনের দুই ধারে বুনো গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই ফুলের সমারোহ দেখিয়া কবি আমাকে বলিলেন—দেখ, কবে বসন্ত আসিবে তাহার খবর লইয়া এই-সব বসন্তের দূত আসিয়া হাজির হইয়াছে। ইহারা দু-দিন বাদেই ঝরিয়া মরিয়া যাইবে, ইহাদের সঙ্গে বসন্তের সাক্ষাৎ ঘটিবে না। কিন্তু ইহারা যে বসন্তের আগমনী তাহাদের রূপে গন্ধে মধুতে গাহিয়া যাইতে পারিল এই আনন্দেই তাহারা অকাল মরণ বরণ করিয়া লইতেছে হাসিমুখেই। ইহাদের সম্বর্ধনা করিয়া আমার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

আমি কবিকে বলিলাম—বেশ তো লিখুন না।

কবি হাসিয়া বলিলেন—তুমি তো বলিলে, লিখুন না। কিন্তু আমি লিখি কেমন করিয়া! আমাদের দেশের বুনো ফুলের, পাখীর, গাছের—কি কোনো নাম আছে? ইংলণ্ডের লোক অতি সামান্য বুনো ঘাসের ফুলেরও নাম রাখিয়া ফুলের সম্মান রাখিয়াছে, তাহারা প্রকৃতির দানের সমাদর করিয়াছে; আর আমাদের বৈরাগ্যের দেশে সব কিছুতেই উদাসীনতা, যদি বা কোনো ফুল সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহার পরিচয় অভিধানে কেবলমাত্র 'পুষ্প বিং' ছাড়া আর কিছু নয়। ইহাদের কোন্ নামে আমি পরিচয় দিব আমার কবিতায়?

আমি বলিলাম—আপনি ইহাদের নাম রাখুন, এবং সেই নামেই ইহাদের পরিচয় অমর হইয়া থাকিবে।

কবি হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু সে নাম কে বুঝিবে! আমার পণ্ডশ্রম হইবে।

কবি কলিকাতায় ফিরিয়া সেই বসন্তের অগ্রদূত ফুলেদের সম্বর্ধনা করিয়া কবিতা লিখিলেন এবং আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া শুনাইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম—যত সব বুনো অনামা ফুল আপনার কবিতায় হইয়া গেল 'পাগল চাঁপা' আর 'উন্মত্ত বকুল'।

কবি হাসিয়া বলিলেন—কী আর করি বলো। লোকের চেনা নামেই সেই অচেনাদের চেনালাম।

পৌষ মাস, শীতের অবসান তখনও হয় নাই,—বসন্ত আসিতে দেরী আছে। কিন্তু পৌষের দারুণ শীতের মধ্যেই দক্ষিণা হাওয়া চলিতেছে। নানারকমের ফুল সেই অকাল বসন্তসমীরণের ডাকে সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে; দেখিয়া কবির মনে হইতেছে যে ফুলদল যেন স্থির থাকিতে না পারিয়া গতির আনন্দে চঞ্চল হইয়া আকুল হইয়া রঙবেরঙের বসনে সাজিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দলে দলে ছন্দে ছন্দে পা ফেলিয়া তাহারা যেন কোথায় যাত্রা করিয়া চলিয়াছে।

'বসন্ত সে আসবে যে ফাল্‌গুনে'—লগ্ন তো এখনো আসে নাই! তবু ফুলদল কোন্ এক দুর্লভ পথিকের পদশব্দ শুনিয়া বর্ণগন্ধের ডালি হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহারা বেহিসাবীর দল, ইহারা ক্ষ্যাপা পথিক! বসন্তের পদশব্দ শুনিয়াই ইহারা মাতিয়া উঠিয়াছে। ইহারা হিসাব করিয়া দেখিল না যে তাঁহার দেখা ইহারা পাইবে কি না? তবে এইটুকু সান্ত্বনা তাহাদের মনে রহিল যে, মরণ দিয়া ইহারা তাঁহার চলার পথের ধূলা ঢাকিয়া কোমল করিয়া দিতে

পারিয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, বা হিসাব না করিয়া ইহারা যে শুধু ফোটার আনন্দে ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল সেইজন্যই তো ইহারা ধন্য! কারণ,—

অনাসক্ত হয়ে যে ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারে সে-ই আপনার অসীম স্বরূপকে পায়। যারা শুধু ফল পেয়ে বিষয় পেয়েই খুশি তারা তো বণিক। ত্যাগীর কাছে এই খুশির কোনো মূল্য নেই। দেবার মুক্তির জন্তই সে ব্যাকুল। পেতে হলেই থামতে হয়। পাওয়া সম্পদ নানা ভাবে নানা দিক থেকে জড়িয়ে ধরে। কাজেই বন্ধনের মধ্যে ধীরে ধীরে পচে মরতে হয়। আর দেওয়া মানেই চলা। চলার আনন্দেই তার সার্থকতা।

বলাকা—২২ নম্বর

যখন আমার হাত ধরে

বলাকার এই কবিতাটিতে কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে, সুখ-ঐশ্বর্য যেমন মুক্তিলাভের অন্তরায়, তেমনি সম্মান সমাদরও মুক্তিপথের কম বাধা নয়। আগে বাইরের সম্মান কবিকে ক্ষণিক ঝুটা সম্পদে ভূষিত করিয়াছিল, এখন নিজের আন্তরতেজের গৌরব লাভ করিয়া আপন অন্তরের মহিমায় একলা পথে কবি যাত্রা সুরু করিয়াছেন।

চরম সমাদর বাহিরে নাই, তাহা অন্তরের ধন; যখন বাহিরের খ্যাতির ঘটা ঘুচিয়া যায়, একমাত্র তখনই জীবনদেবতার বা অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীর আদর অন্তরে অনুভব করিবার অবসর পান কবি। যাহা অপরের অপেক্ষা রাখে তাহা তো বন্ধন! লোকের স্তুতিনিন্দায় তাহার নিয়ত পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অন্তরে কাব্যলক্ষ্মীর চরম সমাদর লাভ করিলে বন্ধন মোচন হয়, তখন আপন যথার্থ স্বরূপকে জানা যায়।

কবি এই কবিতাটির ব্যাখ্যা এইরূপে করিয়াছেন—

তুমি যখন আমায় সমাদর ক'রে পাশে ডেকেছিলে, তখন ভয় হয়েছিল পাছে তোমার সেই আদর থেকে আমি একটুও বঞ্চিত হই, পাছে অসতর্ক হয়ে আমার কিছু নষ্ট হয়—কোথাও সম্মানের কোনো হানি হয়। তখন আপন ইচ্ছা-মতো যে নিজের রাস্তায় চল্‌ব তার উপায় ছিল না—যে পথে চল্‌লে আপনাকে সহজে প্রকাশ কর্‌তে পারি সে-পথে চল্‌তে দ্বিধা হয়েছে। আমি চল্‌তে গিয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে গেছি, পাছে এদিক্-ওদিক্ এক পা নড়্‌তে গিয়ে তোমাকে অসন্তুষ্ট করি।

তুমি যখন আমায় সম্মান দিলে তখন এই বিপদ্ হল,—আমি যে আমার মতে সহজ-পথে চল্‌ব তা' হল না, আপনাকে সহজে বহন ক'রে নেবার ব্যাঘাত ঘটল। পাছে আমি কোনো সময়ে তোমার সম্মান হারাই, পাছে কোথাও গেলে ক্ষতি হয়—এই আশঙ্কা আমি দূর করতে পারি নি। (১ম স্ট্যাঞ্জা)

আজ আমি মুক্তি পেয়েছি। তোমার সম্মানের বাঁধনে বাঁধা ছিলাম, আজ মুক্তি বেজে উঠেছে—অনাদরের কঠিন আঘাতে তার সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে। অপমানের ঢাক্ ঢোল বেজে উঠ্‌ল—আমি সম্মানের বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম। আজ আমার ছুটি—যে-খোঁটা আমার মনকে বেঁধেছিল, তা' আজ ভেঙে গেল, হাত-পায়ের বেড়ি খ'সে গেল। যা দেবো আর নেবো দক্ষিণে বামে তার পথ খোলসা হল। যখন সম্মানের বেষ্টনে বদ্ধ হয়ে পা ফেল্‌ছিলুম তখন আমার ভাবনা ছিল, কি দেবো আর নেবো। কিন্তু এবার দেবার-নেবার পথ খোলসা।

আমার এক সময় ছিল যখন আমাকে কেউ জান্‌ত না। আমি বিশ্বে অনায়াসে বিহার করেছি, স্বচ্ছন্দে আকাশ-পৃথিবীতে উপরে উঠেছি, নীচে নেমেছি, কে কি বল্‌বে, কাড়্‌বে তা' ভাবি নি। সে-সময়ে আমার সম্মানের অধিকার ছিল না। আজ আবার আকাশ-পাতাল আমায় খুব ক'রে ডাক দিল, আজ আমি অনাদৃতের দলে। যে লাঞ্ছিত, তার ভাবনা নেই—সমস্ত জগতে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌লে কে তাকে থামায়? এই যে আমি ঘরের মধ্যে সম্মানের বেষ্টনে ছিলাম, আজ তা ঘুচে গেল। আমি আমার আশ্রয়কে হারালাম। আজ আমায় ঘরছাড়া বাতাস মাতাল ক'রে দিল, আর আমার ভয় নেই। যখন রাত্রে কোনো তারা খ'সে পড়ে, তখন একসময়ে তারকাসমাজে তার যে সম্মানের আসন ছিল তাকে সে হারিয়ে বসে; 'কুছ্ পরোয়া নেই' ব'লে আকাশে ঝাঁপ দেয়। তেমনি আমি আজ মরণটানে ছুটে চলেছি, বল্‌ছি 'ভয় নেই, সব বাঁধন ছিঁড়ল'। (২য় স্ট্যাঞ্জা)

আমি কাল-বৈশাখীর বাঁধন-ছিন্ন মেঘ। এবার ঝড় আমাকে তাড়া দিল, অপমানের ঝড় অচলা স্থিতি থেকে আমাকে পথে বা'র ক'রে দিয়েছে। সন্ধ্যা-রবির সোনার কিরণ আমাকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। যখন কাল-বৈশাখী তাড়া দিল, তখন আমি স্বর্ণ-কিরীট অস্তপারে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মেঘ হয়ে বজ্রমাণিকে ভূষিত হয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। আমি সেই বাঁধন-হারা বৈশাখের মেঘ—একা একা আপন তেজে ঘুরে বেড়াব। বাইরের সম্মান আমাকে আলোকিত করেছিল, কিন্তু এখন আমার ভিতরে বজ্রমাণিকের তেজ আছে। সেই

তেজ আমাকে গৌরবান্বিত করেছে,—বাইরের অস্তরবির কিরণ নয়। যে-সম্মান আমাকে বাইরে টেনেছিল, আমি তাকে ফেলে দিয়ে আপন অন্তরের মহিমায় একলা পথে বার হয়েছি।

আমি অসম্মানের মধ্যে মুক্তি পেলাম। সকলের চেয়ে চরম সমাদর যা', তা' বাইরে নেই, তা' অন্তরে। যখন বাইরের খ্যাতির ঘটা ঘুচে যায়, একমাত্র তখনই তোমার আদর অন্তরে পেয়ে থাকি। সেটাই সমাদরের শেষ, তাতেই মুক্তি হয়। যা' অপরের অপেক্ষা রাখে, তা' আমার পক্ষে বন্ধন। লোকের কথার উপর, স্তুতিবাদের তারতম্যের উপর তার নিয়ত পরিবর্তন হয়। কিন্তু তোমার আলো যখন অন্তরে আসে, তখন আপন যথার্থ স্বরূপকে জানি; তোমার চরম সমাদরে আমার বন্ধন মোচন হয়। (৩য় স্ট্যাঞ্জা)

গর্ভে যখন সন্তান থাকে তখন সে মাকে দেখে না।—মা যখন তাকে মাটির উপর দূর ক'রে দিল, তখন যেন সে সমাদরের বেষ্টন থেকে অসম্মানের ধরণীতে বিচ্যুত হল। কিন্তু তখনই শিশু মাকে দেখ্‌তে পেল। যখন সে আরামে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, তখন সে মাকে জানে নি, দেখে নি। তুমি যখন আদরের মধ্যে সম্মানের দ্বারা আমাকে বেষ্টিত কর—হাজার নাড়ীর বাঁধনে যখন আমাকে জড়িত কর, তখন তোমাকে আমি জান্‌তে পারি না, সেই আশ্রয়কেই জানি। কিন্তু যখন তুমি সম্মানের আচ্ছাদন থেকে আমাকে দূরে ফেল, তখন সেই বিচ্ছেদের আঘাতে আমার চৈতন্য হয়, আমি তোমার সেই আবেষ্টন থেকে মুক্ত হ'য়ে তোমার মুখ দেখ্‌তে পাই। যখন সম্মান থেকে মুক্ত হ'য়ে তোমার থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াই, তখনই তোমাকে দেখ্‌তে পাই। (৪র্থ স্ট্যাঞ্জা)—শান্তিনিকেতন, ১৩৩০ আষাঢ়।

বলাকা—২৩ নম্বর

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের সবুজপত্রের ফাল্গুন মাসে 'দুই নারী' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি এই কবিতার বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

সৃজনের প্রথম ক্ষণে দুইভাবের নারী অতল অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছিল। একজন সুন্দরী। তিনি উর্বশী, বিশ্বের কামনা-রাজ্যে আধিপত্য করেন।

আরেকজন লক্ষ্মী, তিনি কল্যাণী। একজন স্বর্গের অপ্সরী, আর অন্যটি স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হরণ করেন, আরেকজন পূরণ করেন।

একজন তপস্যাকে ভঙ্গ ক'রে দেন। সেই ভাঙনে, যে-আলোড়ন জেগে উঠ্‌ছে সে যেন তাঁর উচ্চহাস্য। তিনি সুরাপাত্র নিয়ে দুই হাতে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মাদকতাকে আকাশে-বাতাসে বিকীর্ণ করে দিয়ে যান।

তাঁর আগমনে বিশ্ব যেন বসন্তের কিংশুকে গোলাপ ফেটে পড়তে চায়। সমস্তই যেন বাইরের দিকে বিদীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যখন হেমন্তকাল আসে, তখন অন্য মূর্তি দেখি। তখন দেখি, তা ফল ফলিয়েছে, আপনাকে পূর্ণতার ভিতরে সম্বৃত করেছে; তখন বসন্তের আত্মবিস্মৃত অসংযম অন্তরে পরিপাক পেয়ে সফলতায় পরিণত হয়েছে। এক নারী সেই বসন্তের আবেগকে বাইরের তাপে আন্দোলিত করে দিলেন, অন্য জন তাকে শিশিরস্নাত ক'রে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান্ ক'রে তুল্‌লেন।

হেমন্তকালে যখন ফসল ফল্‌ল, তখন তার মধ্যে চঞ্চলতা রইল না, সমস্ত স্তব্ধ হল, তার মধ্যে দক্ষিণ-বাতাসের মাতামাতি থেমে গেল। হেমন্ত সেই আপনার শান্ত সফলতাটিকে বিশ্বের আশীর্বাদের দিকে উর্ধ্বে তুলে ধরে।

পুষ্পের মধ্যে প্রাণের প্রকাশের অধৈর্য আছে। কিন্তু তার এই জীবনের আবেগ তাকে একটি পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—তাকে মৃত্যুর সীমায় গিয়ে পৌঁছতে হয়—তবেই সে চরম সার্থকতা লাভ করে, ফলে পরিপক্ক হয়। জীবন যদি আপনারই সীমা-রেখার মধ্যে পর্যাপ্ত হত, তবে মৃত্যু হঠাৎ এসে তাকে ভয়ানক বিচ্ছেদে নিয়ে যেত এবং মৃত্যু তার একান্ত বিরুদ্ধ হত। কিন্তু মৃত্যুকে যখন কল্যাণের দিক্ দিয়ে দেখ্‌ব, তখন বুঝ্‌ব যে জীবন তার সীমাকে উত্তীর্ণ হ'য়ে অমৃতের মধ্যেই প্রবেশ কর্‌ছে।

সীমার মধ্যে এই অনন্তের আভাস, সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টির মধ্যে অনির্বচনীয়ের প্রকাশের মত। শিল্পীর রচনার মধ্যে যে সংযমের ব্যঞ্জনা আছে তার দ্বারা মনে হয় যে সবটা যেন বলা হল না। কিন্তু সেই বল্‌তে গিয়ে থেমে যাওয়ার মধ্যে প্রকাশের অসম্পূর্ণতা বা অপরিস্ফুটতা নেই; কারণ সেই কবিতা বা চিত্র বলাকে অতিক্রম করে, যা অনির্বচনীয় তাকেই ব্যক্ত করে এবং এই সংযমের সঙ্গে তার বাণীর পূর্ণতার বিরোধ নেই। জীবনের নিত্য আন্দোলনের মধ্যে তখনই অসমাপ্তিকে দেখি, যখন মনে হয় যে মৃত্যু তাকে ভয়ানক নিরর্থকতায় নিয়ে যাচ্ছে। যখন মৃত্যুর মধ্যে জীবনের একান্ত বিচ্ছেদ দেখি

তখনই কাড়াকাড়ি, তখনি বিরোধ ঘোচে না। কিন্তু যখন কল্যাণকে লাভ করি তখন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের পরামার্থতা ও অসীমতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

আমাদের জীবনের এই ব্যঞ্জনারই প্রতীক আমরা প্রকৃতির মধ্যে পাই। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে সেখানে সে আপন চরম অর্থকে লাভ করছে। এক জায়গায় এসে নিরর্থকতার মরুভূমিতে তো সে ঠেকে যায় নি—তাহলে হয় তো মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ হত। কিন্তু সে যখন সমুদ্রে বিশ্রাম পেল, তখনই তার পূর্ণতার উপলব্ধি হল। তাই তার শেষটা ভয়ানক পরিণাম ব'লে বোধ হয় না। সেই গঙ্গাসাগরের সঙ্গমস্থলই অনন্তের পূজামন্দির। কল্যাণী যিনি, তিনি উদ্ধত বাসনাকে সেই পবিত্র সঙ্গমতীর্থে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। একজন সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, অন্যজন তাদের সেখানে ফিরিয়ে আনেন। যেখানে শান্তির পূর্ণতা সেখানে লক্ষ্মীর স্থিতি।

উর্বশী আর লক্ষ্মী, এরা মানুষের দুটি প্রবর্তনার প্রেরণার প্রতিরূপ। সর্বভূতের মূলে এই দুই প্রবর্তনা আছে। একটি শক্তি, সে ভিতরে যা-কিছু প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্‌ঘাটিত করে, এবং আরেক শান্তি, সে অন্তর্নিহিত পরিপক্বতার মধ্যে সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়—তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।

ভাঙা-চোরা যখন চল্‌তে থাকে, জীবনে যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হতে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে। সেই উদ্দাম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু কেবল যদি এই চঞ্চলতাতেই তার সমাধি হত, তবে দুর্গতির আর অন্ত থাকত না। তাই দেখ্‌তে পাই এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে, তিনি বাঁধন-ছাড়া-তানকে শমের দকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ রক্ষা করেন। যে প্রলয়ঙ্করী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি সেই শক্তিই একান্ত হয়, তবেই সর্বনাশ ঘটে। কিন্তু সে ত একা নয়, গতি প্রবর্তিত কর্‌বার জন্যে সে আছে; গতি নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার জন্যে আরেক শক্তি আছে তাকেই বলি কল্যাণী। এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই ত বিশ্বের সৃষ্টি-সঙ্গীত।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' আর 'শকুন্তলা'র মধ্যে এই দুই শক্তির কথা আছে। শিবের তপস্যা যখন ভাঙ্‌ল তখন অনর্থপাত হল, আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। সেই অগ্নি আবার নিব্‌ল কিসে? গৌরীর তপস্যা দ্বারা।

'শকুন্তলা'র প্রথমাংশে ঠিক এই ভাবে ট্রাজেডিকে দেখান হয়েছে। প্রবৃত্তি

শকুন্তলাকে উদ্দাম করেছিল। কিন্তু পরে আবার যখন তপস্যার দ্বারা শকুন্তলা কল্যাণী হয়ে জননী হয়ে শান্তচিত্ত হলেন, তখন তাঁর ইষ্টলাভ হল।

কালিদাসের এই দুটি কাব্যে মানুষের দুই রকমের প্রবর্তনার কথা উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গৌরী আর শকুন্তলা নারী ছিলেন, এটাই কাব্যের আসল কথা নয়—কিন্তু এঁদের উপলক্ষ্য ক'রে শক্তির দ্বিবিধ মূর্তি ফুটে উঠেছে। সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিস। গৌরী অনেক দিন শান্তভাবে শিবের সেবা ক'রে আসছিলেন। কিন্তু যে ধাক্কায় তিনি শিবের জন্যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন, সেই ধাক্কা এল যার কাছ থেকে, তাকে আমরা কল্যাণী বলিনে। তবু সে না হলে শিবকে জাগাবারও উপায় থাকে না। শিব যখন আপনার মধ্যে আপনি নিবিষ্ট, তখন তাঁর থাকা না-থাকা সমান। যে-শক্তি চঞ্চল করে, তাকে বর্জন ক'রে যে শান্তি, সে শান্তি মৃত্যু;—তাকে সংযত ক'রে যে শান্তি তাতেই সৃষ্টি; অতএব তাকে বাদ দেওয়া চলে না।

শকুন্তলা সংসারে অনভিজ্ঞ, তার সরলতার মধ্যে যে-শান্তি সে যেন অফলা গাছের ফুলের মতো। ভরতকে যে চাই। সেই চাওয়ার মূল ধাক্কাটা শকুন্তলাকে যে দিলে সে তাকে দুঃখেই দিলে। কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়ে যখন সে জীবন পরিণতির মধ্যে এসে পৌঁছল তখনি সে সত্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করলে। এই প্রদক্ষিণযাত্রার প্রথম বিপক্ষ বেদনা, শেষ পরি-সমাপ্তিতে শান্তি।

গ্যেটে যে চার লাইনে শকুন্তলার সমালোচনা করেছেন, আমার মনে হয় সেটা তিনি খুব ভেবে-চিন্তেই লিখেছিলেন। একথা আমি আগেও বলেছি। তিনি বলেছেন যে, কালিদাস ফুলকে ও ফলকে, স্বর্গকে ও মর্ত্যকে একত্রিত করেছেন; এর মধ্যে গভীর অর্থ আছে। এটা নিতান্ত কবিত্বের উক্তি নয়। কুঁড়ি থেকে ফোটা ফাউষ্ট্ প্রথমে নির্জনে বাস করছিলেন—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বইয়ের পাতার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। সেই কুঁড়ির মধ্যে পাপের আঘাত ছিল না। তিনি বল্লেন যে এখানেই যদি সব শেষ হল তবে এই দুর্গতির যথার্থ পরিসমাপ্তি হল না;—এবার হাওয়ায় আছাড় খেয়ে সেই ফিরে পাবার পথকে পেতে হবে। সে যদি বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝ'রে পড়্‌ত, তবে তো তাতে ফল ধর্‌ত না, তবে তো সে ফিরে পাবার পথ পেত না। শকুন্তলার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না, জগতের ভাল-মন্দের বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে তপোবনে সখীদের সঙ্গে সঙ্গে সরল মনে আলবালে জল-সেচনে ও হরিণশিশু-প্রতিপালনে নিরত

ছিল। সেই অবস্থায় সে বাইরে থেকে কঠোর আঘাত না পেলে তার জীবনের বিকাশ হত না। যেখানে জীবনের পতন, দুঃখ সেখানে শেষ হ'য়ে গেল। কিন্তু কালিদাস তাকে তা শেষ করতে দেন নি। তিনি Problem of Evil নিয়ে পড়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে জগতে কিছুই স্থির হয়ে নেই, তাই কুঁড়ির থেকে ফুল, তার থেকে ফল হচ্ছে, কোনো জায়গায় ছেদ নেই।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকেরা কালিদাসের এই বইকে নীতি-উপদেশ-মূলক (didactic) বলবে। কিন্তু যা ধর্মনীতির দিক্ দিয়ে ভালো সেও কল্যাণ নীতির দিক্ দিয়ে ভালো হবে না এমন তো কোনো কথা নেই। শিবের সতী সৌন্দর্যেরও সতী। উমা যখন বসন্তপুষ্পাভরণে সেজে এসেছিলেন, তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যমদে বিশ্ব মত্ত হ'য়ে উঠেছিল। উমা যখন তাপসিনী সেজে আভরণ পরিত্যাগ করলেন, তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যসুধায় দেবতা পরিতৃপ্ত হলেন। দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য সত্যের কল্যাণমূর্তিকে যত্নপূর্বক পরিহার করতে চায়, পাছে পাঠকেরা বলে বসে এ মূর্তি সত্য নয়। পাঠকদের চেয়ে বড় হ'য়ে উঠে কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর বলবার সাহস তার নেই। সত্যকে বিরূপ ক'রে দেখিয়ে তবে সে প্রমাণ করতে চায় যে, সত্যের সে খোসামুদি করে না। সত্যের সুন্দর রূপ প্রকাশ করাকে তারা ইস্কুল-মাষ্টারী ব'লে ঘৃণা করে। একথা ভুলে যায়—নীতি-বিদ্যালয়ের ইস্কুলমাষ্টার কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থে পরিণত করে তুলেছে—কবি যদি সেই বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে সত্যের পূর্ণতা দেখাতে পারে তা হ'লেই কবির উপযুক্ত কাজ হয়।

—শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩০

রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁর মতো দুটি চেষ্টা স্বীকার করেন—অবিরাম চলা এবং চলা হইতে মুক্তির অন্বেষণ। বের্গসঁ একটিকে সত্যানুসন্ধান ও অপরটিকে জীবন-ধারণোপযোগী যন্ত্রানুসন্ধান বলেন ; রবীন্দ্রনাথ দুইটিকেই সত্যানুসন্ধান বলেন ও ইহাদের একটিকে 'উর্বশী' ও অপরটিকে 'লক্ষ্মী' নাম দিয়াছেন। উর্বশী ও লক্ষ্মী মানুষের দুটি প্রবর্তনার প্রতিরূপ—একটি শক্তি, ভিতরের প্রচ্ছন্নকে উদ্ঘাটিত করে ; আর একটি শান্তি, সে অন্তর্নিহিত পরিপক্কতার মধ্যে সফলতার পর্যাপ্তিতে লইয়া যায়—তাহার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে। একজন গতি প্রবর্তিত করেন, অপর জন গতি নিয়ন্ত্রিত করেন। এক নারী বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাহিরে বিকীর্ণ করিয়া দেন, অন্যজনা বিশ্বকে শিশিরস্নাত করিয়া অন্তরের

মাধুর্যে ফলবান্ করিয়া তোলেন। যিনি কল্যাণী লক্ষ্মী তিনি উদ্ধত বাসনাকে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরাইয়া আনেন। যেখানে শান্তির পূর্ণতা লক্ষ্মীর স্থিতি সেখানে।

বলাকা—২৪নম্বর

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই?

কবিতাটির বিশ্লেষণ কবি স্বয়ং এইভাবে করিয়াছেন—

মানুষ যে স্বর্গকে খোঁজে, তাকে সে পৃথিবীর বাইরে মনে করে। তাই সেই স্বর্গে পৌঁছবার জন্য সে সমস্ত ত্যাগ করে, সংসার ভাসিয়ে দেয়। যে-স্বর্গকে মানুষ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানে, তা অস্পষ্ট অব্যক্ত সৃষ্টিছাড়া।

(১ম শ্লোক)

আমি অনেকদিন পর্যন্ত সেই সৃষ্টিছাড়া স্বর্গে অব্যক্তের ভিতরে শূন্যে শূন্যে ঘুরেছিলুম। সেই স্বর্গ, যা অস্ফুট ছিল,—যার অবস্থা প্রকাশের পূর্বেকার অবস্থা, তার থেকে যেই আমি মাটিতে জন্মালুম, পরম সৌভাগ্যে এই ধূলো-মাটির মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এলুম, অমনি সুস্পষ্ট রূপলোকে স্থান পেলুম।

আমার এই জন্মলাভ যেন অনেকদিনকার সাধনার ফলে। এই স্বর্গের ধারণা যেন কেবল একটা ইচ্ছারূপে ছিল, তা প্রথমে রূপ ধরে নি।

অনেকদিন পর্যন্ত যেন সৃষ্টিনাট্যের নেপথ্যগত একটি ইচ্ছাস্বর্গের মধ্যেই ঘুরছিলুম। ভাবুকের মনের মধ্যে যখন কোনো একটা ভাব থাকে, তখন সে একটি বৃহৎ অপ্রকাশের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু যেই সে-ভাব একটু রূপ গ্রহণ করল, অমনি অনেকখানি ভাবের নীহারিকা ব্যক্ত আকার ধারণ করল, অতখানি ব্যাপক অস্ফুটতা যেন সার্থক হয়ে গেল। যে-স্বর্গ অব্যক্ত তা অনন্ত অসীম হতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র পরিমাণে রূপ দান ক'রেও অনন্ত ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভ করে। তাই আমার পক্ষে মানুষ হ'য়ে জন্মানো বড় কথা। এই যে আমি আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করছি, তার মধ্যে যেন অব্যক্ত অসীমের সৌভাগ্য বহন করছি। এই যে আমি ধূলোমাটির মানুষ হয়েছি এই হওয়ার মধ্যেই কত যুগের পুণ্য। আমার দেহে স্বর্গ তাই কৃতার্থ।

সেই স্বর্গ আমাকে আশ্রয় ক'রে খেলা করতে পারল। আমাকে নিয়ে যে জন্ম-মৃত্যুর ঢেউ উঠল তার সংঘাতের দোলে সে আপনাকে দোলাতে পারল।

স্বর্গ আমার মধ্যে নিত্য নবীন আনন্দচ্ছটায় লীলায়িত হচ্ছে, আমার ভালোবাসা বিচ্ছেদ-মিলন, লাভ-ক্ষতি এই সমস্তকে আপন খেয়ালে ভেঙেচুরে নানা রঙে বিচ্ছুরিত করছে। (২য় শ্লোক)

স্বর্গ নীরব ছিল, তার মুখে বাণী ছিল না। আমি যেই গান গাইলুম, অমনি সেই স্বর্গ বেজে উঠল। সে আমার প্রাণের গানে আপনাকে খুঁজে পেল। আমার মধ্যে অব্যক্ত আপনার যে লক্ষ্যকে খুঁজছে, তাকে আমার প্রাণের গতির মধ্যে অভিব্যক্তির মধ্যে লাভ করেছে। তাই অসীম আকাশ আজ আমার মধ্যে নিবিষ্ট, তাই আমার সুখদুঃখের ঢেউয়ের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ সংহত।

আজকে দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে শঙ্খধ্বনি উঠেছে সে তো আমার প্রাণেরই ক্ষেত্রে, আমারই মধ্যে। সাগর তার বিজয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে—সে তো বাজছে আমারই চিত্তকূলে। আমি প্রাণ পেয়েছি, চেতনা পেয়েছি, এই জন্যই তো অঙ্গনে অঙ্গনে শব্দলোকের শঙ্খ বেজে উঠল—নইলে বাজবে কোথায়? তাই তো ফুল ফুটেছে। পুরাঙ্গনারা যেমন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে উলুধ্বনি করতে করতে ছুটে আসে, তেমনি আমি আসাতে ফুলের ঝরণা-ধারার মধ্যে হুলস্থুল বেধে গেছে; অনন্ত স্বর্গ মাটির মায়ের কোলে আমার মধ্যে জন্মেছে,—বাতাসে এই বার্তা চারিদিকে প্রচারিত হল। (৩য় শ্লোক)

এ পর্যন্ত এই শ্লোকগুলির মানে যা বললাম তাতে একে একরকম ব্যাখ্যামাত্র করা হল। কিন্তু কবিতা তো তত্ত্ব নয়, তা রস। কবি যে-আনন্দের কথাটা এই কবিতায় বলতে চাচ্ছেন, সে হচ্ছে প্রকাশের আনন্দ।

সন্তান যখন বাপ-মার কোলে জন্মাল, তখন বিপুল আনন্দে ঘর ভরে উঠল,—এ যেমন আমাদের মানবগৃহে, তেমনি অসীমের ক্ষেত্রেও; রূপ যখনই বাস্তব হয়ে উঠল তখনও এই ব্যাপারটি ঘট্‌ছে। বাস্তব হচ্ছে কোন্‌খানে? আমারই চৈতন্যের আলোকিত ক্ষেত্রে। এই জন্যে আমার চোখে যে মুহূর্তে দৃষ্টি জাগল অমনি যেন সোনার কাঠির স্পর্শে একটা সম্পূর্ণ বিশ্ব উঠল জেগে। যেই আমার কানের দ্বারে চৈতন্য এসে দাঁড়াল, অমনি শব্দের জগতে এ কী কোলাহল! এই যে আমার চিত্তের প্রাঙ্গণে প্রকাশের মহামহোৎসব উঠেছে, কবি তারই বিচিত্র বিপুল আনন্দের কথা এই কবিতায় বলেছেন। এর তত্ত্ব কত লোকে কত রকম ক'রে বুঝবে বোঝাবে; কিন্তু এর রসটুকুই কাব্যে প্রকাশ করা চলে।

যা স্পষ্ট নয়, ব্যক্ত নয়, সেই ঠিকানাহীন দেশকে আমি 'স্বর্গ' নাম দিচ্ছি।

পুণ্য সঞ্চয় করলেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে এই কথাই চলতি কথা; কিন্তু আমি বলছি যে, আমি স্বর্গ থেকে পুণ্যের জোরে মর্ত্যে নেমে এসেছি। আমি যখন গণ্ডিবদ্ধ প্রকাশের মধ্যে পরিস্ফুট হলাম, তখনই আমার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও মর্ত্যের মধ্যে স্বর্গ ধন্য হল।

এই স্বর্গমর্ত্যের ভাবটা বহুপূর্বে আমার বাল্যকাল থেকেই আমাকে অনুসরণ করেছিল।

অল্পবয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই আইডিয়ার ব্যাকুলতাকে আমি এক রকম ক'রে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। সন্ন্যাসী বললে—"যে ভববন্ধন সীমার শৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে রাখে, আমি তাকে ছিন্ন ক'রে অসীম প্রাণকে পাবার জন্য তপস্যা করব।"—সে লোকালয়কে তুচ্ছ মায়া, অন্ধতার গহ্বর ব'লে সমস্ত ত্যাগ ক'রে দূরে চ'লে গেল। আকাশের রস-গন্ধ-বর্ণচ্ছটা সব তার চৈতন্যের থেকে অপসারিত হল; সে আপনাকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার ক'রে অসীমকে পাবার জন্য পণ করল। তারপর কোথা থেকে একটি ছোট মেয়ে দেখা দিল; সে নিরাশ্রয় ছিল, সন্ন্যাসী তাকে গুহায় নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধল। তখন সন্ন্যাসীর মনে ধিক্কার হল। সে ভাবতে লাগল যে, এই তো প্রকৃতি মায়াবিনী দূতী হয়ে এমনি ক'রে মেয়েটিকে পাঠিয়েছে, সে সন্ন্যাসীকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন করে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়। এই সংগ্রাম যখন চলছে,—তখন একদিন সে ক্রোধের বশে মেয়েটিকে ত্যাগ করল। মেয়েটি যাকে নিতান্তভাবে আশ্রয়স্থল ব'লে জেনেছে, তার সেই অবলম্বন চ'লে যাওয়াতে সে ছিন্ন লতার মতো লুটিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী যতদূরে স'রে যেতে লাগল, ততই মেয়েটির ক্রন্দন তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হতে লাগল। শেষে মেয়েটি যে বাস্তব, মায়া নয়—তা সে হৃদয়ের বেদনার আঘাতে বুঝতে পারল। মনের এই অবস্থায় সে দূরে দাঁড়িয়ে লোকালয়ের দৃশ্য দেখতে লাগল, —তার মাধুর্যে, মানুষের স্নেহপ্রীতিসম্বন্ধের সরসতায় তার মন ভ'রে উঠল। সে বললে,—"ফেলে দিলুম আমার দণ্ড কমণ্ডলু—দূর হয়ে যাক্ এসব আয়োজন। সীমাকে বর্জন ক'রে তো আমি কোনো সত্যই পাই নি। একটি ছোট মেয়েকে স্নেহ করতে পেরেছিলুম ব'লেই তো সেই রসের মধ্যে অসীমকে পেয়েছি—তার বাইরে তো সেই অনন্তস্বরূপের প্রকাশ নেই!" —এই ভাবটাই আমার নাটিকাটির মূল সুর।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাল্যকালে আমার নানা কবিতায়

ব্যক্ত হয়েছে। সীমার সঙ্গে যোগেই অসীমের অসীমত্ব, একথা ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে। 'অবিদ্যা' বা সীমার বোধকেই একান্ত ব'লে জানার মধ্যে অন্ধ তামসিকতা আছে; আবার অসীমের বোধকেই একান্ত ক'রে দেখার মধ্যেও ততোধিক তামসিকতা আছে; কিন্তু যখন বিদ্যা অবিদ্যাকে মিলিয়ে দেখ্‌ব তখনই সত্যকে জান্‌ব।

সীমাকে নিন্দা করা গায়ের জোরের কথা। ঐকান্তিক (absolute) সীমা ব'লে কিছু নেই। সব সীমার মধ্যেই অনন্তের আবির্ভাবকে মান্‌তে হবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী সীমাকে 'না' করে দেওয়ায় যে মুক্তি, তার মধ্যে দিয়েই সার্থকতাকে চেয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে যায় অন্ধকারে।

তেমনি আবার সীমা-জগৎকে অসীম থেকে বিযুক্ত ক'রে দিয়ে তার মধ্যে বদ্ধ হলে সেও ব্যর্থতা। কাব্যে শব্দকে বাদ দিয়ে যে রসিক রসকে পেতে চায়, সে কিছুই পায় না। আবার রসকে বাদ দিয়ে যে পণ্ডিত শব্দকে পেয়ে বসে তার পণ্ডতারও সীমা নেই।

বলাকা—২৮ নম্বর

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান

কবি বলিতেছেন—আমি যদি পাখীর মতন অচেতন হইতাম, তাহা হইলে আমি যে দান পাইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম; কিন্তু আমার চিত্তের ক্রিয়ার পরিচয় তখনই পাই, যখন আমি দানের চেয়ে অধিক প্রতিদান করি। এই পাওয়ার চেয়ে অধিক দেওয়াতেই সৃষ্টি-শক্তির পরিচয়; যেখানেই আমার চিত্তের ক্রিয়া সেখানেই সৃষ্টি; কেবল গতিতেই সৃষ্টি হয় না।

আমার সৃষ্টি-শক্তি আছে বলিয়াই আমি অসীমকে প্রকাশ করিতে পারি। আমি যদি কেবলমাত্র অসীমের ছায়ামাত্র হইতাম, তাহা হইলে আমার মধ্যে তাঁহার প্রকাশ সম্ভব হইত না।

সুর তোমার দান, কিন্তু আমার গান তদতিরিক্ত প্রত্যর্পণ। মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে রিক্ত হইয়া মুক্তহস্ত তোমার সেবায় নিযুক্ত করার সাধনা আমার নিজস্ব। বন্ধন হইতে মুক্তি আমারই উদ্ভাবনা। ধরণী তোমার সৃষ্টি, কিন্তু স্বর্গ রচনার ভার আমার উপর।—তাই কবি অন্ধকার হইতে আলো ছাঁকিয়া,

মৃত্যু হইতে অমৃত আহরণ করিয়া তাঁহার জীবনের দুঃখভার দিয়া স্বর্গ রচনা করিবেন। কবি বলিয়াছেন—

আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।

অর্থাৎ, তোমার চাওয়ার তাগাদায় মানুষের শান্তি নাই,—তোমার চাওয়ার তাগাদাতেই সে আপনার অন্তর্নিহিত সম্পদ্‌কে ক্রমাগত ব্যক্ত করে।

কবি এই কবিতায় যে কথা বলিয়াছেন, মানুষের ইতিহাসেও এই বাণী নিহিত আছে—পূর্বপুরুষদের কাছ হইতে পাওয়া উত্তরাধিকার আরো বেশি সম্পদ্‌ দিয়া ঐশ্বর্যশালী করিয়া আমাদের উত্তরাধিকারীদের দান করিতে হইবে—এই অধিক দান করিতে পারাতেই মানুষের গৌরব।—

মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

কবি নিজে এই কবিতাটির আলোচনাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইল—

তুমি মানুষ ছাড়া আর-সব জীবকে যেটুকু দিয়েছ সে সেইটুকুই প্রকাশ করে। পাখীকে সুর দিয়েছ, সে সেই বাঁধাসুরের দানটি বারবার ফিরিয়ে দেয়, তার বেশী সে দেয় না। আমাকে তুমি যে-সুর দিয়েছ, সে সুর তোমার, কিন্তু আমি তার বেশী তোমায় ফিরিয়ে দিই—আমি যে-গান গাই, সে গান আমার। (১ম শ্লোক)

তুমি বাতাসকে ধ'রে রাখোনি। তার কোনো বাঁধন নেই, সে অনায়াসে তোমার সেবা ক'রে, বিশ্বকে বেষ্টন ক'রে কাজ করে। আমাকে তুমি যত বোঝা দিয়েছ তাকে আমার ব'য়ে ব'য়ে বেড়াতে হয়। আমার সেই বন্ধন থেকে মুক্তিকে আপনিই উদ্ভাবন করতে হয়। আমি একে একে নানা বন্ধনদশার পাশমোচনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর থেকে মৃত্যুতে আপনাকে রিক্তহস্ত ক'রে ব'য়ে নিয়ে যাব। আমি তোমার সেবার জন্য স্বাধীনতা অর্জন করব। এই হাত-দুটিকে মুক্ত ক'রে তোমার কাজের জন্য নিযুক্ত করব, বলব,—তোমার আদেশে তোমারই কাজে এখন থেকে প্রবৃত্ত হলুম। তুমি আমাকে বন্ধন দিলে, কিন্তু আমাকে ভিতর থেকে মুক্তিতে বিলীন হতে হবে,—আমার কাছে তোমার দাবী বেশী। (২য় শ্লোক)

তুমি পূর্ণিমার হাসি ঢেলে দিয়েছ—ধরণীকে হাস্যময় সৌন্দর্য দান করেছ।

ধরণীর অন্তস্তলে যে-রস নিহিত আছে, সে ফিরে সেই রসকে ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু আমায় তুমি দুঃখ দিয়েছ, তার ভার আমায় বইতে হচ্ছে। সমস্ত জীবনের এই দুঃখকে অশ্রুজলে ধুয়ে ধুয়ে তাকে আনন্দ ক'রে তুলে আমাকে তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে—তোমার কাছে নিবেদন করতে হবে। আমি দিনশেষে মিলনক্ষণে সকল দুঃখকে আনন্দময় ক'রে তোমার কাছে নিয়ে যাব—আমার উপর এই ভার রয়েছে। (৩য় শ্লোক)

তুমি তোমার এই ধরণী মাটি দিয়ে তৈরী করেছ, এই ধরণী আলো-অন্ধকারে সুখ-দুঃখে মিলিত হয়ে রয়েছে। আমায় তুমি এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছ, কিন্তু কিছু সম্বল সঙ্গে দিলে না,—একেবারে হাত শূন্য ক'রে দিয়েছ, আর আড়ালে থেকে তুমি আমায় দেখে হাস্‌ছ। তুমি আমাকে এমনি অবস্থায় মাটিতে রেখে দিয়ে বল্‌লে, "তোমার উপর ভার হচ্ছে—এখানে স্বর্গ রচনা কর্‌বার। তুমি অন্ধকার থেকে আলো উদ্ভিন্ন ক'রে, মৃত্যু থেকে অমৃতকে বহন ক'রে এনে তোমার আপনার জীবন দিয়ে এই মর্ত্যলোকে স্বর্গ গ'ড়ে তুলবে, তোমার উপর এই ভার রইল।" (৪র্থ শ্লোক)

প্রকৃতিতে সব জীবকে তুমি তোমার দানের দ্বারা ভূষিত কর্‌লে এবং যাদের যা দিয়েছ তারা সেই সম্পদ্‌কেই প্রকাশ কর্‌ছে। কেবল আমার কাছে তোমার দাবী রয়েছে, আমার কাছে তোমার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। তাই আমি নিজের প্রেম দিয়ে যে-অর্ঘ্য রচনা ক'রে দিচ্ছি, সেই রত্নের দান তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসে বক্ষে তুলে নাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার পরিমাণ অল্প। কিন্তু আমি যে-দান তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তা অনেক বেশী।

তুমি আমাকে অল্প দিয়ে তোমার জীবলোকে ছোট নগণ্য প্রাণী ক'রে দাওনি। কারণ, আমার প্রতি তোমার যে-দাবীর জোর আছে তাতে আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন তা আমার জীবন থেকে উৎসারিত হয়। আমি কেবল স্বর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তোমার দাবী আছে ব'লে তা সঙ্গীত হয়ে প্রকাশিত হয়। তুমি আমাকে বন্ধন দিয়েছ, কিন্তু বলেছ যে এই বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে ফেল্‌তে হবে। তুমি চাও যে আমি মুক্তি লাভ করি। তোমার দাবী আছে ব'লেই মানুষকে দুঃখের উপর জয়যুক্ত হয়ে সেই দুঃখকে আনন্দধারায় ধৌত ক'রে পূর্ণ ক'রে তুল্‌তে হয়,—মানুষের জীবনের গতি তাই মুক্তির দিকে ধাবিত হয়। কিসে তার দুঃখমোচন হয়, সেই সন্ধানে সে প্রবৃত্ত হয়। তমি পৃথিবীকে আপনি রচনা কর্‌লে, কিন্তু স্বর্গ রচনা কর্‌বার ভার

দিলে মানুষের উ'.র। পৃথিবীতে মানুষের যে সূচনা হল, তাকে তো জ্যোতির্ময় বলা যায় না। কিন্তু মানুষকে সেই শূন্যতা থেকে এই মর্ত্যধামেই অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত স্বর্গ রচনা ক'রে তুল্‌তে হবে। তাই মানুষ স্থির হয়ে বসে নেই—তার বিরাম নেই, শান্তি নেই। তার সঙ্গে তোমার এই যে কঠিন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে তারই তাগিদে সে আপনার অন্তর্নিহিত সম্পদ্‌কে ক্রমাগত ব্যক্ত করে। তাই তোমার জন্য তার যে প্রেমের অর্ঘ্য রচিত হয়, তাকে তুমি বহুমূল্য রত্নের মতো আদরের সঙ্গে বক্ষে তুলে নাও।

মানুষ তার ইতিহাসে যে মূলধন নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে, তার মধ্যেই তো সে থেমে থাকে না। সাহিত্য-রাজনীতি-ধর্ম-কর্মতে সে ক্রমাগত উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছে। মৌমাছিরা যখন চাক বাঁধ্‌তে সুরু করে, তখন যার যে পরিমিত সামর্থ্যটুকু আছে, সে সেই অনুসারে একই বাঁধাপথে কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে কাজে লেগে যায়। কিন্তু মানুষ তো সঙ্কীর্ণ পথে চলে না; তার যে কোথাও দাঁড়াবার জো নেই। তার হাতে যে উপকরণ আছে, তাকে বিশালতর ক'রে তুল্‌তে হয়। সে আপনাকে আরো বিকশিত করবে, সে আরো এগিয়ে চল্‌বে। ইতিহাসে তার এই আহ্বান রয়েছে।

মানুষের বর্তমান ইতিহাসেও এই বাণী রয়েছে। সে অতীত মানবদের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকলে চল্‌বে না—যা পেয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী সম্পদ্‌ দিয়ে তার সাজি ভর্‌তে হবে। মানুষের এই গৌরব আছে। সে পৃথিবীকে সুন্দর ক'রে তুল্‌ল, বল্‌ল—এই মাটির ধরা আমাকে যা দিয়েছে, আমি তার চেয়ে আরো বেশী একে দিয়েছি।

"দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে"—যেখানে অপূর্ণতা সেখানেই শক্তির খর্বতা, সেখানেই দুঃখ। যখন মানুষের বাইরের অবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্য ঘটে, সে জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্যকে পায় না, তখন তার জীবন-বীণা ঠিক সুরে বাজে না। এই যে দুঃখের বাধা মানুষের পথরোধ ক'রে, এরই ভিতর থেকে তাকে পথ কেটে বার হতে হবে। সে শক্তি খাটিয়ে মহত্ত্বকে বাধামুক্ত ক'রে প্রকাশ করবে, সকল আন্তরিক দৈন্য অপসারিত ক'রে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবে—এই তার সাধনা। তার এই গোড়াকার দৈন্যই যদি চরম হত, তবে সে একরকম ক'রে বোঝাপড়া ক'রে নিতে পারত? কিন্তু তার অন্তরে ধর্মবুদ্ধি বা আর কোনো অনুভূতির চেতনা আছে,—যা তাকে ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে, সম্মুখ পানে চালিত করছে।

বলাকা—২৯ নম্বর

যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা

এই কবিতা আগের কবিতার আনুষঙ্গিক। এমন যেন কেউ মনে না করেন যে এতে আমি সৃষ্টির আরম্ভের কোনো বিশেষ সময়কার কথা বলেছি; এতে কোনো সৃষ্টিতত্ত্ব নেই। এখানে 'আমি' মানে ব্যক্তিবিশেষ নয়, 'আমি' মানে হচ্ছে যে-আমি ব্যক্তজগতের প্রতিনিধিস্বরূপ। বিশেষ সময়ে আমি সৃষ্টি হই নি; এমন কোনো এক সময় ছিল যখন আবীঃ যিনি, তাঁর প্রকাশ ছিল না—তা বিশ্বাস করা যায় না।

(১ম শ্লোক)

তুমি যে কোনো সময়ে অব্যক্ত ছিলে তা নয়, কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে আমি কোথাও নেই, তবে সেই অবস্থায় কি রকম হবে এখানে তাই আমি বলেছি। আমি যখন ছিলাম না, তখন তুমি আপনাকে দেখ্‌তে পাও নি। সে অবস্থায় কারো জন্যে তোমার পথচাওয়া ছিল না। এই যে সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে আজ ধীরে ধীরে আমার বিকাশ হচ্ছে, এই যে আমার এই চলার জন্য তোমার অপেক্ষা আছে, এই যে তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকো, তখন এসব কিছুই ছিল না। যখন আমার অস্তিত্ব ছিল না ব'লে আমি কল্পনা কর্‌ছি, তখন এই যে দু'পারের আকাঙ্ক্ষার আবেগের হাওয়া আজ বইছে, তা ছিল না। আজ আমার থেকে তোমার কাছে, আর তোমার থেকে আমার কাছে কিছু কিছু aspiration, আকাঙ্ক্ষা আস্‌ছে-যাচ্ছে—আমাদের উভয়ের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার আসা-যাওয়ার হাওয়া বইছে। কিন্তু সেদিন তা ছিল না—এপারের সঙ্গে ওপারের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

(২য় শ্লোক)

আমার মধ্যেই তোমার সুপ্তির থেকে জাগরণ হল। আমার মধ্যেই বিশ্বের প্রকাশ হল—বিশ্ব যেন ঘুম থেকে উঠ্‌ল। আলোর যে ফুল ফুটল, তা আমার জন্যই বিকশিত হল, নইলে তার দরকার ছিল না। আমাকে তুমি এখানে নিয়ে এসে কত রূপে যে ফোটাচ্ছ তার ঠিক নেই। তুমি কত রূপের দোলায় আমাকে দোলালে—("আমাকে"—অর্থাৎ আমায় নিয়ে যে বিশ্ব, যে দৃশ্য, সেই সকলকে)।

তুমি যেন আমাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিলে। আমাকে এমনি ক'রে ছড়িয়ে

কবি মহাকালকে তাঁহার বার্ধক্যের আর সন্ন্যাসের ছদ্মবেশ ছাড়াইয়া নব-বরবেশে সাজাইয়া দিতেছেন, কবির ইন্দ্রজালে রুদ্রের—

অস্থি-মালা গেছে খুলে
মাধবী-বল্লরী-মূলে ;
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি'।

কবি সন্ন্যাসীর সব চালাকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন—তিনি যে এতদিন সন্ন্যাসের ভান করিয়াছিলেন, সে কেবল প্রিয়ার মনে বিরহ জাগাইয়া মিলনকে নিবিড় ও মধুর করিয়া তুলিবার জন্য। সেই মিলন তো কবি ঘটাইয়া দিলেন—সন্ন্যাসীকে সুন্দর সাজাইয়া। তাহাতে সুখী হইয়া—

কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে ;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশী সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে
কবির পরাণে।

বৃদ্ধ কবি এইরূপে নিত্য-নূতনের চিরযৌবনের অধিকার মহাকালের দরবারে কায়েমী করিয়া লইলেন—তাহাতে দেবী উমার সমর্থন আছে, মহাকালেরও যে বিশেষ কোনো আপত্তি আছে তেমন ভাব তো তিনি দেখান নাই।

ভাঙা মন্দির

মন্দির পরিত্যক্ত ও জীর্ণ ভগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে। সেখানে আর পূজারী তীর্থযাত্রী কেহ আসে না। নাই বা আসিল মানুষ—বিশ্বেশ্বরের বন্দনা ও পূজা এখনো করিতেছে বিশ্বপ্রকৃতি—বনফুল ফুটিয়া দেবতার অর্ঘ্য রচনা করিতেছে, বাতাসের নিঃস্বনে তাঁহার বন্দনা সমীরিত হইতেছে, পাখীরা ভজন গাহিতেছে। দেব-বিগ্রহ চূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই তো সীমার বাঁধন কাটাইয়া ভুবনসুন্দর এই মন্দিরে আবির্ভূত হইয়াছেন।

আগমনী

মাঘ মাস। দারুণ শীত। সব শুষ্ক, পুষ্পপুঞ্জ ঝরিয়া গিয়াছে। সেই শীতের জড়তার মাঝে অকস্মাৎ কোথা হইতে বসন্তের পাগল হাওয়া বহিয়া গেল, আর অমনি গাছে গাছে নবীন কিশলয় উদ্গত হইল, ফুল মঞ্জরিত হইয়া উঠিল, দোয়েল শ্যামা কোকিল কপোত মুহুর্মুহুঃ ডাকিয়া নবীনতার আনন্দের

আগমন-বার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। কবি ইহা দেখিয়া নিজের জরা বার্ধক্য ভুলিয়া যৌবনের আনন্দে উল্লাস অনুভব করিতেছেন। তাঁহার হৃৎকমলে বসন্তের শোভা সুষমা ও মধুসঞ্চয়। কত অব্যক্ত ভাবমঞ্জরী তাঁহার চিত্তকাননে ফুটিয়া ফুটিয়া সৌরভে শোভায় ভরিয়া উঠিয়াছে—কবি অনুভব করিতেছেন—

বনের তলে নবীন এলো, মনের তলে তোর!

আজ যখন বিদায়বেলায় পূরবী-রাগিণীর গেরুয়া সুর গাহিতে গাহিতে কবি পশ্চিম-গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন, তখন এই নব-বসন্তের শুভাগমনে তাঁহার চিত্তাকাশ বিচিত্র-বর্ণ-সুষমায় রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। এবং—

বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে, বাঁধন যাক টুটি'।

লীলাসঙ্গিনী

যে বিশ্ব-রূপ, যে ভুবন-সুন্দর, যে অখিলরসামৃতমূর্তি কবিকে আবাল্য কাজ ভুলাইয়া বিশ্বশোভায় মাতাইয়া ভুলিয়া খেলা করিয়াছেন, যে জীবনদেবতা কবিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এতদূর দীর্ঘজীবনের প্রান্তে লইয়া আসিয়াছেন, তিনিই আজ অকস্মাৎ কবিকে বৃদ্ধবয়সে নানা সৌন্দর্যসম্ভারের ভিতর দিয়া স্পর্শ করিয়া 'কাজের কক্ষ-কোণে' আসিয়া খেলায় যোগ দিতে ডাকিতেছেন। সেই নিরুপমা প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনী তাঁহার খেলার সহচর কবিকে ছাড়িয়া তো বিশ্ব-লীলা জমাইতে পারিতেছেন না। কাজ করিবার যোগ্য কেজো লোক তো জগতে ঢের আছে, কিন্তু সুন্দরের সহিত খেলা করিবার লোক তো কবি ছাড়া আর কেহ নাই। তাই কবি সেই 'চিনি চিনি করি চিনিতে না পারি' গোছের লীলাসঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,
অযাত্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে।
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে!

কবিকে আবার মানস-প্রতিমাগুলিকে কল্পনা-পটে নেশার বরণে রং করিয়া তুলিতে হইবে রসের তুলি বুলাইয়া। কিন্তু সেই মোহিনী নিষ্ঠুরা বার বার কবিকে অসময়েই ডাক দেন, তিনি 'আবার আহ্বান' করিয়াছেন, কিন্তু—

দেখো না কি হায়, বেলা চ'লে যায়—
সারা হ'য়ে এলো দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।

কবি এবার শেষ খেলা খেলিয়া লইবেন মৃত্যুর অজ্ঞাততার মধ্যে। পৃথিবীতে পার্থিব শোভার মধ্যে যাহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পরিচয় হইয়াছিল, সেই লীলাসঙ্গিনীর সহিতই লোকলোকান্তরে অন্য কোন অচেনা স্থানে পুনঃ-পরিচয় হইবে। কবির তো 'নিশীথ-অন্ধকারে অমাবস্যার পারে' যাইতে ভয় বা দ্বিধা নাই, তাঁহার লীলাসঙ্গিনী গোপন-রঙ্গিণী রস-তরঙ্গিণী যে তাঁহার আজীবনের চেনা, এবং তিনি যে কবির প্রিয়, প্রিয়তমা নিরুপমা।

লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতার অনুভূতিকে জীবনে ফিরিয়া পাওয়ার কথা পূরবীর অনেক কবিতাতেই আছে। যিনি নানা অবকাশে ও নানা উপলক্ষ্যে জীবন স্পর্শ করিয়া কবিচিত্ত সৌন্দর্যে ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া তোলেন, তাঁহাকে কবি অনেক দিন যেন হারাইয়া ভুলিয়া ছিলেন। আজ জীবনসন্ধ্যায় সেই হারানিধি আপনি তাঁহার জীবন-নিকুঞ্জের দ্বারে আসিয়া কবির দৃষ্টিপথে পড়িবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন; তাঁহাকে দেখিতে পাওয়ার আনন্দে কবিচিত্ত উল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

বেঠিক পথের পথিক

যিনি অনন্ত-রসময় তিনি তো অচিন্ত্যতত্ত্ব, তিনি তো কোনো সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তাই তিনি বেঠিক পথের পথিক, তিনি অচিন। কিন্তু তিনি তো অবাঙ্‌মনসোগোচর নহেন, তাঁহার সত্তা তো আমরা নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়া, ভাবনা-মননের মধ্য দিয়া, রসাস্বাদনের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি। সেই উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার মতন বচন আমরা পাই না, সেই অ-ধরকে ধরিয়া রাখিবার মতন কোনো বন্ধন আমাদের আয়ত্তে নাই; তথাপি তাঁহাকে চিনি না এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না, আবার চিনি এমন কথাও বলা

যায় না। যেখানে যত কিছু সুন্দর আছে, আনন্দ আছে, দুঃখ আছে, প্রিয় আছে, মিলন আছে, বিরহ আছে, সকলের ভিতর দিয়া তো তাঁহারই স্পর্শ আমরা পাইয়া থাকি। তাই কবি বলিতেছেন যে—

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সেজন যে।
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন কেমন করে।
চরণে তাহার পরাণ বুলাই,
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই;
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অ-ধরা স্বপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে!

বকুল-বনের

বকুল-বনের পাখীর সহিত কবি নিজের সাদৃশ্য অনুভব করিতেছেন—পাখীর মতন কবিও 'অসীম-নীলিমা-তিয়াষী'। চাঁপার গন্ধ, বাতাসের প্রাণ-কাড়া স্পর্শ বারংবার সহজ রসের ঝরণা-ধারার ধারে সহজ সুখের ভরে গান ভাসাইতে কবিকে ডাক দেয়, 'শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে গান বাজে' কবির অধীর মনের মাঝে সেই তাল বাজে। কবি একদিন বালক ছিলেন। তখন হেলাফেলায় সারাবেলা কবির কাটিয়া যাইত।—

বেলা চলে যেতো অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।

তখন—'শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে', তাহা কবির অধীর মনের মাঝে স্পন্দন জাগাইত। সেই বালক আজ কবির মনের গহনে হারাইয়া গিয়াছে, কবি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। কবির সেই বাল্য-লীলার অবসান হইয়াছে, ইহা কবি নিজে স্বীকার করেন না। কবি তাঁহার শেষের গানের সহিত বকুল-বনের পাখীর গানের রাখী বন্ধন করিয়া পারঘাটে খেয়াল-খেয়ায় পার হইবেন; সুরের সুরার সাকী পাখী হইবে তাঁহার শেষ সাথী। তিনি কীর্তি খ্যাতি কর্ম সব তুচ্ছ

করিয়া মুক্ত হইয়া গানের পাখায় উধাও হইয়া অনন্ত আকাশে উড়িয়া যাইবেন। তাঁহার অবসর যেন সহজ ও সুন্দর হয়—

ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝ'রে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চ'লে যাই গান হাঁকি'।

সাবিত্রী

ঋগ্‌বেদ ১।১১৫ সূক্তে বলা হইয়াছে যে—সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুশ্‌চ— সূর্য সমস্ত জঙ্গম ও স্থাবর পদার্থের আত্মা। তিনিই আবার বিশ্বচক্ষু—জাতবেদা —সূর্য উদিত হইলেই সমস্ত পদার্থকে দেখিতে পাওয়া যায়, জানিতে পারা যায়। —ঋগ্‌বেদ ১।৫০।

সবিতা হইতেই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে; তাঁহার কিরণেই বিশ্বসংসার বর্ণ-রূপ-রস-গন্ধে সুন্দর হইয়া আছে। বিশ্বসংসার হইতে তিল তিল করিয়া আহৃত যে সৌন্দর্য কবি-চিত্তে পুনর্বার তিলোত্তমা-রূপে ঘনীভূত হয়, সেই মূর্তিও তো প্রকৃত প্রস্তাবে সবিতারই। সেইজন্য ঋগ্‌বেদে (৩।৬২।১০) সবিতাকে একাধারে জগৎ-প্রকাশক ও মানবের বুদ্ধির প্রেরক বলা হইয়াছে—

তৎসবিতুর্ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

সূর্যই সমস্ত জ্ঞানের আকর—সমস্ত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার মূলে সবিতারই প্রভাব বিদ্যমান। কবি সবিতার মধ্যে একটি সত্তার বা শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, এবং তাহাকেই তিনি বলিয়াছেন 'সাবিত্রী'।

এই কবিতাটি ঠিক সূর্যবন্দনা নয়। সূর্যের সঙ্গে কবি আপন জীবনের একটা যোগ অনুভব করিতেছেন। তাই সূর্যের দেবত্ব তাঁহার বন্দনীয় নয়। সূর্যকে তিনি বন্ধু-রূপে নিজেরই প্রতিরূপ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এই সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—

সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপ-রস, সবই তো উৎস-রূপে রয়েছে ঐ মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌর-জগতের সমস্ত ভাবী কাল একদিন তো পরিকীর্ণ হ'য়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী; আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো

প্রবহমান। বাইরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ঐ তেজই মানস-ভাব ধারণ ক'রে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ঐ যে জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুক মদ হ'য়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হ'য়ে পুঞ্জিত হলো। এখনি আমার চিত্ত হ'তে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময় স্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কার-ধ্বনির মতো সংহত হ'য়ে আছে?

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হ'য়ে গাছ হ'য়ে আকাশে উঠ্‌ছে, বল্‌ছে—জয় হোক! বল্‌ছে—অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও; এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তার ফুল-ফলের বিকাশ! অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝর-ধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা ক'রে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত; প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চল্‌ল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বল্‌ছি—হে পূষণ্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু,—তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাতীত সত্য, তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক। —যাত্রী

আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন—তমসো মা জ্যোতির্ গময়—অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তাঁরা জ্যোতি বলেছেন। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যকে তাঁরা বলেছেন—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—আমাদের চিত্তে তিনি ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করছেন।

ঈশোপনিষদে বলেছেন—হে পূষণ্ তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি।—আমার মধ্যে যিনি, সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।

এই বাদ্‌লার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ, সে ঐ ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বল্‌ছে,—হে পূষণ্, তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি, অবসাদ দূর হোক। আমার চিত্তের বাঁশীতে তোমার আলোকের নিঃশ্বাস পূর্ণ করো,—সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হ'য়ে উঠুক। আমার প্রাণ যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে, তখনি তো ভূর্ভুবস্বঃ দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে। মেঘে মেঘে তোমার যেমন নানা রং, আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেমনি সুখদুঃখের কত রং লাগিয়ে দিচ্ছে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্প-পল্লবের বর্ণে গন্ধে এবং অন্তরের রাগে-অনুরাগে বিচিত্র হ'য়ে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে-দিগন্তে বেজে ওঠে। তেমনি তোমারই গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে ভাষার স্রোতে ছন্দের নাচে ব'য়ে চল্‌ল। এক জ্যোতির এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস! অন্ধকারের সঙ্গে নিত্য ঘাতে-প্রতিঘাতে তার এত নৃত্য, এত গান, তার এত ভাঙা, এত গড়া,—তারি সারথ্যে যুগ-যুগান্তরের এমন রথ-যাত্রা! তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনাই তো গাছ হ'য়ে ঘাস হ'য়ে আকাশে উঠ্‌ছে, বল্‌ছে—অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের

লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুল ফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বলছে—অপাবৃণু—ঢাকা খোলো। জীব বলছে - আমার মধ্যে যে সত্য আছে তার জ্যোতির্ময় পূর্ণ স্বরূপ দেখি। হে পূষণ্, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক—সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই। —যাত্রী

কবিতাটি কবির চিলি-যাত্রার সময়ে হারুনা-মারু জাহাজে মেঘলা দিনে লেখা। কবি জ্যোতিঃস্বরূপ সত্যের প্রকাশয়িত্রী সাবিত্রীকে সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া জ্যোতির কনকপদ্মের মর্মকোষে সৃষ্টির যে উদ্বোধিনী বাণী নিহিত আছে, তাহাকে প্রমুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছেন। বিশ্বপ্রকৃতি কবিচিত্তের খাদ্য জোগাইয়াছে নানা রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির এই সৌন্দর্য ও মাধুর্য কবির কাছে ফুটিতে পারিত না, যদি তাঁহার চোখে সূর্যের আলোর স্পর্শ না লাগিত। সূর্যের চুম্বনে যেমন শস্য উদ্গত না হইয়া পারে না, তেমনি কবির চিত্তবৃত্তিকেও উদ্বুদ্ধ করিতেছে সূর্য। আলোক যেন কবিচিত্ত ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সংযোগসূত্র।

আলোকের স্পর্শে কবিচিত্ত সৌন্দর্য-সম্ভোগের আনন্দকে প্রকাশের আগ্রহে ভরিয়া উঠিয়াছে। কবির মনে ভাবোন্মেষের আবেগ, সৃজনাবেগের অশান্তি, প্রকাশের জ্বালা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই বেদনা হইতেছে অসীম বিশ্বের সহিত নিজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়াস, এবং সেই চরম সত্যের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আকুলতার অনুভূতি।

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

ইহা হইতেছে The divine discontent of the Poet.

সূর্য যেমন জগৎ-সবিতা, কবিও তেমনি বিচিত্র ভাবস্রষ্টা। সূর্য যেন আদি কবি, মানব-কবি যেন সেই আদি-কবির বন্ধু শিষ্য। কবি এই সত্য উপলব্ধি করিতেছেন যে, কবির সকল গানের মূল কারণ হইতেছে আলোক। সুরজ্ঞ যেমন বাঁশী হইতে অপরূপ রাগিণী তুলে, আলোক তেমনি কবির চিত্তবীণায় প্রতিদিন বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিতেছে, এবং সেইজন্যই কবি চারিদিকে সৌন্দর্যের উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন।

কবি অনুভব করিতেছেন যে তাঁহার প্রাণ সূর্যসম্ভব,—

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী।

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে-সুরে প্রভাত-আলোরে,
সেই সুরে মোরে বাজাও। —গীতিমালা

Make me thy lyre, even as the forest is.
—Shelley, *Ode to the West Wind.*

Man is a beautiful hymn of God.
—Anatole France, *Thais.*

যে প্রাণ সূর্য হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া বন্দী হইয়াছে, সেই প্রাণ আশ্বিনের রৌদ্রে শেফালির শিশির-চ্ছুরিত উৎসুক আলোকে বিস্ফুরিত হয়। সূর্যেরই আলোকে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাণশক্তির উৎসব লাগিয়া যায়, কবিচিত্তও সেই উৎসবে মাতিয়া উঠে।

সূর্যের দীপ্তি যেন সূর্যের দূতী; তাহা ভুবন-অঙ্গনে বিচিত্র বর্ণসুষমার রূপ-কল্পনার আল্‌পনা আঁকিয়া তুলে। সেই-সব অপূর্ব রূপচ্ছবি ক্ষণস্থায়ী, ছায়া আসিয়া আলোকের ছবি মুছিয়া দেয়, আলোক আসিয়া ছায়ার ছবি মুছে। সেই-সব খেলা দেখিয়া কবির চিত্তেও নানা রূপের রসের আনন্দের খেলা চলিতে থাকে। নিসর্গের এই আলো-ছায়ার লীলা কবি নিজের অন্তরেও অনুভব করেন; আলো যেমন ধরার বুকে ছবি আঁকিতেছে, কবি-হৃদয়েও তেমনি হাসি-কান্না ভাবনা-বেদনা জাগাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু সেগুলি আলো-ছায়ার খেলার মতন ক্ষণস্থায়ী হোক কবির এই কামনা,—উহারা ক্ষণিকের খেলা করিয়া বিস্মরণের ছায়ায় মিলাইয়া যাক; উহারা যেন মনের উপর ভার হইয়া বসিয়া না থাকে।

কবি বিশ্বের বিশেষ বিশেষ ঋতু ও অবস্থার উপলক্ষে জাগ্রৎ সৌন্দর্যের ও ভাবের আবেষ্টনে বন্দী হইয়া থাকিতে চাহেন না; কারণ, তাহাতে চিত্ত অভিভূত ও অগভীর হইয়া পড়ে, sentiment শেষে sentimentality-তে পরিণত হয়। সমুদ্রের বেলাভূমিতে যত তরঙ্গের চঞ্চলতা, গভীর সমুদ্রে তত নয়।

এই কবিতাটি শরৎকালে রচিত (২৬এ সেপ্টেম্বর, ১০ই আশ্বিন)। সমুদ্রবক্ষে যেই রবির অভ্যুদয় হইল অমনি—

আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা—

হইয়া উঠিল,—"হাসিকান্না হীরা-পান্না দোলে ভালে !"(—রাজা)। সেই সৌন্দর্যের আহ্বানে কবির সঙ্গীত অনন্ত পথের পথিক হইল। কবি অনুভব করিলেন—আমার চলা ক্রমাগত, এবং চলার বেগে নব নব পর্যায়ের সৃষ্টি হইবে। তাই কবির চিত্ত পৃথিবীর হাসি-কান্নার শৃঙ্খলে বন্দী থাকিতে চাহিতেছে না; আলোকের আহ্বানে সে উড়িয়া যাইতেছে সেই জ্যোতির পদ্মকোষে—যেখানে জগতের সমস্ত আলোক জন্মলাভ করিতেছে।

কবি ছড়াইয়া-পড়া আলোকে তৃপ্ত নহেন; তাই তিনি তাঁহার সুরকে অভিসারে পাঠাইয়া দিতেছেন আলোকের দেবতার কাছে—তাঁহার নিজের সত্য-স্বরূপ জানিতে,—তাঁহারই মাঝে কবি নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবেন, অগ্নি-উৎস-ধারায় ধৌত হইয়া কবিচিত্তের সকল গ্লানিমা দূর হইবে। আলোকের স্পর্শে সত্যের উপলব্ধিতে যখন কবিচিত্ত শান্ত সমাহিত হইবে; তখন—

সীমন্তে গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।

ইহাই হইবে কবির চরম পুরস্কার। কারণ, কবির গান তখন সুন্দর হইয়া দেখা দিবে,—সত্যই তো সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য।

Beauty is truth, truth beauty.
—Keats, *Ode on a Grecian Urn.*

A thing of beauty is a joy for ever !
—Keats, *Endymion.*

Light ! More Light ! —Goethe.

The light is in the soul,
She all in every part.
—Milton, *Samson Agonistes.*

বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির বস্তুময় প্রকাশের মধ্যে চৈতন্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেই ভাবের প্রেরণাই কবি রবীন্দ্রনাথের এই সাবিত্রী কবিতাটিকে প্রাণবন্ত করিয়াছে। কিন্তু সবিতার যে সত্তাটি কবির মানস-চক্ষে উদিত হইয়াছে, তাহা মার্তণ্ড নহে, রুদ্রও নহে। তাহা আদিত্যের সংহার-মূর্তি নহে, ভয়ঙ্কর আবির্ভাব নহে,—তাহা আলোকদীপ্ত তেজোময়, জগতের সকল ভাব রস রূপ গন্ধ শব্দ স্পর্শের মূল উৎস, তাহা জ্যোতিঃস্বরূপ।

আহ্বান

রবীন্দ্রনাথ কবি ও কর্মী একাধারে। তাই তাঁহার স্বপ্নলোক কখনো তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, জীবনের উদ্দাম ঘাত-প্রতিঘাত, বিভিন্নমুখ স্বার্থের প্রবল ও উন্মত্ত সংঘাত কবির মনকে আকুল উতলা করিয়া তুলে। তখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে কর্মি-রূপে পাই। মহামানবের ডাকে রবীন্দ্রনাথ কবি-কল্পলোক ছাড়িয়া বাস্তব জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে নামিয়া আসেন; ব্যথিত মানবের বেদনায় ব্যথা অনুভব করেন; এবং বিশ্বের কল্যাণ-বিধানের চেষ্টা করেন। তাঁহার অন্তরের মানবতা কবি-ভাবের উপরে প্রভাব বিস্তার করে; বিশ্ব-প্রেমিকের কাছে আর্টিস্ট্ পরাভব স্বীকার করেন। কবির জীবনে বারংবার এইরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে,—স্বদেশী-প্রচেষ্টায় যোগদান, ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠা, বিশ্বভারতী-স্থাপন, মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনেব সময়ে দেশের জন্য ব্যস্ততা, ইত্যাদি। কিন্তু লোকহিতকর কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা আর্টের স্থান অনেক উচ্চে; হিত-সাধন সাময়িক, আর্ট চিরন্তন—যে অভাব বা দুর্গতি মানুষের উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ করিতে পারিলেই হিতসাধকের কাজ সমাপ্ত হইয়া গেল; কিন্তু আর্ট হইতেছে A thing of beauty is a joy for ever (Keats); সেইজন্য সকল কাজের মধ্য হইতে রবীন্দ্রনাথ বারংবার ফিরিয়া যাওয়ার এক আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন, তাহা সেই চিরন্তনেরই ডাক। তাই কবি যেমন বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে বলিয়া উঠেন 'এবার ফিরাও মোরে!' অথবা বলিয়া উঠেন 'আবার আহ্বান!' 'তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে কেমন ক'রে সইব!'—তেমনি আবার অন্য দিকের ডাকেও বলিয়া উঠেন—'সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' যে বাণী বিশ্বজনকে শুনাইবার জন্য তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই একমাত্র অদ্বিতীয় বাণীর প্রচারই তাঁহারই কাজ, তাঁহার মিশন; অন্য সমস্তই শুধু ক্ষণিকের, চিরন্তনের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। এখানে কবি যাহার আহ্বান শুনিয়াছেন তাহা তাঁহার চিরন্তন-শক্তিরই নব-রূপ!

আহ্বান কবিতাটির মধ্যে একটি বিষাদের ভাব আছে, যাহার জন্ম সৃষ্টির চাঞ্চল্য বা আকুলতার (unrest) মধ্যে। এই চাঞ্চল্য প্রকাশের ব্যথা। কবির মন এক পর্যায় হইতে অপর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন নূতন সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে; এখন কবির মনে আর-একটা নূতন-সৃজনকারী যুগ আসিয়া

আবির্ভূত হইয়াছে ; কিন্তু চাঞ্চল্য শুধু ঘূর্ণীরই সৃষ্টি করিতেছে, তাঁহার মনের সমস্ত ভাব-সম্ভার কেবল কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কোনো বিশেষ আকার ধারণ করিতেছে না। কবি যখন চিত্তের ভাবৈশ্বর্য-নীহারিকাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিবেন, তখন তাঁহার এই ব্যাকুলতা শান্ত হইয়া যাইবে। তখন সাহিত্য-সৌরজগতে এক নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইবে, যাহার ভাস্বর জ্যোতি দেখিয়া বিশ্বমানব মুগ্ধ হইবে, কত পথিক প্রাণ-পথের নির্দেশ পাইবে। এই সৃষ্টির ব্যথা ও আকুলতা প্রত্যেক নূতন ভাবসৃষ্টির পূর্বে কবি-চিত্তকে বিমথিত করিয়াছে। —(তুলনীয় : জীবনদেবতা ভাবের ও নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি ভাবের কবিতাবলী।) কবি ব্যথিত স্বরে বলিয়াছেন—'যখন তুমি বাঁধ্‌ছিলে তার সে কী বিষম ব্যথা।' সন্তানের জন্মের পূর্বে মায়ের মনে যেমন একটা চঞ্চলতা ব্যাকুলতা জাগে, কষ্টকর অনুভূতি জন্মে, এও তেমনি,—কবিতাগুলি কবির মানস-সন্তান বৈ তো আর কিছু নয়! (তুলনীয় ও দ্রষ্টব্য—অশেষ।)

কবির যিনি জীবনদেবতা, অন্তর্যামিনী, প্রতিভা, লীলাসঙ্গিনী, দোসর—তিনি যেমন কবিকে ডাক দিয়া বাঁধা গণ্ডি হইতে বাহিরে লইয়া যান, কবিও তেমনি তাঁহাকে খুঁজিয়া ফিরেন,—উভয়ের মিলনের আগ্রহে থাকিয়া থাকিয়া উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। সেই কবি-প্রতিভার দ্বারাই কবির পরিচয়; মানুষ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কবি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ পরিচয় আছে ; সেই কবিত্বের অনুপ্রেরয়িত্রীর দ্বারাই কবি নিজেকে কবি বলিয়া জানেন এবং বিশ্বের কাছেও তাঁহার পরিচয় দেওয়া ঘটে। যাহা কিছু নূতন অনুপ্রেরণা তাহাকেই কবি তাঁহার প্রণয়াভিসারিকা-রূপে দেখিতেছেন।

মানুষ রবীন্দ্রনাথ তো সাধারণ সহস্রের একজন মাত্র—তেমন ধনিপুত্র সুপুরুষ তো আরো অনেকে আছেন। সেই রূপে তাঁহার কোনো বিশেষত্ব নাই। কিন্তু যেই সেই মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কবিত্বশক্তি স্পর্শ করে, যেই তাঁহার কবিপ্রতিভার অনুপ্রেরণা তাঁহাকে অপূর্ব সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে, অমনি তিনি সহস্র সহস্র জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক্ হইয়া যান—তিনি রাম শ্যাম যদু হরি হ্যারী ডিক টম আবদুল গফুর প্রভৃতি হইতে পৃথক হইয়া কবিগোষ্ঠীতে স্থান লাভ করেন, এবং সেখানেও একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মানের সিংহাসন অধিকার করিয়া মহিমামণ্ডিত হইয়া বসেন।

কবি নিজের কবিত্ব-শক্তির সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিতেই তাঁহার আত্মোপলব্ধি হয়, কবি অনুভব করেন,—'আছি, আমি আছি!' এবং সেই 'আমি আছি'-

বোধ জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়া কবির জীবনের প্রতি মুহূর্ত অমরত্বের আনন্দে মণ্ডিত করিয়া দেয়। কবিপ্রতিভা যেই কবিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে, অমনি অব্যক্ত ব্যক্তি সুপরিব্যক্ত হইয়া উঠেন, অখ্যাত ব্যক্তির খ্যাতিতে জগৎ প্লাবিত হইয়া যায়।

নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে আসিয়া যখন ঊষা তাহার উদ্বোধিনী বীণায় আলোক-রশ্মির হাজার তার বাজাইয়া তুলে এবং আলোকের বর্ণে বর্ণে অমরাবতীর গান রচনা করে, তখন যেমন বিশ্বপ্রাণের মধ্যে প্রকাশব্যগ্রতা ও চাঞ্চল্য জাগ্রৎ হইয়া উঠে, সামান্য ধূলাও যেমন শ্যামল সরসতায় ঢাকিয়া যায়,—তেমনি এই কবি-প্রতিভাও 'আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, দেবতার দূতী'-কে 'মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে' বহিয়া আনে, এবং যাহা ছিল নশ্বর মরণধর্মী তাহাকে অমর করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথ যদি হাজার হাজার জমিদারের মতন কেবল জমিদার-মাত্রই হইতেন, তবে অন্যান্য জমিদারদের নাম যেমন কেহ জানে না, মনে করিয়া রাখে নাই, তাঁহারও সেই দশা হইত; কিন্তু যেই তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভা কবি করিয়া তুলিল, অমনি তিনি অমর হইয়া গেলেন, মরণধর্মী মানব হইয়া গেলেন অমর কবি।

অমনি সেই কল্যাণী দেবদূতীর আশীর্বাদ কবির উপর নামিয়া আসিল,—

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে;
মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।

যাহা কিছু কবির মনে অনুভব জাগায় তাহাই তো তাঁহার বেদনা। সেই বেদনা হইতেই তো কবির সৃষ্টি। যিনি ছিলেন অখ্যাত অজ্ঞাত সামান্য, তিনি সেই অজানার আবরণ উন্মোচন করিয়া দীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন কবি হইয়া—

সুপ্তির তিমির-বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস।

সেই কবি তেজস্বী, তাপস, বীর; অসত্যকে তিনি হনন করেন, মুক্তির মন্ত্রে তিনি বজ্রকে বশ করেন—কঠিন সাধনা তাঁহার।

কবির সেই অনুপ্রেরণা, প্রতিভা, লীলাসঙ্গিনী, দোসর, কত বার কবির প্রাণে অভিসারিকা-বেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল; আজ আবার কবি তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন—তাঁহার চিত্তপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার

হৃদয়-বীণা নীরব হইয়াছে, সেই অভিসারিকা আসিয়া এই দীপের মুখে শিখা জ্বালাইয়া তুলিবে, এই বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিবে। কবি চিরন্তনী কবিত্ব-শক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবিতার সকল উপকরণ প্রস্তুত, সেই অভিসারিকা আসিলেই তাহাকে প্রকাশের সার্থকতা দান করিতে পারিবে।

নূতন ভাব ও নূতন সৃষ্টি-নৈপুণ্য-প্রকাশের ব্যথা বেদনা ও ব্যগ্রতা বুকে লইয়া কবি বিনিদ্র অতন্দ্র হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন,—কবে তাঁহার কাছে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর চরম আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইবে—সর্বোত্তম অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠতম অপূর্ব কাব্য-সৃষ্টির আহ্বান—*the best creative call in the poet's mind*—কবে আসিয়া উপস্থিত হইবে? কবি তো জানেন 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বল্‌বে?' 'শেষের মধ্যে অশেষ আছে'; তাই তাঁহার শেষ গান চরম ও পরম সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়া পূর্ণ তানে গাওয়া হয় নাই, তাঁহার মন One Word More বলিবার প্রতীক্ষায় তাঁহার অনুপ্রেরণার দিকেই তাকাইয়া আছে—কোথায় সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা যাহা কবিকে শেষবারে পরিপূর্ণতা চরমোৎকর্ষ দান করিয়া যাইবে। কবির যে সমস্ত ক্ষণ নিষ্ফল বন্ধ্যা অনুর্বর——uninspired moments—তাহারই প্রান্তে কোথায় সেই অভিসারিকা বিলম্ব করিতেছে?

অপ্রকাশের অন্ধকার কালো চক্ষের মধ্যে মহেন্দ্রের বজ্র হইতে বিদ্যুতের আলো প্রকাশিত হইয়া উঠুক। কবির চিত্ত কবিত্ব-সুধা বর্ষণের জন্য কাঙাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে প্রকাশের ব্যগ্রতা সঞ্চারিত হোক। কবির যে দান-শক্তি অপ্রকাশের কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া আছে, তাহাকে মুক্তি দান করুক সেই অভিসারিকা। কবি তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার যাহা দিবার তাহা দান করিয়া রিক্ত হইতে পারিলে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচেন। নূতন সৃজনীশক্তি কবিকে সার্থক করিয়া তুলুক।

কবির জীবন-সায়াহ্নে কবিকে দিয়া শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি করাইয়া কবি-প্রতিভা যদি বিদায় লয়, তাহাতে কবির কোনো ক্ষতি নাই, জগতেরও কোনো ক্ষতি নাই। তখন আর দিবার কিছু থাকিবে না বলিয়া বিধবার মতন শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া বিরহ শান্ত সুগম্ভীর ভাবে শূন্যতার মধ্যে দেখা দিবে। জীবনের শেষ মুহূর্তে যাহা সৃষ্টি করা হইবে তাহা কবির শেষ লাভ। কবির জীবন-পরমায়ু আরো দীর্ঘতর হইলে কবি হয়তো আরো অনেক কিছু নূতন ও উত্তম সৃষ্টি করিতে পারিতেন; কিন্তু জীবন শেষ হইয়া যাওয়াতে তাহা পারিলেন না

বলিয়া যাহা তাঁহার সর্বশেষ ক্ষতি হইল, সেই সমস্তই শেষ চরিতার্থতায় আনন্দময় হইয়া উঠিবে—জীবনদেবতার অরূপ-সুন্দর আবির্ভাবে কবির দুঃখ সুখ স্বচ্ছ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

কবি জীবন-পথের পান্থ। তিনি তাঁহার যাত্রা-সহচরী লীলাসঙ্গিনী দোসরকে সন্ধান করিতেছেন জীবন-পথের প্রান্তে উপনীত হইয়া। কিন্তু সেই যাত্রা-সহচরীর স্বর্ণরথ কোন্ সিন্ধুপারে যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনো উদ্দেশ কবি পাইতেছেন না—তিনি তাঁহার শেষজীবনে মনের মধ্যে কবিত্বের অনুপ্রেরণা অনুভব করিতেছেন না।

কবি তাঁহার অন্তরের গহন-বাসিনী নব-মানসীকে শেষ-পূজারিণী নামে অভিহিত করিতেছেন—সেই যে কবি-প্রতিভার অনুপ্রেরণা তাহা নূতন নূতন কবিতা গান সৃষ্টি করিয়া কবিকে সম্মানিত সংবর্ধিত করে—সেই পূজারিণী কবির চিত্তকাননে গানের ফুল ফুটাইয়া, তাহাতে অর্ঘ্য রচনা করিয়া কবিকে পূজা করে—মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নহে, রবীন্দ্রনাথের অন্তরের চিরদিনের কবিকে। যিনি ছিলেন কবির জীবনদেবতা, অন্তর্যামিনী, নিষ্ঠুরা স্বামিনী, তিনি এখন হইয়াছেন শেষ-পূজারিণী—তিনি এই শেষবারে কবির চিত্তকাননের পুষ্প চয়ন করিয়া কবিকে শেষ পূজা করিয়া লইবেন, কবির এই শেষ অনুপ্রেরণায় কবিকে বরণ করিয়া লইবেন।

যেদিন কবি শেষ গান রচনা করিবেন তাহার পরে যদি আর একদিনও জীবিত থাকেন তবে সেই দিনেও তো কোনো নূতন সৃষ্টি করিতে পারিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইতেছে, এমন কি মরণের মুহূর্তেও তো কোনো নূতন সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। অতএব কবি যাহাকে শেষ রচনা বলিতেছেন তাহা বাস্তবিক শেষ নহে, অশেষের মধ্যে এক স্থানে স্থগিত হইয়া থামা মাত্র। সেই জন্য কবি বলিতেছেন যে তাঁহার শেষ-পূজারিণীর—

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হলো তুলে'।

কিন্তু কবির প্রেয়সী লীলাসঙ্গিনী যাত্রা-সহচরী মরণের কূলে—ঠিক মরণ-মুহূর্তে—কবিকে দিয়া কিছু রচনা করাইয়া লইবার—কবিকে কবি বলিয়া বরণ করিয়া লইবার কোনো আয়োজন কি করিয়া রাখেন নাই? আর, মরণের পথের মরণোত্তর কালে অন্য কোনো লোকে কবি যখন পুনর্জন্ম লাভ করিবেন, তখন কি সেখানে

সেই নব-জীবনে তিনি আবার নূতন কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন? পূরবীর রাগিণী কি প্রভাতী ভৈরবীতে পরিণত হইয়া সেই জন্মের নীরবতার বক্ষে নব ছন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতে সমর্থ হইবে না?

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭, ২৪এ মে ১৮৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথ চৌধুরীকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি তাঁহার কাব্যজীবনের একটা বিশ্লেষণ দিয়াছিলেন। তাহা হইতে 'শেষ পূজারিণী'র ভাবটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

আজকাল যে-সকল কবিতা লিখ্‌ছি, তা 'ছবি ও গান' থেকে এত তফাৎ যে আমি ভাবি আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্ছে না, ক্রমাগতই পরিবর্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারছি, আমি যেন আর-একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চলবে তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা তো পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারই জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্তন দেখ্‌লে ভয় হয় যে, এতকাল ধ'রে এতগুলো যে লিখ্‌লুম, সেগুলো কিছুই হয় তো টিক্‌বে না—আমার নিজের যেটা চরম অভিব্যক্তি সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে, কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে, তবু মোটের উপর মন থেকে এই আত্মবিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্টকাল বেঁচে থাকি, তা হ'লে এমন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌঁছব, যেখান থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। —সবুজপত্র, ১৩২৪

ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যিনি কবিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে উত্তীর্ণ করিয়া আনেন, তিনিই শেষ-পূজারিণী। কবি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে কবে কখন করিবেন তাহার তো নিশ্চয়তা নাই, তাহা মৃত্যুর মুহূর্তেও হইতে পারে। কাজেই সেই কবির অন্তর্যামী জীবন-দেবতা যিনি কবির লীলা-সঙ্গিনী ও দোসর, তিনিই কবির শেষ-পূজারিণী।

লিপি

এই কবিতাটির আবির্ভাব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং তাঁহার যাত্রী পুস্তকে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীর মধ্যে লিখিয়াছেন—

র, ১৯২৪। হারনা-মারু জাহাজ। এখনো সূর্যও ওঠেনি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে।...সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে ম'জে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনি ভেসে উঠ্‌ল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো বারে বার?

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে।······

সমুদ্রের দূর তীরে যে-ধরণী আপনার নানান্-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে মুখ ক'রে একলা ব'সে আছে, ছবির মতো দেখ্‌তে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খ'সে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধ'রে সে একমনে পড়্‌তে ব'সে গেল······।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিনই সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি আর দর্‌কার নেই। সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়, তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভ'রে গেছে।

ধরণী পাঠ কর্‌ছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখ্‌ছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে, কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হ'য়ে উঠ্‌ল। বনে বনে হলো গাছ, ফুলে ফুলে হলো গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হলো নিঃশ্বসিত। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ।······এতেই দুলে উঠ্‌ল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হলো ঋতু-পর্যায়,······যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন মাটির আড়ালে চ'লে যায়; মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক ক'রে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে উত্তাপটা ফেরার হয়েছে ব'লে সেদিন রব উঠ্‌ল, সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে পড়া বীজের দরজায় ব'সে ব'সে ঘা দিচ্ছিল। এমনি ক'রেই কত অদৃশ্য ইসারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ চোর-কোঠায় গিয়ে ঢোকে; সেখানে কার সঙ্গে কি কানাকানি করে জানিনে; তার পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে 'এসেছি'।

······কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার এক প্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে? স্বর্গ-মর্ত্যের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তা ছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠ্‌ছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক, কানে-কানেই হোক, মনে-মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে-চিঠি চলে, সেও ঐ বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

হে ধরণী, তুমি সমস্ত কিছু ধারণ করিবার জন্য প্রভাতের মর্মবাণীতে ভরা

একই লিপি প্রতিদিন পাঠ করো কত সুরে—আলোকই তো নানা রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ হইয়া উঠিতেছে।

বহু যুগ পূর্বে নীহারিকার অস্পষ্টতা হইতে তোমার উদ্‌ভব হইয়াছে, অমর জ্যোতির মূর্তি সূর্য তোমার চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল, তোমার বক্ষে তৃণ-রোমাঞ্চ হইল। পরম বিস্ময়ে পর্বতের সু-উচ্চ চূড়ায় প্রভাতের প্রথম আলোক-সম্পাত হইল এবং তুমি তাহাকে বরণ করিয়া লইলে। আলোকের তাপে বায়ু সমীরিত হয়, বাতাসের প্রেরণায় সমুদ্র চঞ্চল হয় এবং বন মুখর হইয়া সন্‌সন্‌ শব্দ করিতে থাকে। একই আলোক বিশ্ব-চরাচরে জাগরণ আনিয়া দেয়।

আলোকের সেই প্রথম দর্শনের বিস্ময় ধরণীর এখনো কাটে নাই—ধরণীর ধূলি তৃণ-রূপ কণ্ঠস্বর তুলিয়া সেই আলোকের জয় ঘোষণা করে। 'সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে।' আলোকই প্রাণের আকর। সেই প্রাণপ্রবাহে ক্রমাগত সৃজন ও প্রলয় খেলা করিয়া চলিয়াছে, রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ হইতেছে মৃত্যু, ধ্বংস, প্রলয়; সেই বিস্ময় নূতনের সহিত মিলনের সুখের মধ্যে এবং পরিচিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের দুঃখের মধ্যে এক আলোকেরই জয়গান করিতেছে।

ধরণী ও সূর্যের মাঝখানে 'আকাশ অনন্ত ব্যবধান'। এই ব্যবধান আছে বলিয়াই তো পরস্পরের মধ্যে এত মিলন-ব্যগ্রতা, এত দেওয়া-নেওয়া। বিরহ আছে বলিয়াই তো লিপি লিখিতে হয়; মিলন থাকিলে তো পত্র-প্রেরণের আবশ্যকই থাকে না। নীল আকাশখানি যেন নীল কাগজ, এবং তাহাতে অগ্নির অক্ষরে তারকা দিয়া লেখা অমরাবতীর বার্তা। (তুলনীয় জ্ঞানদাস বঘৌলীর কবিতা, উৎসর্গের চিঠি কবিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) বিরহিণী ধরণী সেই লিপি-খানি বক্ষে ধারণ করে এবং তাহাকে শ্যামলতায় ভূষিত করে—আলোকই ধরণীর বক্ষে উদ্ভিদ্‌ হইয়া উদয় হয়। সেই আলোক-লিপির বাক্যগুলিই ধরণী পুষ্পদলে রাখিয়া দেয়, পুষ্পের বুকের মধ্যে মধুবিন্দু করিয়া তুলে, পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধে পরিণত করে। প্রেম ও কবিত্বের সঙ্গে গোপনতার ও মৌনতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—রূপদর্শনমুগ্ধা তরুণীর চোখের গোপন অন্ধকারে তাহার প্রিয়ের রূপচ্ছবিকে ধরণীই লুক্কায়িত করিয়া রাখে—আলোকই তো তাহার প্রিয়জনের রূপ হইয়া ফুটিয়া উঠে। সেই আলোকলিপির বাণীই সিন্ধুর কল্লোলের কারণ, পল্লব-মর্মরের কারণ, নির্ঝরের নিরন্তর ক্ষরণের কারণ।

সেই বিরহিণী ধরণী আলোক-লিপির যে উত্তর সৃষ্টির প্রথম হইতে লিখিতেছে,

তাহা আর আজ পর্যন্ত শেষ হইল না,—কত কত রকমের উদ্ভিদের উদ্ভব হইল, বিলয় হইল, কত কত জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইল। যুগে যুগে নব নব স্থষ্টির আর অন্ত নাই। ধরণী আলোকের উত্তরে যাহা এক যুগে সৃষ্টি করে, তাহা অন্য যুগে ধ্বংস করিয়া আবার নূতন সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করে। যাহা তৈয়ারী করিতেছে তাহা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট হইতেছে না মনে করিয়া ধরণী 'আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে' পুনঃপুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস—ধ্বংস এবং সৃষ্টি করিতেছে।

আলোক-লিপির ফলে ধরণী-বক্ষে যত শোভা আনন্দ প্রেম প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই কবি ও শিল্পীদের অন্তরে প্রবর্তনা জোগাইয়াছে—তাঁহারা যেন ধরণীর অন্তরের কথা অনুমানে বুঝিয়া তাহার হইয়া আলোক-লিপির জবাব লিখিতে চাহিতেছেন। যেন একটি অল্পশিক্ষিতা তরুণী তাহার প্রিয়তমের পত্র পাইয়া খুব ভালো করিয়া উত্তর লিখিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তাহার হাতের লেখা খারাপ হইতেছে, বর্ণাশুদ্ধি ঘটিতেছে, কথা তেমন কবিত্বময় হইতেছে না, এবং সে নিজের অক্ষমতায় অসন্তুষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ সেই লেখা চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, আবার নূতন করিয়া চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এবং সেই-সব ছেঁড়া-চিঠির টুক্‌রা ধরণীর স্তরে স্তরে ফসিল হইয়া জমিয়া উঠিতেছে। সেই অক্ষমা তরুণীর আগ্রহ দেখিয়া কবি ও শিল্পীরা দয়ার্দ্র হইয়া তরুণীর জবানী একখানি ভালো চিঠি লিখিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু তাহাও তাঁহাদের অথবা ধরণীর মনঃপূত হইতেছে না; কাজেই নব নব কবি ও শিল্পীর চেষ্টার আর বিরাম নাই। কবির চিত্ত যেন বাঁশী; নানা ভাবের প্রকাশ তাঁহার সুর; ধরণীর অব্যক্ত আকূতিই যেন কবি-চিত্তে সুর হইয়া বাজিতেছে। ধরণীর এই প্রিয়তমের লিপির উত্তর দিবার আকূতিই কবির কাব্য-প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলুক, কবিকে নূতন সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জোগাক। ধরণীর সকল ঋতুর সকল সৌন্দর্য-সম্ভার কবির ছন্দের দোলায় চাপিয়া বিরহিণী ধরণীর প্রিয়মিলন-দৌত্যে যাত্রা করুক!

ধরণী বসুধা হইলেও মর্ত্য, অসম্পূর্ণ, নশ্বর; আর স্বর্গ শাশ্বত সম্পূর্ণ। যাহা অসম্পূর্ণ তাহার অন্তরে নিরন্তর ক্ষুধা জাগিয়া থাকে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবার। সেই যে উগ্র আকাঙ্ক্ষা আরো ভালো হইয়া উঠিবার, অনায়ত্তকে লাভ করিবার, গণ্ডিকে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইয়া অজানা রাজ্যে প্রবেশ করিবার, লব্ধ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিবার, তাহাই কবির চিত্তে সংক্রামিত হইয়া কবির বাণীকে জ্বালাময়ী করিয়া তুলুক।

বাতাস

এই কবিতাটি ১৩৩১ সালের চৈত্র-সংখ্যার বঙ্গবাণীতে ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাতাস গোলাপকে, পাখীকে, অরণ্যকে বলিতেছে আমি তোমাদের কাছে তাঁহারই বাণী বহন করিয়া আনি যাঁহাকে তোমরা সকলে না বুঝিয়া খুঁজিতেছ—যিনি জগৎপ্রাণ, যিনি অনন্ত, যিনি অজানা, আমি সেই সীমাহীনের বাণী; আমি তাঁহার পূর্ণতার সুখ, অজানার আভাস তোমাদের বুকের কাছে পৌঁছাইয়া দিই।

পদধ্বনি

কবিকে যেমন তাঁহার জীবনদেবতা তাঁহার আরাম বিশ্রাম ছাড়াইয়া সন্ধ্যা-কালে 'আবার আহ্বান' করিয়াছিলেন, শঙ্খ ধূলায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কবিকে যেমন অসময়ে আরাম বিশ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবারও তেমনি কবি অনুভব করিতেছেন যে, তাঁহার জীবনদেবতার পদধ্বনি তাঁহার মনের দ্বারে বাজিতেছে, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধন-মোহ, এ রাত্রি-বেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান্-খেলায়?

কবি পূর্বেও বলিয়াছেন—

হবে হবে হবে জয়, হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী। —অশেষ

তেমনি এবারও বলিতেছেন—

ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারংবার
জীবনে আমার।

দোসর

কবির যিনি দোসর লীলাসঙ্গিনী যাত্রা-সহচরী জীবনদেবতা, তিনি কবির একক জীবনের চিরসঙ্গী; তিনি কবির সহিত কত ভাষায় কত ছন্দে কথা কহেন;

তিনি তো ভুবনলক্ষ্মী হইয়া সকল বিশ্বশোভার ভিতর দিয়া কবিকে তাঁহার দিকে আহ্বান করেন। আজ জীবন-সায়াহ্নে কবি সেই দোসরকে সুস্পষ্ট মিলনে নিকটে দেখিতে চাহিতেছেন। যিনি এক অদ্বিতীয়, সেই একের সহিত একাকী কবির মিলন পূর্ণ হোক, কবির হৃদয়ের ভক্তি ও আত্মসমর্পণ তাঁহার দোসর নিজের হাতে তুলিয়া লউন—

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাওনা দেখা
সময় হলো একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হোক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার॥

কৃতজ্ঞ

এই কবিতাটির সঙ্গে বলাকার 'ছবি' কবিতার ভাব-সাদৃশ্য আছে। কবি যে প্রথমা প্রিয়াকে একদিন ভালোবাসিয়া বিশ্বকে মধুর দেখিয়াছিলেন, কত কবিতার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই প্রিয়াকে যদি ভুলিয়াই থাকেন, তবু তাঁহার জীবনে সেই প্রিয়ার আবির্ভাব তো ব্যর্থ হয় নাই, বরং কবিকে সেই আবির্ভাবই কবি করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য কবি ভুলিয়া-যাওয়া প্রেয়সীর কাছে কৃতজ্ঞ।

মৃত্যুর আহ্বান

১৯১২ সালে কবি যখন অসুস্থ শরীর লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে কবি আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিয়াছিলেন—তোমার এতে আপত্তি কি? জানো তো রবি পশ্চিমেই অস্ত যায়। আর আমাদের দেশের চিরকালের ব্যবস্থাই এই যে, মৃত্যুর সময়ে কাহাকেও ঘরে পুরিয়া রাখা হয় না; তাহাকে মুক্ত প্রাঙ্গণে আকাশের তলে বাহির করিয়া রাখা হয়। যখন মানুষের জন্ম হয়, তখন সে আসে গৃহের কোলে গৃহের অতিথি হইয়া; আর যখন মৃত্যু আসে তখন সে অনন্তের যাত্রী। মৃত্যুর সময়ে ঘরের মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিলে, ঘরের বস্তুর মমতা যাত্রায় বিঘ্ন ঘটায়—এই আমার ঘর, আমার বিছানা, আমার বাক্স, আমার আত্মীয়, আমার

প্রভাতী

চপল ভ্রমর কবির কাব্য-শতদলের মধুপ, দরদী সমঝ্‌দার। স্রষ্টার সৃষ্টি তখনই সার্থক হয়, যখন তিনি একজন রসজ্ঞ মরমী সমঝ্‌দার পান। কবি ও শিল্পী চাহেন রসজ্ঞের রসানুভব ও সমাদর।

কবির কাব্য-শতদল ভ্রমরকে আহ্বান করিতেছে, প্রভাত শীঘ্রই সন্ধ্যার অন্ধকারে আবৃত হইয়া যাইবে, তাহার আগে সময় থাকিতে থাকিতে শতদলের মর্মকোষের মধুসঞ্চয় সার্থক করিতে হইবে।

শতদল প্রস্ফুটিত হইবার আগে তাহাকে কিছুদিন কোরক অবস্থায় অপ্রকাশের দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আজ তাহার সেই গোপনে কাঁদার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিখিল ভুবন প্রকাশের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছে।

গগন যেন একটি নীল পদ্ম, শতদল পদ্ম; তাহার আহ্বানে সোনার ভ্রমর সূর্য তাহার বুকে আসিয়া জুটিয়াছে। গগনের মতন কবির চিত্ত-শতদলও প্রভাত-আলোকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সেও তাহার রূপ রস গন্ধ লইয়া রসজ্ঞ সমঝ্‌দারের প্রতীক্ষায় আছে।

চিত্তে কোনো ভাব সঞ্চিত হইলে, তাহার প্রকাশের জন্য ব্যগ্রতা জন্মে। কবির চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। কবি তাঁহার কাব্যের মর্মজ্ঞকে ডাকিয়া বলিতেছেন —তুমি এস, এবং আসিয়া সেই ভাব-সম্পদের রসাস্বাদ করো, তুমি না আসিলে আমার সকল আয়োজন ব্যর্থ হইবে।

অনুকূল অকৃপণ মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে, তুমি এখন কৃপণ হইয়া দূরে থাকিয়ো না। আমার মন বিলাইয়া দিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া আছি, আমার মনের সমস্ত মাধুরী আমি উজাড় করিয়া তোমাকে বিলাইয়া দিব, তুমি আসিয়া গ্রহণ করিলেই হয়।

তুলনীয়—চিত্রা।

এই কবিতাটির ছন্দের মধ্যে কবি-চিত্তের আনন্দ-আহ্বান যেন আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয়া ও বিরহিণী

কবি তাঁহার পৌত্রীকে সম্বোধন করিয়া এই দুইটি স্নেহসিক্ত রঙ্গভরা কবিতা লিখিয়াছেন।

কঙ্কাল

কবি একটা পশুর কঙ্কাল দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, পশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরাইয়া যায়। কিন্তু মানুষের, বিশেষ করিয়া কবির জীবন তো মৃত্যুর দ্বারা নিঃশেষ হয় না—তিনি যাহা ভাবেন, জানেন, অনুভব করেন, তাহা তো কেবলমাত্র নশ্বর দেহের সঙ্গেই বিনষ্ট হইবার সামগ্রী নহে—তাহা তো দুর্লভ চিরন্তন সামগ্রী, তাহা অপার্থিব—

যা পেয়েছি, যা করেছি দান,
মর্ত্যে তার কোথা পরিমাণ ?
আমার মনের নৃত্য কত বার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চির-সুন্দরের সুর-পুরে।

কবি রূপের পদ্মে অরূপ মধু পান করিয়া অমর হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার দৃঢ় ধারণা—

নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

বিধাতা যে কবিকে এত মানসিক ঐশ্বর্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তো কেবল দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যাইবার জন্য নহে।

অন্ধকার

আর কোনো কবি অন্ধকারের ঐশ্বর্যের এমন সন্ধান পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। কবি তাঁহার নব-গীতিকা পুস্তকের একটি গানে বলিয়াছেন—

অন্ধকারের বুকের কাছে
নিত্য-আলোর আসন আছে,
সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো !

গীতালিতে বলিয়াছেন—

অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো,
সেই তো তোমার আলো !

ইহার সহিত তুলনীয় গীতালি পুস্তকের 'যাত্রাশেষ' কবিতা এবং ফাল্গুনী নাটক। ফাল্গুনীর অন্তরের কথা হইতেছে এই—শীত ও বসন্ত যেন অন্ধকার ও আলো,—শীতের শীর্ণতার মধ্যে বসন্তের ঐশ্বর্ব ও প্রাচুর্ব লুকাইয়া থাকে।

অন্ধকার আলোকের সৃষ্টির ব্যথায় চঞ্চল। অন্ধকার যেন গর্ভিণী, আলোক-সন্তানকে প্রসব করিবার ব্যথায় সে কম্পিত হইতেছে।

সৃষ্টির পূর্ববর্তী অন্ধকারের মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ প্রচ্ছন্ন ছিল, এমন কথা বেদ ও বাইবেল উভয়েই বলেন।

> ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রেঽপ্রকেতম্। —ঋগ্‌বেদ, ১০।১২৯

প্রথমে রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল।

> ....and darkness was upon the face of the deep..........And God said Let there be light, and there was light. —Bible, Genesis, I. 2. 3.
>
> And the light shineth in darkness; and the darkness comprehendeth it not. —Bible, St. John, I. 2. 3.

অন্ধকার হইতেই দিন তাহার শক্তির উৎস সংগ্রহ করিয়া প্রভাতের আলোকে নূতন বেশে দেখা দেয়; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই চিরন্তন রহস্য চলিয়া আসিতেছে। "আঁধারের আলোকভাণ্ডার" দিনের খাদ্য জোগাইতে কখনো পরাঙ্মুখ হয় না; কারণ, একের অভাবে অন্যটি অসম্পূর্ণ—ইহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তুলনীয়—

> ......শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
> আকাশের বিপুল ক্রন্দন; দেখিলাম শূন্য-মাঝে
> আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা। —পূরবী, সমুদ্র

প্রকৃতির এই অন্ধকারের লীলার সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। অন্ধকার যেমন দিনকে প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করে, তেমনি কবিকেও প্রাণ-শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলে। তুলনীয়—'কল্পনা'য় রাত্রি।

কবি অন্ধকারকে বলিতেছেন নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার। কবি শেলীও অন্ধকারকে সুন্দর ও ভীষণ দেখিয়াছেন—

> Thou wovest dreams of joy and fear,
> Which make thee terrible and dear.
> —Shelley, *To Night.*

উদয়াচলের পশ্চাতে এবং অস্তাচলের পশ্চাতে অন্ধকারের অবিচ্ছিন্ন আসন বিছানো রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের গর্ভ হইতে প্রভাতালোকের জন্ম হয়, যেন শুভ্র শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি জগৎকে জাগ্রৎ করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই

আলোক মানুষের চক্ষে প্রতিভাত হয় এবং তাহার সমস্ত চিন্তা ভাবনা কামনার উপর প্রভা বিস্তার করিয়া তাহার কর্মৈষণা জাগ্রৎ করে।

প্রকাশের পূর্ববর্তী ধ্যানের নিস্তব্ধতা কবির চিত্তকে অশেষের পথে তীর্থযাত্রা করাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

কবি সুদীর্ঘ জীবনের অবসানে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য সেই অন্ধকারের দ্বারে আসিয়া বিশ্রাম প্রার্থনা করিতেছেন, নব উদ্যমে আবার কর্মে সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন বলিয়া,—যেমন করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত রবি অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তরুণ অরুণ রূপে প্রভাতে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

দিনের আলোকের আন্দোলনে চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে; তখন জীবনের উদ্দেশ্যের উদ্দেশ পাওয়া যায় না। এখন অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নিঃশব্দ গূঢ়তার মধ্যে অবগাহন করিয়া, আলোকের প্রকাশ-সম্ভাবনার ন্যায় নিজের সমস্ত সৃষ্টি-সম্ভাবনা কবি জানিয়া লইতে চাহিতেছেন—তিনিও পুনর্বার তারুণ্য লাভ করিয়া নির্মলা প্রশান্তি লাভ করিবেন।

কবি জীবনে অনেক খ্যাতি প্রশংসা পাইয়াছেন; সে-সকল তাঁহার জীবন-শেষে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা অসীম অন্ধকার অনন্তের যোগ্য উপহার নহে।

দিনের আলোকে কাজের ভিড়ে ভালো-মন্দ সত্য-মিথ্যার মাঝে ভেদ রেখা টানা যায় না। বেলা-শেষে কাজের অন্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন মৌন মুহূর্তগুলিতে সকল কাজের স্বরূপ জানা যায়। তখন কবি দেখেন যে, দিবসের চাঞ্চল্যের মধ্যে যাহাকে খাঁটি বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা মেকি মাত্র। কিন্তু তাহাতেও কবি ক্ষুণ্ণ নহেন; কবি অনায়াসে বলিতেছেন—'সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।' যশ মান গর্ব ইত্যাদি বহু মিথ্যা সত্যের ছদ্মবেশে কবিকে ভুলাইবার জন্য আসে; কিন্তু অন্ধকারের কষ্টিপাথরে—অনন্ত কালের পরীক্ষায় তাহাদের স্বরূপ ধরা পড়িয়া যায়। কবি তখন বুঝেন যে অনেক মেকি জিনিস ছাড়াও তাঁহার এমন কিছু সঞ্চয় আছে যাহা চিরন্তন সত্য অম্লান অমূল্য। তাঁহার যাত্রা-সহচরী কবি-প্রতিভা অকারণে কেবল ভালোবাসার টানে তাঁহার হাতে যে ভালোবাসার দান দিয়াছিল, তাহা কবির জীবনান্ত-কাল পর্যন্ত অম্লানে বিরাজে—সেই কবিত্ব-শক্তি মাধবী-মঞ্জরীর মতো তাঁহার চিত্ত-কুঞ্জে আজও অম্লান হইয়াই বিরাজিত—তাহা অতি পুরাতন হইলেও, তাহা যেন সদ্যোজাত তাজা রহিয়াছে,—প্রভাতের শিশিরসিক্ত সরসতা যেন এখনো তাহার গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। কবির

ইহজন্মের সেই অকারণে পাওয়া সুন্দর দান চিরন্তন অন্ধকারের থালায় তিনি রাখিয়া যাইবেন, এবং তাহা সমস্ত অক্ষয় নক্ষত্রলোকের মাঝে নক্ষত্রের ন্যায়ই অক্ষয় উজ্জ্বল হইয়া দীপ্যমান থাকিবে।

অন্ধকার পরিবর্তন-রহিত একটানা, তাই সে নিত্য নবীন। অন্ধকারের ন্যায় ধ্যানস্তব্ধতা হইতে কবির সুরের গানের কল্পনার কবিত্বের ফুল আলোকে প্রকাশের জন্য কবে কোন্ দিন যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহার তো কোনো নির্ণয় নাই। কবি একদিন জীবনের মধ্যে সচেতন হইয়া দেখিলেন যে, তিনি কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া কবি হইয়া গিয়াছেন। তারপর কবি তাঁহার কবিত্বকে এবং সত্যকে কখনও প্রকাশের মোহে, প্রশংসার লোভে ম্লান হইতে দেন নাই। তিনি সেই অম্লান উপহার আনিয়া চিরন্তনকে—রাত্রিকে সম্প্রদান করিতেছেন।

কবি বলিতেছেন যে অন্ধকারই হইল সমস্ত সৃষ্টির ভাণ্ডার, সকল বস্তুর চরম পরিণতি তাহারই মধ্যে—কবির কবিত্ব-শক্তিরও জন্ম মৌনতার ধ্যানের অন্ধকারে। তুলনীয়—কল্পনায় 'রাত্রি' কবিতা। কবির কবিত্বের মধ্যে যে কতখানি অন্ধকার ধ্যান-স্তব্ধতার প্রভাব ও আনন্দ নিহিত রহিয়াছে, তাহা তো কবি এতদিন প্রকাশের আগ্রহে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু কবি আজ উপলব্ধি করিতেছেন যে—অন্ধকার অবসান নহে, তাহা একটা নূতন আরম্ভের সূচনা, এবং সমস্ত আরম্ভের চরম আধার। কবির প্রাণের খাদ্য ও রস জোগায় অন্ধকার তাহার মৌনতায় ডুবাইয়া এবং একাগ্রতা জাগ্রত করিয়া। সেইজন্য অন্ধকারের সঙ্গে কবির প্রাণের সম্বন্ধ অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ—কবিত্বের সঙ্গে মৌনতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; কবিত্ব দিনের আলো কাজের ভিড় সহিতে পারে না।

বসন্তের দান

বসন্তের দান কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কবি প্রিয়নাথ সেনকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ সেন "প্রদীপ" পত্রে একটি সনেট লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রথম লাইন ছিল—

অচির বসন্ত হায়, এল, গেল চ'লে।

রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম লাইনটি দিয়া নিজের সনেট আরম্ভ করিয়া কবি-বন্ধুকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

এবার কিছু কি কবি করেছ সঞ্চয়?

শিবাজী উৎসব

১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে ১৯০৪ খৃস্টাব্দে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামক মহারাষ্ট্রী-বাঙালীর উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত শিবাজী-উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা রচনা করেন এবং তাহা 'শিবাজীর দীক্ষা' নামক পুস্তিকায় ও 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হয়। কবিতায় দেশের বীরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে।

নমস্কার

'নমস্কার' কবিতাটি অরবিন্দ ঘোষকে উদ্দেশ করিয়া লেখা। দেশের দুর্দিনে প্রেস আইনের কঠোর শাস্তির ভয়ে যখন দেশে অপর সকল লোকের কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, তখন অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া নির্ভীকভাবে দেশের অভাব অভিযোগ মর্মবেদনা ও ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রচার করেন এবং প্রবল রাজপুরুষের সকল প্রকার অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইহাতে অরবিন্দকে অভিযুক্ত হইতে হয়। অরবিন্দের সেই নির্ভীক তেজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া কবি লিখিয়াছিলেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!
হে বন্ধু, হে দেশ-বন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্তি তুমি।

এই কবিতাটি ৭ই ভাদ্র ১৩১৪, ২৪ আগস্ট ১৯০৭ তারিখে রচিত হয় ও ১৩১৪ ভাদ্র মাসের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

নটীর পূজা

ইহা নাটিকা। ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসের 'মাসিক-বসুমতী' পত্রিকায় সম্পূর্ণ একেবারে প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

ইহা মগধের মহারাজ অজাতশত্রুর সময়ের বৌদ্ধকাহিনী—কিছু কাল্পনিক, কিছু ঐতিহাসিক। মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম অবলম্বন করেন। মহারাণী লোকেশ্বরীও সেই ধর্মের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম মহারাজ বিম্বিসারকে নির্লোভ ক্ষমাশীল বিষয়-বাসনায় উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল। তাই যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু পিতার রাজ্যের প্রতি লোলুপ হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় পুত্রকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া অন্যত্র রাজ্যের একান্তে বাস করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। মহারাণী লোকেশ্বরীর পুত্র চিত্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হইয়া রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, পিতা-মাতার প্রদত্ত নাম পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া কুশলশীল নাম গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাণী লোকেশ্বরী রাজকুলবধূ; তাঁহার যে দেবতায় ভক্তি তাহা ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। পতিপুত্রে বঞ্চিতা হইয়া লোকেশ্বরী বুদ্ধদেবের ধর্মের উপর বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছেন বাহিরে; কিন্তু মন হইতে বুদ্ধদেবের প্রভাব কিছুতেই বিদূরিত করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি বলিলেন—ভিতরে উপাসিকা আছে, সে ভিতরেই থাক; বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ,—তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।

লোকেশ্বরী বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী হইয়া উঠিলেন।

অজাতশত্রু রাজা হইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্য বুদ্ধদেবের প্রতিস্পর্ধী দেবদত্তকে গুরু স্বীকার করিয়া দেবদত্তের কাছে দীক্ষা লইয়াছেন এবং মহারাজ বিম্বিসার রাজোদ্যানের অশোকতরুতলে যে বেদিকায় প্রভু বুদ্ধকে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন, দেবদত্তের প্ররোচনায় সেই আসন ভগ্ন করিয়াছেন। মহারাণী লোকেশ্বরীও পরমকারুণিক বুদ্ধদেবের নামের বদলে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায়, নমঃ পিনাকহস্তায়। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া উঠে—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায়। মহারাজ অজাতশত্রু কিন্তু বৌদ্ধ ও দেবদত্তের শিষ্যদের উভয় দলকেই

সন্তুষ্ট রাখিবার অসাধ্য-সাধনে ব্যস্ত—"উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যদের সমাদর যখন বেশি হ'য়ে যায়, অমনি উনি দেবদত্তশিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরো বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক্ থেকেই নিরাপদ্ করতে চান।" ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসকগণও ঠিক এমনিভাবেই হিন্দু-মুসলমান উভয় দলকে হাতে রাখিয়া নিজেদের কার্যোদ্ধার করিবার প্রয়াসী ছিলেন।

কিন্তু মহারাণী লোকেশ্বরী অজাতশত্রুর এই দ্বিধাভরা মিথ্যাচার সহ্য করিতে পারেন না ; তিনি বলেন—"আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ্। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।" ইহাই প্রভু বুদ্ধদেবের মহাধর্মের মূল কথা, লোকেশ্বরীর জীবনে বুদ্ধদেবের শিক্ষার বিজয়ের পরিচায়ক ; যাহার কোথাও কিছু আসক্তি নাই সেই তো সত্যকে স্বীকার করিতে পারে।

রাজবাড়ীর মধ্যে যখন এইরূপ দুই বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তখন সেখানে আছে এমন একজন যাহার বুদ্ধদেবের প্রতি অবিচলিত ভক্তি—সে রাজবাড়ীর নটী শ্রীমতী। শ্রীমতীর অবিচলিত নিষ্ঠা দেখিয়া রাজার অন্তঃপুরিকারা কেহ বা তাহাকে বিদ্রূপ করে, কেহ বা তাহাকে ভয় করে, কেহ বা তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। আর শ্রীমতীর পার্শ্বে আসিয়া জুটিয়াছে গ্রাম্য বালিকা মালতী—যাহার ভাই ও প্রেমাস্পদ বাগ্দত্ত স্বামী ভিক্ষু হইয়া তাহাকে একাকিনী নিঃস্ব অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে। সে তথাপি বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধা লইয়া শ্রীমতীর কাছে আসিয়াছে জীবনে সান্ত্বনা পাইবার আশায়। বাহিরে সে দেখাইতেছে যে সে শ্রীমতীর কাছে নাচ শিখিতে আসিয়াছে।

শ্রীমতীর ধর্মনিষ্ঠা অপরিসীম। তাহা দেখিয়া তাহাকে সব চেয়ে উপহাস করে রাজমহিষী রত্নাবলী। সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"অপেক্ষা করছি উদ্ধারের। মলিন মনকে নির্মল ক'রে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছি।" ইহা শুনিয়া মহারাণী লোকেশ্বরী বলিয়া উঠিলেন—"এই নটীর শিষ্যা! শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আস্‌বে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে।"

নাটকখানির মধ্যে নটী শ্রীমতী সম্বন্ধে এইরূপ বিদ্রূপবাণী উচ্চারিত হইলেও কবি তাঁহার এই নাটিকার মধ্যে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে—যাহারা পতিতা তাহারা প্রভু বুদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়া ধন্য হইয়াছে, তাহারাই ভালো

করিয়া পরিত্রাণের উপদেশ দিতে সমর্থ। বুদ্ধদেবের পুণ্যপ্রভাবে পতিতা অম্বপালী ও নটী শ্রীমতী আজ সাধ্বী হইয়াছেন ; নাপিত উপালি, গোয়ালা সুনন্দা পুক্কুস সুনীত আজ সাধু স্থবির হইয়াছেন।

মহারাজ অজাতশত্রু রাজবাড়ীতে বুদ্ধপূজা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা শ্রীমতীর উপর ভার দিয়া গেলেন সেই পূজা করিবার ; এবং তিনি নিজে গেলেন নগরে পূজা করিতে। দেবদত্তের শিষ্যেরা উৎপলপর্ণাকে হত্যা করিল। শ্রীমতী রাজান্তঃপুরের রক্ষিণীদের নিষেধ না মানিয়া যে অশোকতরু-মূলে প্রভু বুদ্ধ একদিন বসিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাজমহিষী রত্নাবলী নটীকে এবং বুদ্ধদেবকে একসঙ্গে অপমান করিবার জন্য রাজার আজ্ঞা আনাইলেন যে, নটীকে বুদ্ধবেদীর সম্মুখে নৃত্য করিতে হইবে। শ্রীমতী তাহাতেই সম্মত হইল।

এ দিকে দেবদত্তের শিষ্যেরা প্রবল হইয়া উঠিয়া মহারাজ বিম্বিসারকে হত্যা করিয়াছে। মহারাজ অজাতশত্রু পিতৃহত্যার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাজমহিষী রত্নাবলী তাহাতে বিচলিতা নহেন, তিনি বলেন,—"মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে তো বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণেরা তো তখন থেকেই বলেছে, যে-যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন, সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ওঁকে খাবে।" অজাতশত্রু পিতার ও বুদ্ধভক্তের রক্তপাতে শঙ্কিত হইয়াছেন, পাছে বুদ্ধদেব তাঁহাকে অভিশাপ দেন— "মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কোন্ একটা অনুশোচনায় ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছেন।" তিনি দেবদত্তের শিষ্যদের আর সাম্‌লাইতে পারিতেছেন না, তিনি বৌদ্ধদের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। সকলে আশঙ্কা করিতেছে যে, মহারাজ বোধ হয় পূজা-বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করিবেন।

কাজেই রত্নাবলী খুব তাড়াতাড়ি শ্রীমতীকে বুদ্ধের পূজাবেদীর সম্মুখে নাচাইয়া বুদ্ধদেবের অপমান করিবেন বলিয়া কল্পনা করিলেন।—"ও যেখানে পূজারিণী হ'য়ে পূজা করতে যাচ্ছিল, সেখানেই ওকে নটী হ'য়ে নাচ্‌তে হবে।"

শ্রীমতী নটীর বেশ ও প্রচুর অলঙ্কার পরিধান করিয়া নাচিতে আসিল। রক্ষিণীরা ও কিঙ্করীরা পর্যন্ত তাহাকে ধিক্‌কার দিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীমতী শান্ত সমাহিত হইয়া আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। নটীর সেই নৃত্য হইয়া উঠিল নতি, এবং তাহার গান হইয়া উঠিল বন্দনা। নটী নৃত্য করিতে করিতে তাহার

সমস্ত বসন ভূষণ খুলিয়া খুলিয়া বেদীমূলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল—তাহার নটীবেশের নীচ হইতে বাহির হইল ভিক্ষুণীর কাষায়বস্ত্র। রক্ষিণীরা তাহাকে এই পূজা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিল। কিন্তু রত্নাবলী রক্ষিণীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"রাজার আদেশ পালন করো।" রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিল। শ্রীমতী আহত হইয়া পড়িয়া গেল। রক্ষিণীরা তাহার পায়ের ধূলা লইয়া তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী লোকেশ্বরী শ্রীমতীকে কোলে লইয়া বসিলেন এবং শ্রীমতীর ভিক্ষুণীর বস্ত্র মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন—"নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি!"

এ দিকে মহারাজ অজাতশত্রু অনুতপ্তচিত্তে বুদ্ধদেবের করুণা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ভগবানের পূজা লইয়া কানন-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তিনি শ্রীমতীর হত্যার সংবাদ শুনিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন, তিনি ফিরিয়া গেলেন। নটী প্রাণ দিয়া, মান দিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের পূজা সমাধা করিয়া গেল। নটীর পূজা জয়যুক্ত হইল।

ঋতু-উৎসব ও ঋতু-রঙ্গ

ঋতু-উৎসব প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে। ঋতু-রঙ্গ প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের পৌষ মাসের মাসিক-বসুমতী পত্রিকায়। দুইখানিই ষড়্‌ঋতুর সৌন্দর্যের বন্দনা। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পূজারী কবি ঋতু-পর্যায়ে মনের মধ্যে যে আনন্দ-হিল্লোল অনুভব করেন তাহারই উল্লাস এই দুইখানি বই।

ঋতু-উৎসবের মধ্যে আছে—১। শেষ-বর্ষণ, ২। শারদোৎসব, ৩। বসন্ত, ৪। সুন্দর, ৫। ফাল্গুনী। বর্ষার শেষ হইতে বসন্তের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যে সৌন্দর্যের ও আনন্দের প্লাবন বহিয়া যায়, তাহারই পাঁচটি তরঙ্গ এই পুস্তকে ধরা পড়িয়াছে ঐন্দ্রজালিক কবির মায়ায়।

কবির অনেক ঋতু-উৎসব-সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে একজন রাজা থাকেন এবং একজন কবি থাকেন। রাজা হইতেছেন বৈষয়িক, আর কবি হইতেছেন সৌন্দর্যলক্ষ্মীর উপাসক। কবির আনন্দের ছোঁয়াচে রাজা বিষয়কর্ম ভুলিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্যপূজায় মাতেন, এমন কি অর্থসচিব পর্যন্ত টাকার থলির ভার ভুলিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। ঋতু-উৎসবগুলির অন্তরের কথাই এই। প্রকৃতির সহিত মানব-মনের মিলনেই বিশ্বের আনন্দোৎসব পূর্ণতা লাভ করে।

দ্রষ্টব্য :—শারদোৎসব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্রা, ১৩৩৬ আশ্বিন। এই পুস্তকে শারদোৎসব-ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য।

রক্তকরবী

নাটক। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীর অতিরিক্তাংশ-রূপে সমগ্র ছাপা হয়। পরে বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে।

কবি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আছে যে, তাঁহার কবিতা ও নাটক অস্পষ্টতার দোষে দূষিত। সেই অভিযোগ এই নাটকখানির বিরুদ্ধে যত বিঘোষিত হইয়াছিল, এমন আর অন্য কোনো নাটকের এবং 'সোনার তরী' ছাড়া অন্য কোনো কবিতার বিরুদ্ধে হয় নাই বোধ হয়। কোনো কবির কোনো কাব্য বুঝিতে না পারিলে তাঁহাকে অপরাধী করার পূর্বে নিজের বোধ-শক্তিটাকে একবার যাচাই করিয়া লওয়া ভালো। বেদান্তদর্শন বা কাণ্ট্-হেগেলের দর্শন অথবা বৈজ্ঞানিক আইন্‌স্টাইনের মতবাদ সাধারণ লোকের জন্য যেমন নয়, কোনো কোনো কবির কাব্যও তেমনি সাধারণের সহজবোধ্য হইতে নাও পারে। এই জন্য দোষারোপকারীদের মনে রাখা উচিত—রসের সন্ধান না পাইয়া খেজুর-গাছের গলায় কলসীটাকে ঝুলিয়া থাকিতে দেখিলে নিরর্থক বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য নয়; কিন্তু কলসীটাই তো শেষ অর্থ নয়, তাহার অন্তরে যে রস সঞ্চিত আছে সেইটারই অর্থ যা-কিছু। রস না দেখিয়া লোকে কলসীর মানে খুঁজিয়া পায় না। এই নাটকেরও রসটুকুর সন্ধান পাইলে আর কোনো গোলমাল থাকে না। সেই রস হইতেছে নন্দিনী—তাহার নামেই আছে তাহার আসল পরিচয়।

এই নাটক লইয়া হৈচৈ হইয়াছিল বলিয়া বহু মনস্বী ব্যক্তি ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং কবিকেই নিজের কাব্য ব্যাখ্যা করিতে একাধিকবার আসরে নামিতে হইয়াছে। কবি রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—

পরজন্ম সত্য হ'লে কি ঘটে মোর সেটা জানি,
আবার মোরে টান্‌বে ধ'রে বাংলাদেশের এ রাজধানী।
* * * *
আমার হয়তো কর্‌তে হবে আমার লেখা সমালোচন।
আমার লেখার হব আমি দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন। —কণিকা, কর্মফল

কিন্তু কবিকে আর পরজন্মের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় নাই; তাঁহাকে ইহজন্মেই সেই দুর্ভোগ ভুগিয়া লইতে হইয়াছে।

এই নাটকের সমালোচনা বহু বিচক্ষণ লোকে করিয়াছেন; সেই জন্য আমি ইহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিয়া নিরস্ত হইব।

রাজা প্রজাদের শোষণ করিতেছে, তাহার লোভের খোরাক জোগাইবার জন্য খনির কুলীরা সোনা তুলিতেছে। কুলীরা মানুষ, কিন্তু কাহারও সঙ্গে তাহাদের যেন মনুষ্যত্বের সম্পর্ক নাই, তাহারা কেবল সোনা তুলিবার যন্ত্র-স্বরূপ, তাহাদের পরিচয় ৪৬ক, ১৬৯ফ মাত্র। ইহার দ্বারা জীবন পীড়িত হইতেছে, যন্ত্রবদ্ধতা ও লোভে মনুষ্যত্ব ব্যথিত হইতেছে। জীবনের সম্পূর্ণ প্রকাশ হইতেছে প্রেম, এবং সুন্দর হইতেছে তাহার উপযুক্ত আবেষ্টন। যন্ত্রবদ্ধ ব্যবস্থার দ্বারা যান্ত্রিকতাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারাই প্রয়োজনের আবর্জনা, যান্ত্রিক যন্ত্রণা জয় করিতে হয়। পাথরে বাঁধা পাকা রাস্তার ভিতর দিয়াও ঘাস গজাইয়া উঠে—জীবন নিরন্তর জড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। স্ত্রীলোকই হইতেছে জীবন, শ্রী, প্রেম, কল্যাণ, লক্ষ্মী। যে জীবন ধন-মান যশ-ক্ষমতার জন্য লোলুপ, সে জীবন শ্রী প্রেম কল্যাণকে পরিত্যাগ করে।

নন্দিনী—জীবন-শ্রী প্রেম-কল্যাণময়ী-লক্ষ্মী—লোভীকে সে লোভ ভোলায়, পণ্ডিতকে তাহার পাণ্ডিত্য ভোলায়। যে নারী সম্পূর্ণতার আদর্শকে পরিব্যক্ত করে, সে সকলের মধ্যেকার সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করে, প্রকাশ করে।

উর্বশী যেমন চিরন্তনী নারী, নারীত্ব,—নন্দিনী তেমনি আনন্দ-লহরীর প্রতিমূর্তি, সে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। সে কিশোরকে মুগ্ধ করে, পণ্ডিতকে ভুলায়, সকলকে চঞ্চল করে। রাজা যেমন করিয়া সোনা সংগ্রহ করিয়াছে, শক্তি লাভ করিয়াছে, তেমনি করিয়া সে নন্দিনীকেও পাইতে চায়—সে জানে কেবল মাত্র কাড়িয়া লওয়ার পাওয়া, হাতের স্পর্শ-দ্বারা অনুভবনীয়,—tangible কিছু পাওয়া। কিন্তু নন্দিনীকে সে কিছুতেই তেমন করিয়া পাইতেছে না। ইহাতে রাজার মনের ভিতরেও নাড়া লাগিয়াছে। মোড়লকেও নন্দিনী বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু মোড়লের প্রেম উৎপথগামী (perverse)—সে যাহাকে ভালোবাসে তাহার বিরুদ্ধতা করে, সেই বিরোধিতার মধ্য দিয়াই তাহার ভালো লাগা প্রকাশ পায়। নন্দিনী কেনারামকেও প্রেম দিয়া কিনিয়াছে—কেনারামও বিচলিত হইয়াছে। যে নন্দিনী রাজার দরজায় ধাক্কা লাগাইতেছে, সে-ই সকলের হৃদয়ের দ্বারে ধাক্কা দিতেছে। অবশেষে জীবন হইতেছে জয়ী মৃত্যুর মধ্যে নিজের চরম ও পরম বলিদানের দ্বারা। জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ও প্রকাশ হইতেছে প্রেম, জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুষঙ্গী হইতেছে প্রেম—জীবনের সঙ্গে প্রেমের

পরিপূর্ণ সুসঙ্গতি। হিংসায় ও লোভে প্রেম ও জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুসঙ্গতি নষ্ট হয়,—রঞ্জন ও নন্দিনীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। জীবন তাই নিরন্তর প্রেমকে সন্ধান করিয়া ফিরে এবং যন্ত্র চায় প্রেমকে বিনাশ করিতে।

বিসর্জন নাটকে যেমন দেখানো হইয়াছে প্রথা প্রেমকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া, প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল (প্রেমরূপিণী অপর্ণা যেমন জয়সিংহকে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্ররোচনা দিয়া ডাক দিয়াছিল), তেমনি নন্দিনীও জালের পিছনের আবছায়া রাজাকে ডাক দিয়া বলিয়াছিল—বাহিরে চলিয়া আইস বদ্ধতার মধ্য হইতে।

রক্তকরবীর আরম্ভ লোককে আনন্দে ভুলাইয়া। কোন গাছ যদি বদ্ধ অবস্থায় থাকে, তবে যেদিকে ফাঁক পায়. সেদিকে আলোকের জন্য ঝুঁকিয়া পড়ে। যক্ষপুরীর লোকেরা তেমনিভাবেই নানা রকম বদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, নন্দিনীকে দেখিয়া সকলে বাঁচিবার জন্য তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। নন্দিনী যে ক্রমাগত ডাকিতেছে—এস, এস আমার দিকে, আমি তোমাদের মুক্তি দিব। এই যে ডাক, ইহা তো প্রাণের ও প্রেমের ডাক। কারাগার ভাঙিল কি না তাহা বড় লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য এই যে জীবন ও শ্রী অপরকে ডাক দিয়াছে বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যাইতে।

চতুরঙ্গের দামিনীও ক্রমাগত এই কথা বলিয়াছে—সেও এই রকম প্রাণের ও প্রেমের প্রতিমূর্তি। গুরুর কাছে সবাই লুটাইতেছে, কিন্তু সেই গুরুকে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করিতেছে দামিনী। Concrete প্রাণ ও শ্রী তাহার দাবী লইয়া শচীশ বা বিশ্রীকে চাহিতেছে। বাধা দিতে দিতে একদিন বাধা ভাঙিয়া গেল।

কবির কথা সন্ন্যাসীর কথার একেবারে উল্টা। সন্ন্যাসী বলেন—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করো। আর কবি বলেন—কামিনী না হইলে তোমাদের ভাবময়তা (abstraction)—রূপ-মোহের তম হইতে কে বাঁচাইবে? কাঞ্চন ত্যাজ্য, কারণ তাহা মানুষের সৃষ্টি, তাহা বন্ধন ; কিন্তু কামিনী অত্যাজ্য, কারণ সে ভগবানের সৃষ্টি, সে কেবল ভাব হইতে অবাস্তবতা হইতে মুক্তি দেয়। কাঞ্চন মানুষের নিজের হাতের গড়া শিকল ; কিন্তু কামিনী—ভগবানের দেওয়া মুক্তির দূতী—প্রাণের প্রেমে রসে বিচিত্র।

রক্তকরবী রূপক-নাট্য বা সমস্যামূলক নাট্য নহে, ইহা গীতিনাট্য—Dramatic Lyric। ইহাতে সামাজিক সমস্যার উপরে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইয়াছে—যেমন পটের উপরে চিত্র তাহাতে চিত্রটাই প্রধান হয়, পট নয়।

লেখন

এই বইখানির লেখা সমাপ্ত হয় ২৬-এ কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সালে—৭ই নভেম্বর ১৯২৬। বইখানি মাত্র ৭৩ পৃষ্ঠার। সমস্ত কবিতা কবির নিজের হাতের লেখায় অস্ট্রিয়ার বুডাপেস্টে ছাপা। ইহাতে কবির নিজের হাতে লেখা ছোট ছোট কতকগুলি কবিতা আছে; এই কবিতাগুলি কণিকা জাতীয়। এই লেখনগুলির রচনা আরম্ভ হয় চীনে জাপানে—পাখায়, কাগজে, রুমালে কবিকে কিছু লিখিয়া দিবার জন্য লোকের অনুরোধ হইতে ইহাদের উৎপত্তি। তাহার পর দেশে ফিরিয়াও লোকের হস্তাক্ষর সংগ্রহের খাতায় কবিকে এই রকম অনেক লিখিতে হইয়াছে। এমনি করিয়া অনেক টুকরা লেখা জমিয়া উঠে। এই কবিতাগুলির মধ্যে কণিকার কবিতার কবিত্ব ও তত্ত্ব ছাড়াও মূল্য হইতেছে, কবির নিজের হাতের লেখায় তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ে। ছাপার অক্ষরে কবিতার যে ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হইয়া যায়, কবির হাতের লেখায় ছাপা হওয়াতে সেই সংস্রবটুকু রক্ষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কবি-মনের পরিচয় অধিক পাওয়া যায়। কবিতাগুলির ইংরেজি অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজের হস্তাক্ষরে দেওয়া হইয়াছে।

এই বইয়ের উৎপত্তির এবং বিষয়বস্তুর পরিচয় কবি স্বয়ং দিয়াছেন ১৩৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী পত্রের ৩৮-৪০ পৃষ্ঠায়। কবি লিখিয়াছেন—

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম, প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষর-লিপির দাবী মেটাতে হ'ত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখ্‌তে হয়েছে।......দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট ক'রে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্য-বর্জিত রূপ প্রকাশ পেত, তা আমার কাছে বড় লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড় বড় কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস ব'লেই কবিতার আয়তন কম হ'লেই তাকে কবিতা ব'লে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে।......জাপানে ছোট কাব্যের অমর্যাদা নেই। ছোটর মধ্যে বড়কে দেখ্‌তে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জাত্‌ আর্টিস্ট্‌—সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না......এই-রকম ছোট ছোট লেখায় আমার কলম যখন রস পেতে লাগল, তখন আমি অনুরোধ-নিরপেক্ষ হ'য়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি, এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় ক'রে বলেছি—

আমার লিখন ফুটে পথ-ধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চল্‌তে চল্‌তে দেখারই দোষ। যে জিনিসটা বহরে বড় নয়, তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখিনে—যদি দেখ্‌তুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হ'লেও লজ্জার কারণ থাক্‌ত না। তার চেয়ে কুমড়া-ফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হ'তে পারে।

...ছোট লেখাকে যাঁরা সাহিত্য-হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর-হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ কর্‌তেও পারেন।......ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি লিপিবদ্ধ কর্‌তে বস্‌লুম।......

কবি এই ক্ষুদ্র কবিতাকণিকাগুলির নাম দিয়াছেন কবিতিকা।

এই রকম কবিতায় ছোটর মধ্যে একটি ভাব সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে এবং কবি নিজের মনকে সংযত করিয়া তাহাকে বড় করিবার চেষ্টা করিয়া ছোট করেন না বলিয়াই ইহারা প্রশংসার যোগ্য। ইহারা অলুব্ধ কবি-মনের সংযমের ও আর্টিস্টিক বুদ্ধির পরিচায়ক। এই রকম অনেক লেখাই একেবারে নিরাভরণ বলিয়াই ইহার ভিতরকার সৌন্দর্য ও রস সুপরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায়। কবির নিজের কথাতেই ইহাদের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়—

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি' নাই দুঃখ, নাই তার লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

মহুয়া

১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার উৎপত্তি-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুস্তকের পাঠ-পরিচয় লিখিয়া বলিয়াছেন—

মহুয়ার অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। এই সময়ে কথা হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ-উপলক্ষে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল; সেই-সব কবিতাই এখন মহুয়া নামে বাহির হইতেছে। ইহার কিছু পূর্বে, ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে, 'শেষের কবিতা' নামে উপন্যাসের জন্য কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও এই সঙ্গে ছাপা হইল।

এই কবিতাগুলির রচনা-সম্বন্ধে কবি স্বয়ং প্রশান্তবাবুকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই পুস্তকের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।—

লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানতঃ প্রজাপতির উদ্দেশ্য—আর তাঁরই দালালী করেন যে দেবতা তাঁকেও মনে রাখ্‌তে হয়েছিল। অতএব 'মহুয়া'র কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা ব'লে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখ্‌তে গেলে এটা কোনো কাল-বিশেষের নয়, এটা আকস্মিক।......

আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখ্‌তে পাই। একটি হ'চ্ছে নিছক গীতি-কাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধন-কলা মুখ্য। মহুয়ার একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই প্রবল। মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে নিজের ভিতরকার বর্ণে রঙে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তরের বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত-লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হ'তে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গিতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতায় চিত্তের এই মায়ালোকের কাব্য; তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

এই সুরের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয়ই আছে—নইলে লিখ্‌তে আমার উৎসাহ থাকৃত না।······

···এই বইয়ের প্রথমে ও সব শেষে যে-গুটিকয়েক কবিতা আছে, সেগুলি মহুয়া-পর্যায়ের নয়—সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের—দোল-পূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা ব'লে নকীবের কাজে এদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।

······কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সঙ্গতি আছে—মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।

বইয়ের আরম্ভে বসন্তের আগমনী-সম্বন্ধে ৫টি কবিতা, আর বইয়ের শেষে বিদায় সম্বন্ধে ৪টি কবিতা ১৩৩৩-১৩৩৪ সালের লেখা। ঐ সময়ের আর একটি মাত্র কবিতা 'সাগরিকা' এই বইয়ে স্থান পাইয়াছে। 'শুধায়োনা কবে কোন্ গান' কবিতাটি ১৩৩৫ সালের ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে লেখা।

আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য—এই পুস্তকের নাম-পত্রখানি কবির স্বহস্ত-অঙ্কিত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নর-নারীর যৌবনাবেগে যৌন আকর্ষণের এবং মিথুনতার কবিতা বেশি নাই; যাহা আছে তাহাতেও কবির প্রকৃতিগত সংযম ও দেহাতিরিক্ত মানসিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সংমিশ্রিত হইয়া কবিতাগুলিকে কামনার রাজ্যের বাহিরে লইয়া গিয়াছে। এই মহুয়ার মধ্যে কতকগুলি কবিতা ঐরূপ ধর্মাক্রান্ত হইলেও, ইহাতে এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যাহার মধ্যে নর-নারীর মানবীয় ভাব সুপরিস্ফুট হইয়াছে, অথচ কোথাও কবির আচারের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ক্ষণিকার মধ্যে যদিও কবি বলিয়াছিলেন—

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ক্রটি হ'তে পারে,
করিও ক্ষমা!

তথাপি কবির আচারের ক্রটি কোথাও ঘটে নাই—তাঁহার শুচি মন প্রণয়ের কবিতাকেও কামনাবেগে কলুষিত হইতে দেয় নাই। ইহার মধ্যে প্রণয়ের একটি সত্যপ্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, এবং রমণী কবির সৃষ্টিতে অবলা নহে, সবলা হইয়া পুরুষের সহধর্মিণী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। এই নরনারীর প্রণয়-লীলার মধ্যে কোথাও দীনাত্মার কাতরতা প্রকাশ পায় নাই, কোথাও হীন ভিক্ষাবৃত্তি প্রশ্রয় পায় নাই।

উজ্জীবন

যিনি সন্ন্যাসী তিনি মনোভবকে ভস্ম করিয়া তাহাকে অপমানিত করেন। কবি তাঁহার মোহন মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই অতনুকে উজ্জীবিত করিতেছেন। মনসিজ হইতেছে সৃষ্টির প্রেরণা—নর-নারীর প্রেমের মূল। যাহা সৃষ্টিকর্তার অনুশাসনে আবির্ভূত হয়, তাহাকে বিনাশ করিতে চাওয়াতে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই পণ্ড করা হয়। সেই জন্য কবি অতনুকে ভস্ম-অপমানের শয্যা ছাড়িয়া উজ্জীবিত হইতে আহ্বান করিতেছেন—কিন্তু তাহার মধ্যে যাহা স্থূল ও শ্রীহীন তাহাকে সেই ভস্মের অবশেষের মধ্যে পরিহার করিয়া আসিতে অনুরোধ করিতেছেন। বীরের তনুতে এই অতনু যদি তনু লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে—

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের র

ইহাই হইতেছে সমগ্র কাব্যের অন্তরের বাণী। এই জন্যই বীর প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে বলিতেছে—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,

* * *

ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি। —নির্ভয়

এবং সবলা নারীকে দিয়াও কবি বলাইয়াছেন নূতনতর বাণী—

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী!
বীর-হস্তে বরমাল্য লব একদিন।

* * * *

বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

বীর প্রেমিক কামনা করেন এই রকম দয়িতা যাহাকে তিনি বলিতে পারিবেন—

সেবা-কক্ষে করি না আহ্বান।
শুনাও তাহারি জয়গান
যে-বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মল লাঞ্ছিত। —প্রতীক্ষা

দম্পতীর জীবন কেবল সুখযাত্রা নহে, তাহাতে পদে পদে বিপদ্ বিঘ্ন আছে এবং তাহাকে উত্তীর্ণ হইয়া জয়ী হইয়া চলাই দাম্পত্য-জীবনের চরম কথা। পরস্পরের সাহায্যে সকল সংঘাত হইতে পরস্পরকে বাঁচাইয়া অদৃষ্টের উপর জয়ী হইতে হইবে, মৃত্যুর ভিতর হইতে অমৃত আহরণ করিয়া লইতে হইবে, এই শিক্ষা কবি প্রত্যেক কবিতাতেই দিয়াছেন। দম্পতীর বাসর-ঘর অক্ষয়; মালা-বদলের হার ছিন্ন হইলেও বাসর-ঘরের ক্ষয় নাই, তাহা নব নব দম্পতীর আনন্দ-মিলনের মধ্যে নিত্য বর্তমান। সেই জন্য কবি বাসর-ঘরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

হে বাসরঘর
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর। —বাসরঘর

পথের বাঁধন ও বিদায়

এই দুইটি কবিতা 'শেষের কবিতা' উপন্যাস হইতে গৃহীত। মহুয়ার কবিতাগুলি বিবাহ-ব্যাপার লইয়া লেখা, নর-নারীর প্রেমের নানা অবস্থার বিশ্লেষণ। শেষের কবিতাও তাহাই। অমিত ও লাবণ্য অকস্মাৎ পরিচিত হইয়া দেখিল—উভয়েরই উভয়কে ভালো লাগে। কিন্তু সেই ভালো-লাগা তাহাদের পূর্ব প্রণয়িনী ও প্রণয়ীর দাবীর কাছে পরাজিত হইয়া তাহাদের আর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিল না। এই যে জীবন-পথে চলিতে চলিতে এক-একজনকে ভালো লাগে, আবার তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়, তাহাও জীবনের পাথেয় হইয়া থাকে; এই ক্ষণ-পরিচয়ও জীবনকে গঠন করে, শোভা সৌন্দর্য দান করে, মহিমান্বিত করে। এই ক্ষণিক প্রেমের স্মৃতিকণাগুলি মহামূল্য রত্নকণিকারই তুল্য সমাদরে মনোভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়া থাকে; এমন কি স্মৃতিতে না থাকিলেও তাহা মগ্নচেতনায় বর্তমান থাকিয়া জীবনের জন্য অমৃত

আহরণ করিতে থাকে। মানুষ মাত্রেই জীবনে একবার একজনকে ভালোবাসে, আবার সেই ভালোবাসা হ্রাস হইয়া আসে, সে আবার অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু সেই যে পূর্ব অনুরাগের মাধুর্য, জীবনের যে-কয়টি মুহূর্তকে সেই প্রেমের অমৃত-স্পর্শ মহিমান্বিত করিয়াছিল,—তাহা তো চিরন্তন, তাহা সারা জীবনের সম্পদ্। এই কথাই এই দুইটি কবিতায় বলা হইয়াছে।

তুলনীয়—শাজাহান (বলাকা); অনবসর (ক্ষণিকা)।

নান্নী

নান্নী পর্যায়ের কবিতাগুলিতে নারীর চরিত্রের বিবিধ দিক্ ও বিচিত্রতা চিত্রিত হইয়াছে।

সাগরিকা

এই কবিতাটি বালিদ্বীপকে সম্বোধন করিয়া লেখা। একটি বিশেষ স্থানকে সুন্দরী রমণী কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি এমন মধুর প্রণয়-সম্ভাষণ আর কোনো কবি কোথাও করিয়াছেন কি না জানি না; এবং বালিদ্বীপের সহিত ভারতের যে যোগ কালে কালে নানা রূপে ঘটিয়াছিল তাহার ইতিবৃত্তকে এমন সরস করিয়া প্রকাশ করাও অতুলনীয়।

দ্বীপ সাগর-জলে স্নান করিয়া উঠিয়াছে, তাহার তট-রেখা উপবিষ্টা রমণীর পীতবাসের প্রান্তের মতো গোল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সেই দেশে ভারতের রাজারা প্রথমে দিগ্‌বিজয়ী বেশে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই রাজারা তাহাকে পদানত করেন নাই; সেই দেশের যে কৃষ্টি তাহার সহিত ভারতের সংস্কৃতি মিলাইয়া তাঁহারা নব-সভ্যতা গড়িয়া তুলিলেন, সেখানে এক নব-পদ্ধতির নৃত্যছন্দ ও স্থাপত্য-চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি উদ্‌ভাবিত হইল। মনের সংশয় দূর হইল,—ভয়ঙ্কর রুদ্র ধূর্জটির প্রেমের পরিচয় পাওয়াতে পার্বতী যেমন তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রসন্ন হাস্য-দ্বারা নিজের প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই বিজিত দেশ বিজেতার প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার পরাজয়ের গ্লানি দূর হইল।

তাহার পরে কালে কালে ভারত হইতে কত গুণী জ্ঞানী শিল্পী বণিক্

সেই দেশে গিয়াছেন এবং সেই দেশকে নব নব সম্পদ্ দান করিয়াছেন। কত অন্যদেশযাত্রী নাবিকের তরী ভগ্ন হওয়াতে তাহারা এই উপকূলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, এবং তাহারা এই দেশে ভারতের কর্ষণার নিদর্শন দেখিয়া ভারতের সহিত তাহার যোগের পরিচয় পাইয়াছিল। তাহারা দেখিল—বালিদ্বীপের নৃত্য, প্রসাধন করিবার ধরণ, গীত-বাদ্য, সাহিত্য সমস্তই ভারতের দান। সেই দেশের ধর্ম, দেবতা,—তাহাও ভারতের; ভারতের শৈব-ধর্ম সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধূর্জটি-পার্বতী এবং শিব-শিবানীর উল্লেখ করিয়া কবি সে-দেশের ধর্মমতের আভাস দিয়েছেন।

অবশেষে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রতিনিধি-রূপে বহু শত বৎসর পরে সে দেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সে দেশকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমি ভারতের প্রতিনিধি আসিয়াছি, কিন্তু আমি বিজয়ী রাজা নহি—আমি কোন বিশেষ জ্ঞান বা বিদ্যা বিতরণ করিতেও আসি নাই। আমি কবি, কেবল বীণা আনিয়াছি, তোমায় গান শুনাইয়া আমি আমার প্রীতি নিবেদন করিব। তথাপি আমি সেই পূর্বাগত ভারতবাসীদেরই একজন প্রতিনিধি, আমি সেই পূর্বের যোগসূত্রকেই শুধু আর-একটি গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দৃঢ় করিয়া দিতে আসিয়াছি।

এই কবিতাটির সঙ্গে পরিশেষ কাব্যের অন্তর্গত 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতাটি পাঠ করিলে উভয়ের অর্থ সুস্পষ্ট হইতে পারে।

সাগরিকা কবিতাটিকে একটি প্রেমের কবিতা হিসাবেও দেখা যাইতে পারে,—এবং সেই হিসাবেই কবিতাটি 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবী রাখে। কবিতাটির মধ্যে দেখা যাইবে—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে ও সাজে সাজিয়া কবি তাঁহার লীলাসঙ্গিনী কাব্যলক্ষ্মী বা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। উভয়ের প্রেমজীবনে বিচিত্র অধ্যায়। প্রথমে কবির মধ্যে ভোগাসক্তি প্রধান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোগপ্রধান ইন্দ্রিয়প্রেম ইন্দ্রিয়াতীত ভালবাসায় পর্যবসিত। কবিতাটির মধ্যে কবি তাঁহার জীবনলক্ষ্মী, কাব্যলক্ষ্মী অথবা সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে তিনি এবারে ভোগান্ধ প্রেমিকের বেশে তাঁহার কাছে আসেন নাই। এবারে তাঁহার ভোগাসক্তির চিহ্নস্বরূপ কামদেবের মূর্তি অঙ্কিত মকরকেতুর মকরচূড় মুকুট তাঁহার মাথায় নাই, অথবা তাঁহার হাতে কামদেবের ফুলধনু ফুলশরও নাই। এবারে তিনি বণিকের ন্যায় লাভের বেসাতি করিতেও আসেন নাই, ভোগাসক্তির ফলফুলের ডালিও

তিনি সাজাইয়া আনেন নাই, এবারে কোনো বাণিজ্যের সম্ভার লইয়া তিনি আসেন নাই। তিনি জীবনলক্ষ্মীর জন্য এবারে কোনও উপহারই আনেন নাই। এবারে তিনি শুধু বীণাহস্তে তাহার নিকটে আসিয়াছেন, সেই বীণার যোগে তিনি জীবনলক্ষ্মীর মহিমাগান গাহিবেন, কেবল অনাবিল কামনারহিত প্রেমের গান গাহিবেন। ভোগান্ধ প্রেমিকের মতন তিনি তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন না। তিনি শুধু তাঁহার প্রেমের ও সৌন্দর্যের গান তাঁহার বীণায় ঝঙ্কারিয়া তুলিবেন। তাই এই অভিনব বেশে কবি এবারে আসিয়াছেন। কাব্যলক্ষ্মীর নিকট কবির প্রশ্ন এই যে, তাঁহার এই নূতন বেশ দেখিয়া তাঁহার জীবনলক্ষ্মী তাঁহাকে চিনিতে পারেন কি ?



বনবাণী

১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে, ১৯২৬ সালের অক্‌টোবর মাসে প্রকাশিত।

কবি রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা। তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে তাঁহার কথার ইন্দ্রজালের মোহন মন্ত্র পড়িয়া পুনঃসৃষ্টি করিয়াছেন—যে প্রকৃতিকে আমরা নিত্য নিরন্তর দেখিতেছি, তাহার সহিত আমাদের নূতন নিবিড় পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন যাদুকর কবি—যেমন চেনা মেঘকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন কবি কালিদাস। মরমিয়া কবি তাঁহার অন্তর্গূঢ় সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্যের ও রসের মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার নব নব মাধুর্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-পরিচয়ের ধারা ঐতিহাসিক কাল-পর্যায়ের ক্রমে যদি অনুসরণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই—প্রথমতঃ কবি প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বিশালতার বাহিরের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহার পরে অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতির ভাবরাজ্যের ও অন্তর্জগতের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা লাভ করেন। শেষে এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্তার সমন্বয়ের মাঝে কবি বিশ্বপ্রকৃতির এক নবীনতর পরিচয় ও অর্থ পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের প্রথম ভাগ হইতেই যদিও কবির উপর প্রকৃতির প্রভাব অসাধারণ, তথাপি প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন প্রধানতঃ মানবের কবি। মানবীয় সুখ-দুঃখ ও সৌন্দর্য ঔদার্য যেমন ভাবে তাঁহার কাব্যে বাণী পাইয়াছে, প্রকৃতি সেইরূপ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন প্রকৃতির সার্থকতা যেন মানবকে পাইয়াই—মানবহীন প্রকৃতি যেন কবির কাছে মাধুর্যহীন ও ব্যর্থ। (তুলনীয় : 'ছবি ও গান' কাব্যে—পোড়োবাড়ী কবিতা)

মানবের অনুভূতির মাঝেই প্রকৃতি সার্থক। তাই কবি প্রকৃতির মাঝে মানবীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা দিয়া প্রকৃতিকে অনুভব করেন। কবি নিজেই বলিয়াছেন—"জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অপর নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ।" (—পঞ্চভূত)। তাই সৌন্দর্যবিলাসী কবি মানবকে প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন—তিনি

মানবকে প্রকৃতির আখ্যা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং প্রকৃতিকে ব্যক্তিত্ব দান করিয়া দেখিয়াছেন। মানব-বন্ধু কবি প্রকৃতিকে মানবীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন। শীতের রৌদ্র কবির কাছে বন্ধুর আলিঙ্গনের মতো, বর্ষার আকাশ সুন্দরীর জলভরা চোখ স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং নির্ঝর কেশ এলাইয়া ছোটে; কবির মানস-সুন্দরী কখনো মানবী, কখনো প্রকৃতিময়ী —'কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি'—এবং সহস্রের সুখে রঞ্জিত হইয়া আছে 'সর্বাঙ্গ তোমার হে বসুধে!' (—বসুন্ধরা)

কেবলমাত্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নব নব রসময় সম্বন্ধ-বন্ধনের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তির ক্রমবিকাশ অনুসরণ করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্গীয় কবিগণের নিকট বিশ্বপ্রকৃতি ছিল জড়েরই বৈচিত্র্য মাত্র। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় যথেষ্ট প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের সাড়া নাই—প্রকৃতির সহিত কবি-চিত্তের কোনো আত্মীয়তা সেখানে দৃষ্ট হয় না—বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের ইন্দ্রিয়ের জন্য কি কি উপভোগ্য জোগায় তাহারই তালিকা মাত্র পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টাকে মনে পড়িয়াছে—কিন্তু এই পর্যন্ত। মাইকেলের প্রাণের উপর প্রকৃতি কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে দুই-একটা সনেট ছাড়া তাঁহার স্বতন্ত্র প্রকৃতি-বর্ণনা নাই। হেমচন্দ্রকে ও নবীনচন্দ্রকে বিশ্বপ্রকৃতি ভাবনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে মাত্র—তাই পদ্মের মৃণাল দেখিয়া হেমচন্দ্রের মনে পড়িয়াছে রাজার ও রাজ্যের উত্থান-পতনের কথা, পদ্মা দেখিয়া নবীনচন্দ্রের মনে হইয়াছে রাজা রাজবল্লভের কীর্তি-অকীর্তির কথা, মেঘনা দেখিয়া মনে হইয়াছে মানব-জীবনের বাধা-বিঘ্ন ও স্বস্তি-অস্বস্তির কথা,—প্রকৃতির সহিত ইহাদের কোনো আত্মীয়তা দৃষ্ট হয় না। বিহারীলালেই আমরা প্রথম মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরের আদান-প্রদানের পরিচয় পাই—

ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে,
জ্যোৎস্নার আলোক আসি' ফুটেছে অধরে।
সাদা সাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা দেলা ভুলি';
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে,
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে! —শরৎকাল

বিহারীলালের শিষ্য রবীন্দ্রনাথই মানুষের সহিত প্রকৃতির যুগযুগান্ত-বিস্মৃত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটিকে নানা ভাবে পুনর্বন্ধন করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির বহুমুখী প্রভাবে রবীন্দ্রচিত্ত গঠিত; আবার রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিকে মানসদৃষ্টিতে রসমণ্ডিত করিয়া নূতন রূপে গড়িয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশ এই পুনর্গঠনেরই ইতিহাস।

কবি সন্ধ্যা-সঙ্গীতের 'হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে' ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতির মাধুর্যময় জীবনটিকে খুঁজিতেছেন—মাঝে মাঝে তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন; তাই সন্ধ্যা-সঙ্গীতে নৈরাশ্য আছে, অতৃপ্তি আছে, সঙ্কোচ আছে,—শিশিরোজ্জ্বল প্রভাতের 'সেই হাসিরাশির মাঝারে আমি কেন থাকিতে না পাই?' বলিয়া খেদ আছে। এখন—

গাছ পাতা সরোবর গিরি নদী নিরঝর

সকলের সহিত কবির প্রণয় জন্মিতেছে। কিন্তু—

শুধু মনে জাগে এই ভয়,—
আবার হারাতে পাছে হয়!

কবির এখন—

বসন্তের কুসুমের মেলা, মেঘেদের ছেলেখেলা

সারাদিন দেখিতে ভালো লাগে। প্রথম প্রণয়ের আকুলতার একটা ব্যথা আছে, তাই এই সঙ্গীতগুলির নাম হইয়াছে আরক্তিম সন্ধ্যার সঙ্গীত।

ক্রমশ কবির মিলন-ব্যাকুলতা প্রকৃতির অন্তর স্পর্শ করিল,—সেও কবিকে হাতছানি দিয়া তাহার অন্তঃপুরে ডাকিয়া লইল। অমনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইল, কবির রসপিপাসু চিত্তভ্রমর অন্তর্গুহা হইতে বাহির হইল। তাই প্রভাত-সঙ্গীতে দেখি প্রকৃতির অন্তঃপুরের দিকে, কবির যাত্রা—প্রভাত-উৎসবের মধ্যে মেঘ বায়ু তাঁহাকে পথ দেখাইতেছে,—মেঘকে কবি আকাশ-পারাবারে লইয়া যাইতে বলিতেছেন, বায়ুকে বলিতেছেন তাঁহাকে দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া দিতে, প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার আগ্রহে তিনি মরণকে পর্যন্ত আহ্বান করিতেছেন—

অণুমাত্র জীব আমি কণামাত্র ঠাঁই ছেড়ে
যেতে চাই চরাচরময়।

কবির 'সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ', আর কবির মনে হইল—

কে যেন মোরে খেতেছে চুমা—
কোলেতে তারি পড়েছি লুটি'।

কবি এখন জগৎ-ফুলের কীট। মরণহীন অনন্ত-জীবন মহাদেশ তাঁহার আবাসস্থল।

ইহার পরে ছবি ও গান। প্রকৃতির অন্তঃপুরে কবি প্রবেশ করিয়াছেন—যেখানে প্রকৃতি—

অমিয়-মাধুরী মাগি' চেয়ে আছে দুটি আঁখি।

—স্নেহময়ী

প্রকৃতির মধ্যে মমতার আস্বাদ পাইয়া কবি সেই মমতা আরো নিবিড় ভাবে পাইতে চাহিতেছেন; তাই কবি স্নেহময়ী পল্লীপ্রকৃতির অঙ্গনে আসিয়াছেন, যেখানে—

একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা
মাঠ দিয়ে চলেছে—
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।

—একাকিনী

তাহার পরে কবি প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় মাধুর্য দেখিতে পাইলেন—

ওই যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে,
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমারি মতো তোর স্নেহে আছে রত,—
জুঁই চাঁপা বকুল অশোক।

—স্নেহময়ী

প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া কবি মানব-প্রকৃতির প্রতিও আকৃষ্ট হইলেন—'কড়ি ও কোমল' সুরে তাঁহার চিত্তবীণা বাজিয়া উঠিল—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কবি বলিয়াছেন—'প্রকৃতি তাহার রূপ রস বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার

বুদ্ধি মন স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।' (—জীবনস্মৃতি)। প্রকৃতির সহিত কবির তন্মাত্রগত বা ইন্দ্রিয়ানুভব-গত পরিচয়ের এইখানেই শেষ।

প্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয় হওয়ার ফলে কবি দেখিলেন—প্রকৃতি কেবল আদরই করে না, শাসনও করে, প্রয়োজন হইলে পীড়নও করে। কবি তাই প্রকৃতিকে 'নিষ্ঠুরা' বলিয়াছেন স্থূল অতি-পরিচয়-গত অভিমানে। প্রকৃতির 'কঠিন নিয়ম'কে তিনি তিরস্কার করিয়াছেন—'আমরা কাঁদিয়া মরি, এ কেমন রীতি ?' কবি প্রকৃতির মধ্যে দেখিতেছেন—'পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই।'—'মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা।' 'মানসী'তে কবি প্রকৃতিকে জননী জ্ঞান করিয়াছেন বলিয়াই অভিমানে নিষ্ঠুরা বলিয়াছেন—'জীবন-মধ্যাহ্ন' ও 'অহল্যা' কবিতায় প্রকৃতির মাতৃত্ব ফুটিয়াছে।

'সোনার তরী'তে কবি প্রকৃতি-মাতার স্নেহের ব্যথাটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন—উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সে তো নিষ্ঠুরা নয়, সে 'অক্ষমা', সে 'দরিদ্রা'—মানবের অনন্ত ক্ষুধা ও অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিতে না পারিয়া সে ব্যথিতা।—সে মৃতবৎসা জননী—'যেতে নাহি দিব' বলিয়া সে সন্তানকে বুকে আঁকড়িয়া ধরে, 'তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়।' কঠিন নিয়ম-ধারার জন্য একদিন যে প্রকৃতিকে কবি তিরস্কার করিয়াছিলেন, আজ তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইয়া কবি বুঝিলেন—কঠিন নিয়ম প্রকৃতির নহে, সে নিয়ম বিশ্বস্রষ্টার ; সেই নিয়মের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া মাও কাঁদিতেছে, ছেলেও কাঁদিতেছে। তাই প্রকৃতির প্রতি দরদে কবির মন ভরিয়া উঠিয়াছে—'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় যেমন জননীত্বের আকুতি ফুটিয়াছে, তেমনি 'বসুন্ধরা'য় সন্তানের ব্যাকুলতা ফুটিয়াছে।

কবি ইহার পরে কিছুকাল বিশ্ব-প্রকৃতির দিক্ হইতে মানব-প্রকৃতির দিকে ফিরিয়াছেন ; তাহার পরে পুনরায় প্রকৃতির দিকে যখন ফিরিলেন, তখন প্রকৃতিকে দেখিলেন আর-এক চোখে—তখন প্রকৃতিতে আর মানবিকতা নাই, মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ তখন আর প্রকৃতিতে কবি আরোপ করিলেন না, তখন প্রকৃতিতে কবি দেখিলেন ঐশিকতা—humanity হইতে divinity-তে কবি উপনীত হইলেন। ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি তখন উপসংহৃত হইয়াছে, অতীন্দ্রিয়-দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে—প্রকৃতির স্থূল যবনিকা তখন স্বচ্ছ সূক্ষ্ম লূতা-জালে পরিণত হইয়াছে। সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া কবি দেখিলেন লীলা-ময়কে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য এখন কবির কাছে সেই লীলাময়েরই লীলা মাত্র। 'নৈবেদ্যে'ই কবি প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে ঐশিকতা অনুভব করিলেন,

'খেয়া'তে তাহা স্পষ্টতর হইল। 'প্রশান্ত আনন্দঘন আকাশের তলে' 'মুগ্ধ সম শিরায় শিরায় আতপ্ত প্রেমাবেশ' লইয়া কবি ঘুরিতেছেন সেই লীলাময়কে লক্ষ্য করিবার জন্য। যে 'অরূপ-রতন' আশা করিয়া কবি 'রূপসাগরে ডুব' দিয়াছিলেন এখন তাহার সন্ধান পাইলেন।

ইহার পরে ক্রমে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালিতে কবির রসের কারবার সবই বিশ্বনাথের সঙ্গে অপরোক্ষভাবে; বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ এখন গৌণ। বিশ্বপ্রকৃতি কখনো ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে দেয়াসিনী, কখনো দয়িতের সহিত মিলনের দূতী, কখনো অন্তঃপুর-পথ-পরিচারিকা প্রতিহারিণী, কখনো 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মতো বিশ্বনাথের সহচরী বিশ্বপ্রকৃতি কবির চক্ষে উপেক্ষিতা। প্রকৃতি কখনো ইঙ্গিতে লীলাময়কে দেখাইয়াছে, কখনো সে কবিকে আঘাত করিয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছে, কখনো কবির পূজার অর্ঘ্যসম্ভার জোগাইয়াছে, পূজার ডালি ভরিয়া দিয়াছে, মালা গাঁথিয়া দিয়াছে; বিশ্বনাথকে বহন করিয়া কখনো বা কবির দুয়ারে আনিয়া হাজির করিয়াছে, কখনো বা তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিয়া কবির সহিত লুকাচুরি খেলিয়াছে, কখনো ভগবানকে বরণ করিয়া কবির মনোমন্দিরে তুলিয়াছে।

নৈবেদ্যের স্তরে কবি যেমন বিশ্বনাথকে প্রকৃতির অতীত 'মহারাজ' প্রভু বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী স্তরে বিশ্বনাথকে তেমন বিশ্বাতীত রূপে দেখেন নাই। কবি বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বনাথকে অভিন্নাত্মক রূপে দেখিয়াছেন; এখন লীলাময়ী প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে বিরাজমান লীলাময়ের মহারাজত্ব ও প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছে।

আবার কবির নিজের সঙ্গেও প্রকৃতির অভেদাত্মকতা কল্পনা করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। লীলাময়ের সঙ্গে শুধু নিজেরই মধুর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন নাই, কবি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেও লীলাময়ের সেই প্রকার সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। আরও উচ্চ স্তরে কবি কেবল নিজের সঙ্গেই ভগবানের রস-সম্পর্কের কথা নয়, মহামানবের সহিতও ভগবানের ঐ সম্পর্ক যে সহজ ও চিরন্তন তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার রসবোধের চরম সার্থকতা। এই বিশ্ববোধে কবি মহামানবের সহিত নিজেরও অভিন্নাত্মকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন।

কবির ব্যক্তিত্ব ক্রমে আয়ত হইতে আয়ততর হইয়া বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছে। তাই কবি প্রত্যাশা করেন—

তাঁহার পদধ্বনি প্রত্যেক মানবেরই শোনা সম্ভব, তাই কবি ভাবেন তাঁহার মনে যিনি বিরাজ করেন—'যে ছিল মোর মনে মনে' সেই তিনিই 'শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে সবার দিঠি' এড়াইয়া অভিসারে আসেন।

বলাকায় এই বিশ্ববোধের চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বমানবের সংযোগে বিশ্ব-সংস্থিতির অন্তরে এক প্রবল গতির যোগ হইয়াছে —কবি দেখিতেছেন এক বিরাট্ শোভাযাত্রা অনন্তকাল চলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—ভগবানের মন্দিরের দিকে নয়, ভগবানকে সঙ্গে সঙ্গে সগৌরবে বহন করিয়া লইয়া।

কবি মনোলোকে বিশ্বপ্রকৃতিকে এইভাবে মানব-মনের মাধুরী মিশাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন—ইহাই কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

'বনবাণী'তে কবির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির—উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-জগতের—আত্মীয়তা আরো বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অন্য কাব্যে প্রকৃতির প্রতি কবির দরদ বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া আছে। কিন্তু বনবাণীতে প্রীতিই দরদ ও ইহা একটি স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

এই বইখানি লেখা-সম্বন্ধে কবি কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীব-জগতের আদিভাষা, তার ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়, —তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হ'লে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট্ প্রাণ-সমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমাশক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্ম্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়?' তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর; সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তা হ'লে আমাদের মিলন-সঙ্গীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন,—দুইয়ে মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি

শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী,—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ'—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগল; তার কত রেখা, কত ভঙ্গি, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চির-প্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীর ভাবে বিশুদ্ধ ভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

এখানে (ভিয়েনা নগরে) ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কতদিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দ-রূপ আমি দেখ্‌ব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম প্রৈতির বন্ধ-বিহীন প্রকাশ-রূপ দেখ্‌ব সেই নাগ-কেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে প্রতি নিস্তব্ধ রাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটার সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দাম বেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়? কোলাহল থেকে সঙ্গীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম, তখন মনে প'ড়ে গেল সেই সঙ্গীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজ্‌ছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,—তাদের কাছে চুপ ক'রে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরণা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হ'য়ে স্নিগ্ধ হ'য়ে তবেই আনন্দ-লোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরম সুন্দরের মুক্তরূপ প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ, আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর প্রতি কবির প্রীতি এই বনবাণী-কাব্যে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—এই বিশ্ববোধ বিশ্বমৈত্রী ও করুণা ইহার মধ্যে চারিটি বিভাগে বিন্যস্ত হইয়াছে—১। বন-বাণী, ইহাতে আরণ্যক তরুলতা ও পশু-পক্ষীর সম্বন্ধে কবির মমত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ২। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা—যিনি বিশ্বেশ্বর তিনি নাটের গুরু, তিনি নটরাজ; ঋতুতে ঋতুতে তাঁহার বিবিধ নৃত্যলীলা জগতে প্রদর্শিত হয়, ঋতুগুলিই যেন তাঁহার রঙ্গপীঠ।—"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হ'য়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হ'তে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পার্‌লে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস

উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়; 'নটরাজ' পালা গানের এই মর্ম।" ৩। বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব। ৪। নবীন—বসন্তের চিরনবীনতার আবির্ভাবে কবি-মনের আনন্দোৎসব। শান্তিনিকেতনে ঋতুতে ঋতুতে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত ছাত্রদের মনের সংযোগ-সাধনের উদ্দেশ্যে এগুলি লেখা হইয়াছিল। নবীন হইতেছে বসন্ত ঋতুকে আবাহন।

এই সকল বিভাগেই কবি তাঁহার অনন্তকে ও অসীমকে উপলব্ধি এবং বিশ্বসৌন্দর্যে নিমজ্জন-জনিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে করুণা ও বিশ্বমৈত্রীও প্রকাশ পাইয়াছে।

বনবাণীর সকল কবিতারই রচনার উপলক্ষ্য-সম্বন্ধে একটু করিয়া পরিচয় নিজেই দিয়া রাখিয়াছেন।

পরিশেষ

১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত। কবি অনেক দিন হইতে কেবলই মনে করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহার যাহা দিবার তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে; যে কাব্য তিনি দিতেছেন তাহা তাঁহার শেষ দান, তাঁহার পরমায়ু অবসানের শেষ প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাই কবি 'খেয়া' নাম দিলেন তাঁহার অনেক দিন আগের এক কাব্যের, পরে আর এক কাব্যের নাম দিলেন পূরবী, এবং তাহারও পরে যখন তাঁহাকে দিয়া তাঁহার 'বিচিত্রা' বাণীবন্দনার আয়োজন করাইয়া ছাড়িলেন, তখন কবি সেই বিচিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

তবুও কেন এনেছ ডালি দিনের অবসানে?
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি' নিঃস্ব-করা দানে?

—বিচিত্রা

এবং দিনের অবসানে সজ্জিত এই ডালির নাম কবি রাখিয়াছেন 'পরিশেষ'।

বিচিত্রা তাঁহাকে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া—সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া কবির জীবনদেবতা কবিকে 'পূজার অর্ঘ্য বিরচন' করাইয়া ছাড়িয়াছেন।

তিনি বারংবার মনে করিতেছেন—

রবি-প্রদক্ষিণ-পথে জন্মদিবসের আবর্তন
হ'য়ে আসে সমাপন।

—জন্মদিন

যাত্রা হ'য়ে আসে সারা—আয়ুর পশ্চিম-পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।

—বর্ষ-শেষ

কিন্তু কবির যাত্রার কোথাও তো সমাপ্তি নাই, তিনি যে মহাপথিক—তাই কবি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম।

তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে,
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

কবি মৃত্যুঞ্জয়। কবি প্রাণময়। রুদ্রের প্রবলতম আঘাত যে মৃত্যু তাহারও সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃত্যুঞ্জয় কবি সেই দুর্জয় নির্দয়কে বলিতেছেন—

এই মাত্র ? আর কিছু নয় ?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড় ব'লে নিয়েছিনু গণি'।

যখন রুদ্রের চরমতম আঘাত বক্ষে আসিয়া বাজে, তখনও মানুষ তাহা সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, মানুষের সহ্যশক্তি অসীম। অতএব সেই সামান্য মানব ভগবান অপেক্ষাও এক হিসাবে বড়—ভগবানের শেষ দণ্ড মৃত্যুর অপেক্ষা তো নিশ্চয়ই বড়। তাই কবি সাহস করিয়া বলিতেছেন—

যত বড় হও
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়—এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।

—মৃত্যুঞ্জয়

যেখানে নবীনতা, যেখানে সৌন্দর্য প্রাচুর্য আনন্দ, সেখানে প্রাণমন্ত্রের সাধক কবির আসন পাতা থাকে। যিনি চিরসুন্দর তিনি কবির চিরসাথী। উভয়ের চলার একই ছন্দ, উভয়ের চলা একই সঙ্গে।—

চিনি নাহি চিনি চির-সঙ্গিন
চলিলে আমার সঙ্গে।

এবং কবি সেই চির-সঙ্গিনীকে বলিতেছেন—

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদ্গাথা সুপবিত্র।

কিন্তু সেই সঙ্গে—

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি,
আঁধারে হতেছে গুপ্ত।

কিন্তু কবির সহিত তাঁহার চির-সঙ্গিনীর তো বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না, বিচ্ছেদই যদি ঘটিবে তবে তিনি চির-সঙ্গিনী হইবেন কেমন করিয়া। তাই ভরসা লইয়া কবি বলিতেছেন—

মরণ-সভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয়।

—তুমি

এই পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও আশা-আশ্বাসের সহিত কবি বলিয়াছেন—

এই গীতি-পথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম।

ইহাই হইল পরিশেষ কাব্যের অন্তরের কথা। ইহা ব্যতীত নানা উপলক্ষ্যে লেখা—বিবাহ, নামকরণ, বক্সাদুর্গে বন্দীদের সম্বোধন, ইত্যাদি—কতকগুলি কবিতা আছে। কতকগুলি কথিকা জাতীয় কবিতা ও গাথা-জাতীয় কবিতা আছে। তাহার কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ গদ্যে লেখা। পরিশেষের পরিশিষ্টে শ্রীবিজয়-লক্ষ্মী, সিয়াম, বোরোবুদুর প্রভৃতি দেশ-ভ্রমণ-উপলক্ষ্যে লেখা কবিতা আছে। ইহার দুই-তিনটি কবিতা কবির 'যাত্রী' নামক পুস্তকেও আছে।

পরিশেষ কাব্যখানিতে কবির মনোজগতের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এই কাব্য রচনার কাল হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সকল সৃষ্টিই কবির আত্মদর্শনের কথায়, আত্মস্বরূপ বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। কবির জীবনদেবতা এই সময় হইতে

বড়ো বেশি করিয়া কবিচিত্তে আত্মোপলব্ধির বাসনা, অসীমের ক্ষুধা সঞ্চার করিয়াছেন।—

আমার বাণীতে দাও সেই সুধা
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার
গভীরতম ক্ষুধা।

বিশ্বরহস্তের গভীর অনুভূতি কতকগুলি কবিতায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে, সৃষ্টি ও মানবজীবনের স্বরূপ কবি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টির গতি-বেগের অনুভূতি এ কাব্যে বিশেষ স্পষ্ট হইয়াই আছে। কবির জীবনে সন্ধ্যা নামিতেছে, কিন্তু মৃত্যুর জন্য কবিচিত্তে খেদ নাই—মৃত্যু তো কোনদিনই তাঁহার দৃষ্টিতে জীবনের শেষ পরিণতি নহে—ওই শেষের মধ্যেই তো অশেষ আছে। তাই মৃত্যুর খেয়া বাহিয়া কবি অসীমের সন্ধানে যাত্রা করিবেন।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড় একাত্মতাবোধ, প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে অসীমকে ব্যক্ত হইতে দেখা, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ, কল্পনাপ্রবণতার অসাধারণ বিকাশ, অজানা অপরিচিত অসীমের জন্য কবিচিত্তের আকুলতা—রবীন্দ্রপ্রতিভার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহার সবই এই পরিশেষ কাব্যে অক্ষুন্ন হইয়াই আছে। বিশ্বজীবন ও বিশ্বসত্তার প্রতি যে আকর্ষণে কবি আকৈশোর আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন সেই আকর্ষণ কবির মধ্যে এ যুগেও এতটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বরং মৃত্যুর তোরণখানি উত্তীর্ণ হইয়া অন্য আর এক লোকে উপনীত হইবার পূর্বমুহূর্তে বিশ্বসত্তার প্রতি কবির আকর্ষণ নিবিড়তর হইয়াছে, জীবনের মহিমা উজ্জ্বলতর হইয়া কবির চোখে প্রতিভাত হইয়াছে। জীবনের আলো, সুখ-দুঃখ কান্না-হাসি আরো মধুময় বলিয়া কবির মনে হইয়াছে। তাই 'বিরাম সমুদ্র তটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়' পৌঁছিয়াও কবি 'বিশ্বসত্তার পরশ' ব্যাকুল, 'স্থলে জলে তলে তলে' যে গূঢ় আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছে তাহাকে অনুভূতির মাঝে ধরিবার জন্য তাঁহার অন্তবিহীন আকুতি। এখন কবির কামনা—তিনি বিশ্বের কর্মক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবেন, এবং—

স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি' লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।

এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা।

—জন্মদিন

'পরিশেষে'র অনেক কবিতায় নূতন জীবন নূতন করিয়া কবিকে আহ্বান করিয়াছে। প্রকৃতি নূতনতর মাধুরীতে ভূষিত হইয়া কবির চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। জগতের সেই আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ কবি গ্রহণ করিয়াছেন। নূতনের তরঙ্গমাঝে যোগ দিয়া কবির অন্তর তৃপ্তিতে উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে।

প্রণাম

'প্রণাম' কবিতাটি কবির পূর্বস্মৃতি পর্যালোচনায় ও কবি-কর্মের বিশ্লেষণের কথায় পরিপূর্ণ। সুদীর্ঘ কবিজীবনে যে সাধনা কবি করিয়া আসিয়াছেন, এখানে আসিয়া একবার পিছন ফিরিয়া কবি তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

জীবনের যাত্রাপথে চলার সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবি নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। কবি সেই বাঁশিতে সুর তুলিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। দুর্লভ ধন, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা ও কর্মজগতের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কবি কল্পনার কুঞ্জবনে চিরজীবন কুসুমচয়ন করিয়াই ফিরিয়াছেন, আনমনে অর্থহীনভাবে জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। বিচিত্রা জীবনদেবতা কবিকে তাঁহার জীবনের যাত্রারম্ভকালে যখন আহ্বান জানাইয়াছিলেন, কবি তখন সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।—

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
"কে যাবে সাথে।"
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে;
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নূতন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়,
সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে।

—সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা

জীবনের আরম্ভকালে কবি ঐ বিচিত্রার ইঙ্গিতে চলিতে সুরু করিয়াছিলেন—

তারপরে কভু উঠিয়াছে মেঘ
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি। —সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা

কবি তাঁহার দীর্ঘ জীবনপথ বাহিয়া আজ জীবন-সায়াহ্নে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন এবং এ চিরজীবন তিনি কেবলই বিশ্বরহস্যের গভীর স্পর্শ চাহিয়াছেন, বিশ্বের বহু বিচিত্র সৌন্দর্যকে ভাষায় ছন্দে সুরে মূর্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিয়া আসিয়াছেন।

গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশী কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্ত্রতে। —প্রণাম, পরিশেষ

সুদীর্ঘ জীবনকালে কবি নিরন্তর বিরাটের প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, অনন্তের আনন্দ বেদনা, নির্বিশেষের অনুভূতি তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে—এবং কবি সেই গাঢ় গূঢ় অনুভূতিকে সুরে ছন্দে গানে প্রকাশ করিয়াছেন। কবির কবিতা সত্যই বিরাটের ব্যঞ্জনায়, নির্বিশেষের দ্যোতনায় পরিপূর্ণ। বিশ্বপ্রকৃতির রস ও রহস্য কবির অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি-লোকে যে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই সঙ্গীতের আকারে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অন্তরের আনন্দ বেদনা।

বিচিত্রা

কবির যিনি জীবনদেবতা, যিনি তাঁহার দোসর, লীলা-সঙ্গিনী খেলার সাথী তাঁহাকে কবি 'বিচিত্রা' নামে সম্বোধন করিয়াছেন এই কবিতায়। এই

বিচিত্রার বাঁশির সুরে আকৃষ্ট হইয়াই কবি রঙের রঙ্গভূমির মাঝে চিরজীবন বিচরণ করিয়াছেন, রূপকথার বাটে বাটে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই বিচিত্রা কবিকে সমস্ত খণ্ডতা, সীমাবদ্ধতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে মুক্তিদান করেন। ইঁহার হাত ধরিয়া কবি ক্ষণে ক্ষণে ধূলির সীমা অতিক্রম করেন, অন্তবিহীন তেপান্তরের মাঠে পৌঁছিয়া অসীমের সহিত সাযুজ্য লাভের যে আনন্দ, সেই আনন্দের অধিকারী হন। বিচিত্রা এই জীবনদেবতা কবির ধ্যানদৃষ্টিকে উন্মুক্ত করেন, ইঁহারই প্রসাদে কবির অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সন্ধানপরতা জাগে। কবির মধ্যে নূতন বিস্ময়ের আনন্দ ইনিই সঞ্চার করিয়া থাকেন, এই বিচিত্রাই 'নিশীথিনীর মৌন যবনিকা' উত্তোলন করিয়া রাত্রির রহস্য ও রূপমাধুর্য কবির সম্মুখে উদ্ঘাটন করেন। ইঁহারই আহ্বানে কবির মধ্যে চিরনবীন গতির উন্মাদনাও জাগিয়াছে। কবি যখন তাঁহার জীবনসন্ধ্যায় শান্তির স্নিগ্ধ রজনীগন্ধা চয়ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন তখন ইনিই কবিকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন।—

গম্ভীর রবে হাঁকিয়া গেছ
"অলস থেকো না গো।"
নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া
বলেছ, "জাগো জাগো।"
বাসর ঘরে নিবালে দীপ
ঘুচালে ফুল হার,
ধূলি আঁচল দুলায়ে ধরা
করিল হাহাকার।

বিচিত্রা এই জীবনদেবতার আহ্বানে কবি সাড়া দিতে কখনো পরাঙ্মুখ হন নাই। কখনো শোভন শতদলে,—হাসির অর্ঘ্যে জীবনদেবতার পূজা তিনি করিয়াছেন। কখনো 'আঁখিজলে' কবি সে পূজা সারিয়াছেন।—

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,—
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।

ফসল যত উঠেছে ফলি'
বক্ষ বিভেদিয়া
কণা-কণায় তোমারি পায়ে
দিয়েছি নিবেদিয়া।

জন্মদিন

রবি-প্রদক্ষিণ পথে কবির জন্মদিনের আবর্তন শেষ হইয়া আসিতেছে। কবি এখন কর্মডোর ছিন্ন করিয়া ছুটির আনন্দে মাতিয়া উঠিবার প্রয়াসী। কাজের চাকায় বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া কবিমন অধীর হইয়া উঠিয়াছে; কাজের জগৎ, প্রয়োজনের জগৎ কবিকে উদার উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির সত্তার সহিত সংযুক্ত হইতে দেয় নাই। তাই কবি আজ তাঁহার জন্মদিনে বিশ্বসত্তার পরশটুকুর জন্য কাঙাল হইয়া উঠিয়াছেন। স্থলে জলে আর গগনে গগনে যে গূঢ় আনন্দ-চাঞ্চল্য বিরাজিত, কবি আজ তাঁহার জন্মদিনে সেই আনন্দধারা অন্তর ভরিয়া পান করিয়া লইবার প্রত্যাশী।

এই বিশ্ব সত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি' লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায়,
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।

পঁচিশে বৈশাখ পুরাতন পৃথিবীতে কবির নব জন্ম হইয়াছে। ঐ দিনটিতে কবির আত্মবিস্মৃতির কুজ্ঝটিকাজাল অপসারিত হইয়া যায়। তাঁহার চেতনা সূর্যের মত প্রখর দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠে। তিনি চিরনূতন ও চির-আনন্দের অমোঘ আহ্বান ঐ দিনটিতে বড়ো বেশি করিয়া শুনিতে পান।

পান্থ

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি চির-পথিক আছে। সে কবিকে গতির নেশায় ভরিয়া তোলে। তাহারই প্রেরণায় কবি 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য

কোনোখানে'—বলিয়া নিয়তই যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই যাত্রা সকল প্রকার খণ্ডতা সঙ্কীর্ণতা হইতে অসীম অখণ্ডের পানে। পরিপূর্ণতার উদ্দেশে তাঁহার যাত্রা। তাই তিনি বারংবার নানা স্থানে নানা উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন—

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।
পথের নেশা আমার লেগেছিল
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

না চলতে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হলে খরচ করতে সংকোচ হয়।

পান্থ কবিতার মধ্যে সুদূরের পিয়াসী রবীন্দ্রনাথের রুদ্ধ জীবন হইতে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িবার সেই আকুতিই প্রকাশ পাইয়াছে—

হে মহাপথিক
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্ব ভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

চলার মাঝেই কবি মুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট মুক্তির নামান্তরই চলা। তিনি সাধক নহেন, নিছক ভাবসাধনা তাঁহার জীবনের ব্রত নহে। তিনি কবি, রূপের সাধক। ধরণী-গগনের রূপ রস বর্ণ গন্ধ গানকে প্রাণের পত্রপুট মেলিয়া ধারণ করিবার জন্য তিনি চির-সমুৎসুক। তিনি বারংবার বলিয়া আসিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

ছায়া আলো, মন্দ ভালো, লাভ ক্ষতি, কান্না হাসি মিশানো এই জগৎ কবির চক্ষে পরম রমণীয়। তাই তিনি বলেন—'সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।' এবং—

জন্মেছি যে মর্ত্যক্রোড়ে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

সবার সহিত যুক্ত থাকিয়া, এই বিশ্বজীবনের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া কবি মুক্তি প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। কবির মুক্তির পথ জগৎকে অস্বীকার করিয়া নহে। মর্ত্যপ্রীতি এবং মানবমুখিতা কবির মুক্তিসাধনার সহিত জড়িত। একথা 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' ঘোষিত হইয়াছে, চিত্রা, চৈতালি, নৈবদ্যে, গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতেও বিভিন্ন কবিতায় উচ্চারিত হইয়াছে। পরিশেষের এই পান্থ কবিতাতেও সেই কথাই ঘোষিত হইয়াছে।

ক্ষণিকার উদ্বোধন কবিতায় কবি যেমন শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গাহিয়া কেবল বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ভাসিয়া চলিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, পরিশেষের পান্থ কবিতার মধ্যেও কবির মধ্যে তেমনি বাসনার সঞ্চার হইয়াছে। কবি তাঁহার জীবনতরীর পালখানি পলাতকা বাতাসে ভরিয়া তুলিয়া সবার সহিত ভাসিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল। জগতের আনন্দযজ্ঞে তাঁহার নিত্য নিমন্ত্রণ। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া যাত্রা করিয়া চলার মধ্যেই কবি মুক্তিপথের সন্ধান পান। পুরাতন সঞ্চয়ের প্রতি মমতা না করিয়া ক্ষণিক জীবনের আনন্দগানে ও ক্ষণিক-দিনের উৎসবে মগ্ন হইবার জন্য কবির ঔৎসুক্যের সীমা নাই। বৈচিত্র্যময় ক্ষণসুন্দরই কবিকে চিরসুন্দরের দিকে অভিসারযাত্রায় আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ মিলন গ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

তুলনীয় :—

শুধু অকারণ পুলকে
নদী-জলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর 'পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্মর তানে ভরে ওঠ্ গানে শুধু অকারণ পুলকে॥ —ক্ষণিকা, উদ্বোধন

আছি

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতির দুই রূপ—শান্ত ও রুদ্র। কখনও প্রকৃতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে বসন্তের আবেশ হিল্লোলে, মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে,—আবার কখনও প্রকৃতি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে "ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বেঁধে মত্ত হাহারবে" উন্মাদিনী কালবৈশাখীর বেশে। বিশ্বপ্রকৃতির স্নিগ্ধশ্যামল করুণকোমল রূপ আর রুদ্রমূর্তি,—এ দুইই কবিচিত্তকে সমানভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। কখনও তিনি পদ্মার শ্যামল আর নীল পরিবেশের ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন, আবার কখনও বীরভূমের ধূ ধূ করা বন্ধুর মাঠ, সরসতাবিহীন দূর দিগন্ত তাঁহার মধ্যে অপার অসীম বিস্ময় জাগাইয়াছে। বৈশাখের তপ্ত বাতাসে, বৈশাখের রিক্ততার মাঝেও তিনি সৌন্দর্য দেখিয়াছেন—সে সৌন্দর্য বৈরাগ্যের সৌন্দর্য্য। বৈশাখের অথবা তাল আর শালের বাহিরের রুক্ষতার আড়ালে যে সরস মহিমময় একটি রূপ আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই।

পদ্মার কাছ হইতে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাইয়াছিলেন। তাহা গতির বাণী, শান্তির বাণী। বীরভূমের প্রকৃতি হইতে কবি পাইয়াছিলেন রুদ্রের বাণী। প্রকৃতির সেই ভৈরবমূর্তি কবির অন্তর্দৃষ্টিকে খুলিয়া দিয়াছিল; বাহিরের রিক্ততার অন্তরালে—সামান্যের আবরণের আড়ালে যে অসামান্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা দেখিবার মত ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে সঞ্চার করিয়াছিল।

'আছি' কবিতাটিতে প্রকৃতির এই রুক্ষ রুদ্র রূপ প্রকাশিত। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মন লইয়া কবি বৈশাখী প্রকৃতির একটি সরল অনাড়ম্বর চিত্র কবিতাটির মধ্যে আঁকিয়াছেন। কিন্তু সামান্য সাধারণের অনাড়ম্বর বর্ণনা কবিতাটির মধ্যে থাকিলেও কবির অনুভূতির তীব্রতা কবিতাটিতে এতটুকু হ্রাস পায় নাই। বৈশাখের তপ্ত বাতাসের 'যা খুশি তাই' খেলা কবির সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। বৈশাখী তপ্ত বাতাস যে অহেতুক প্রকাশিত হইতেছে না তাহা কবির কাছে ধরা পড়িয়াছে। বৈশাখী বাতাস যে ক্ষণে ক্ষণে ধূলা উড়াইয়া পথের ধারের কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলিকে গতির বাণী শুনাইয়া ক্রমাগত 'চলো চলো' বলিয়া দিগন্তের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাও উপলব্ধি করিয়াছে।

কবিতাটিতে কবির মর্ত্যপ্রীতি, মাটির কাছাকাছি থাকায় জীবনের চরিতার্থতা বোধও প্রকাশ পাইয়াছে।—

ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,

* * *

আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।

কবিতাটিতে কবি অত্যন্ত সাধারণ এবং আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মধ্যেও এক অপার রহস্যের সুষমা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বালক

কবিতাটি কবির বালক-কালের স্মৃতিকথায় পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে কবির কবি-ধর্মের কথাও কবিতাটির মধ্যে বর্তমান।

বালক বয়সে নির্জন দ্বিপ্রহরে কবির জীবন নিঃসঙ্গতার মধ্যে অতিবাহিত হইত। নিঃসঙ্গতার মধ্যে কবির কানে ভাসিয়া আসিত দূর আকাশের চিলের ডাক, ঘড়িওয়ালা কোনো বাড়ির ঘণ্টাধ্বনি, ফেরিওয়ালার ডাক। কবির চোখে ধরা দিত পৃথিবীবক্ষের বিচিত্র ছবি। ঐ সব ছবি দেখিয়া আর বিচিত্র ধ্বনি শুনিয়া কবির মন সম্মুখের বিরাট অজানিতের পানে প্রসারিত হইত, কবিচিত্ত দূর হইতে দূরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত। কবি বলিয়াছেন—

তখন বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপরস শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। —জীবনস্মৃতি

কবি এখন সত্তর বছরে পা দিয়াছেন, 'আয়ুশেষের কূলে' এখন তিনি উপনীত। এখনও সেই বালক কালের মতো সুদূরের পানে চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দিয়া বিনা কাজে প্রহর কাটানোর প্রবণতা তিনি হারান নাই। চোখের সামনে তিনি প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য, সামান্য নগণ্য কত কত চিত্র দেখিতে পান। কিন্তু সে সকলের মধ্যেই কবি চিরকালের না-জানা কার যেন শঙ্খধ্বনি শুনেন। সীমার মাঝে অসীমের আনাগোনা নিরন্তর হইতেছে

দেখিয়া কবি আনমনা হইয়া যান। গণ্ডিবন্ধনে বন্দী কবি সীমাহারাকে অরূপসুন্দরকে রূপের জগতের মাঝে যখন প্রকাশ পাইতে দেখেন, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

বর্ষশেষ

পুরাতন বৎসরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কবি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন। কবির জীবন ক্রমশ মৃত্যু-রাজ্যের সমীপবর্তী হইতেছে।—

যাত্রা হয়ে আসে সারা,—আয়ুর পশ্চিম পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।

তাই যে পৃথিবীতে কবি জন্মিয়াছেন, যে ধরণীর বুকে তিনি পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়াছেন—সেই ধরিত্রীর রূপরসগন্ধস্বাদ ও আনন্দ গ্রহণ করিবার ও দুচোখ ভরিয়া উহা দেখিবার ব্যাকুল বাসনা কবিমনে জাগিতেছে। যে সত্তর বৎসর তিনি এই পৃথিবীবক্ষে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন তাহার স্মৃতি এক এক করিয়া তাঁহার মনে জাগিতেছে। মনের গভীরে ডুব দিয়া কবি দেখিতেছেন যে—

আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্মউপবনে
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব অঙ্গে মনে।

জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া চির-সুন্দরের স্পর্শজনিত আনন্দে কবি আজ অধীর।

এ কবিতাটি কবির আত্মবিশ্লেষণের ও আত্মপরিচয়ের কথায় পরিপূর্ণ। চিরজীবন তিনি যে অসীমের জয়গান করিয়া আসিয়াছেন, সীমা-অসীমের মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যে তাঁহার বীণাখানি তুলিয়া লইয়াছিলেন, একথা আজ বড়ো বেশি করিয়া কবিমনে জাগিতেছে। ধূলির আসনে বসিয়া তিনি ধ্যানচোখে ভূমাকে দেখিয়াছেন, কবির সেই ধ্যানদৃষ্টিতে ধরা দিয়াছে আলোকের অতীত আলোক।

জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া কবি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছেন।

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী

রবীন্দ্রনাথের মহুয়া কাব্যের সাগরিকা কবিতাটি যেমন বালিদ্বীপকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা, শ্রীবিজয়লক্ষ্মী কবিতাটি তেমনি যবদ্বীপকে লইয়া লেখা। বালি-দ্বীপকে কবি যেমন একটি সুন্দরী নারীরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং ঐ দ্বীপটির সহিত বিভিন্ন যুগে ভারতের প্রীতি-প্রেমের সম্পর্ককে বিভিন্ন রূপকের মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, ঠিক সেইভাবেই শ্রীবিজয়লক্ষ্মী কবিতায় যবদ্বীপকে একটি অপূর্ব সুন্দর রমণীরূপে কবি কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এবং ভারতের সহিত ঐ দ্বীপের সম্পর্কের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও যবদ্বীপের মধ্যে সংস্কৃতির এক পরিণয়সূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। সে এক সুদূর অতীতের কথা, ভারতবাসী উপনিবেশ স্থাপনের বাসনায় যবদ্বীপে গিয়াছিল। তারপর যুগ যুগ ধরিয়া এই দেশে সংস্কৃতিগত আদান-প্রদান চলিল। ভারতের ভাষার প্রভাব পড়িল যবদ্বীপের ভাষার উপরে। ভারতীয় পূজাপদ্ধতি যবদ্বীপে প্রসার লাভ করিল, ভারতের দেবদেবী যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, পূজা পাইল। রামায়ণ মহাভারতের বাণী এবং কাহিনী ওদেশে পৌছিল।

ইহার পর হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হইল নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডির মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করিল ; ভারতবর্ষের বাহিরে সে যে একদিন বিস্তার ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল, সেকথা সে ভুলিল। ভারত ও যবদ্বীপের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হইল। কবি ইহাকে প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যেকার বিরহ বা বিচ্ছেদরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

বহুকাল অতিক্রান্ত হইল, দুই দেশের মধ্যে বিরহরাত বিরাজ করিতে লাগিল। কোনকালে দুই দেশের মধ্যে যে প্রেম প্রীতির রাখীবন্ধন হইয়াছিল, একথা সকলে ভুলিল।

হাজার বছর পরে কবি যবদ্বীপে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। সেই আমন্ত্রণ কবির নিকট পৌছিতেই তাঁহার মনে ভারত ও যবদ্বীপের প্রেমসম্পর্কের স্মৃতি

জাগিয়া উঠিয়াছে এবং দ্বীপটিতে পৌঁছিয়া অতীতের বহু স্মৃতি কবির মনে ভিড় করিয়া আসিয়া জুটিয়াছে। প্রথম দিনের মিলনের স্মৃতিও কবির মনে উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়াছে—

মুখের পানে চেয়ে তোমায় আবার পড়ে মনে
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।

একদিন প্রেমিক ভারত প্রেমিকা যবদ্বীপকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, প্রীতির প্রেরণায় কত উপহার দিয়াছিল, যবদ্বীপের এখানে-ওখানে কবি তাহা বিকীর্ণ দেখিলেন। ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সেখানে আজিও যে বিলুপ্ত হয় নাই তাহা কবির চোখে পড়িল। ভারতের প্রতিনিধি কবি ভারত-প্রণয়িণীকে চিনিতে পারিলেন। তাই কবির মিনতি—

আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
নূতন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।

পুনশ্চ

১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত। ইহা ছন্দোবদ্ধ গদ্যে লেখা কাব্য। গদ্যে লেখা হইলেও ইহার রচনার মধ্যে একটি ছন্দ আছে, তাল আছে; এবং কবিতার রস আছে। লিপিকার রচনার সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে, পার্থক্য এই যে—লিপিকায় সমস্ত কথা গদ্যের আকারে ছাপা হইয়াছিল, আর ইহাতে ভাবানুযায়ী লাইনগুলিকে ভাঙিয়া সাজাইয়া কবিতার আকার দেওয়া হইয়াছে। এই রচনা-পদ্ধতিও কবির এক নূতন সৃষ্টি।

কবির জীবনদেবতা কবিকে দিয়া এক এক সময়ে এক এক নূতন সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন। কবি যতবারই বলিতে চাহিয়াছেন যে এই আমার শেষ সৃষ্টি, ততবারই তাঁহার জীবনদেবতা তাঁহাকে দিয়া নূতন সৃষ্টি করাইয়া ছাড়িয়াছেন। কবি যেবারে পরিশেষ বলিয়া একেবারে কাজে ইস্তফা দিয়া খতম করিয়া বসিতে চাহিলেন, সেবারেও তাঁহার আবেদন না-মঞ্জুর হইয়া গেল—কবিকে কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিতে হইল—পুনশ্চ তাঁহাকে নবসৃষ্টিতে নিযুক্ত হইতে হইল।

অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
    তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
    আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হ'য়ে;
    নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
    নিত্যই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী!
যে অভিসারিকা তারই জয়,
    আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

ভুল বলা হ'লো বুঝি।

সেও তো নেই স্থির হ'য়ে,
    যে পরিপূর্ণ, সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,—
    সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।

বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। —বিচ্ছেদ

এই তো কবি রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের কথা ও তাঁহার কাব্যে অন্তরের বার্তা।

দ্রষ্টব্য—প্রাচীন সাহিত্য ও লিপিকা পুস্তকে মেঘদূত প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি, যাত্রী প্রভৃতি পুস্তকে এই পূর্ণ-অপূর্ণের মিলন-সাধনার কথা।

কালের যাত্রা

ইহা নাটিকা। ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত। ইহার মধ্যে দুইটি নাটিকা আছে—১। রথের রশি, ২। কবির দীক্ষা।

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে কবির একটি নাটক বাহির হইয়াছিল—রথযাত্রা। তাহাকেই একটু বদল করিয়া ও বর্ধিত করিয়া লিখিত হইয়াছে 'রথের রশি'।

মহাকালের রথ অচল হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, ক্ষত্রিয় রাজা সেনাপতি ও সৈন্যসামন্তদিগের বীরত্বের আস্ফালন, শ্রেষ্ঠী ধনপতির ধনবল, কিছুতেই সেই রথকে চালাইতে পারিল না। মেয়েরা কত মানত করিল, কত তুক্‌তাক্ করিল, কত পূজা দিল, কত লোকে কত টানাটানি করিল; কিন্তু রথের চাকা বসিয়া যায় ছাড়া আর চলে না; রশি টানিয়া রথ কেহ চালাইতেই পারে না। এতদিন এই রথ ব্রাহ্মণেরাই চালাইয়া আসিয়াছেন;

> তখন যে এঁরা স্বাধীন সাধনার জোরে নিজে চল্‌তেন, চালাতেও পারতেন। এখন এঁরা ধনপতির দ্বারে অচল হ'য়ে বাঁধা, এখন এঁদের হাতে কিছুই চল্‌বে না। —রথযাত্রা

তাই মন্ত্রী কোনো উপায় না দেখিয়া বলিতেছেন—

> দেখ শেঠজী রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চল্‌ছে মহাকালের রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হ'য়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা, তখন তাঁরা রশি ধর্‌তে-ধর্‌তে রথটা ঘুম-ভাঙা সিংহের মতো ধড়্‌ফড়্ ক'রে ন'ড়ে উঠ্‌ত। এবারে সে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বলো শস্ত্রই বলো সমস্ত অর্থহীন হ'য়ে পড়েছে…।

তখন শূদ্রের দল হৈ হৈ করিতে করিতে আসিয়া পড়িল—তাহারা রথের রশি টানিয়া মহাকালের রথ চালাইবে। এতদিন তাহারা মহাকালনাথের রথের চাকার তলায় পিষিয়া মরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এবার তাহারা আসিয়াছে মরিতে নয়—মরীয়া হইয়া রথ চালাইতে—তাই তাহাদের দলপতি বলিতেছেন—

> এবারে রথের তলাটাতে পড়্‌বার জন্যে মহাকাল আমাদের ডাক দেননি—তিনি ডেকেছেন তাঁর রথের রশিটাকে টান দিতে। —রথযাত্রা

আমরাই তো যোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ ; আমরাই বুন্‌ছি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা !
—রথযাত্রা

দলপতি তাহার শূদ্র সহচরদের ডাক দিয়া বলিল—"আয় রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি"।

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বলিল—"কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। বরাবর যে রাস্তায় রথ চলেছে, যেয়ো সেই রাস্তা ধ'রে। পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।"
—রথের রশি

মন্ত্রীর বড় ভয়, পাছে রথ বাঁধা পথ ছাড়িয়া কোনো নূতন পথে চলে এবং অবশেষে তাঁহারই মতন অভিজাত ধনী-সম্প্রদায়ের কোনো বিপদ ঘটায় ! ইঁহারা এতদিন শূদ্রদের দমাইয়া নীচে রাখিয়া মহাকালের প্রসাদ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

শূদ্রদের টানে রথ চলিল, মহাকালের জাত গেল ও তাঁহার গতি হইল, তাঁহার রথ—"মান্‌ছে না আমাদের বাপ-দাদার পথ !"

এমন সময়ে কবি আসিয়া উপস্থিত। সকলে কবির কাছে এই আজব ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"এ কী উল্টোপাল্টা ব্যাপার, কবি ? পুরুতের হাতে চল্‌ল না রথ, রাজার হাতে না, মানে বুঝ্‌লে কিছু !"

উত্তরে কবি বলিলেন—ওদের "মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—নীচের দিকে নাম্‌ল না চোখ, রথের দড়িটাকেই কর্‌লে তুচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, তাকে ওরা মানে নি।...... পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি। রথের দড়ি কি প'ড়ে থাকে বাইরে ? সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা—দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে। সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।......এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না ;......আজকের মতো বলো সবাই মিলে, যারা এতদিন ম'রে ছিল, তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হ'য়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

এই শ্রেণীর কবিরা কালে কালে লোকেদের মহাকালের রথ চালাইবার উপায় নির্দেশ করিয়া দেন—তাঁহারা বলেন তাল রক্ষা করিয়া ছন্দ বাঁচাইয়া চলো, তাহা হইলেই মহাকালের রথের চলার কোনো বিঘ্ন হইবে না। সমাজব্যবস্থায় এক-পেশে ঝোঁক হইলেই রথের চাকা মাটিতে বসিয়া যায়। ইহাই হইতেছে কবির শিক্ষা। সেই শিক্ষা গ্রহণ করিলেই—জয় মহাকাল-নাথের জয় !

'কবির দীক্ষা' নামক অংশে দুইজনের কথা আছে—তথাপি উহাকে ঠিক নাটক বলা যায় না, উহার মধ্যে কোনো ঘটনা নাই, কোনো গতি নাই, আছে কেবল একটু তত্ত্ব। কবি শিব-মন্ত্রের উপাসক, তিনি লোককে শিবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন। এই শিব-মন্ত্র হইতেছে ত্যাগের মন্ত্র—কারণ মহাদেব ভিক্ষুক। এই যে ত্যাগ তাহা শূন্য ঘড়টাকে উপুড় করা নয়,—

ত্যাগের রূপ দেখ ঐ ঝরণায়, নিয়ত গ্রহণ করে, তাই নিয়তই করে দান।…… দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ত্ব, মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে। মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন ব'লে নয়, আমাদের দানকে কর্‌তে চান সার্থক।……কিছু তিনি চান্‌নি কুকুর-বেরালের কাছে। অন্ন চাই ব'লে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে। বেরোলো মানুষ লাঙল কাঁধে। যে-মাটি ফাঁকা ছিল, প্রকাশ পেল তাতে অন্ন। বললেন—চাই কাপড়—হাত পেতেই রইলেন। বেরোলো ফলের থেকে তূলো, তূলোর থেকে সুতো, সুতোর থেকে কাপড়। ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অসীম তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের। নইলে দিন কাট্‌ত কুকুর-বেরালের মতো। তোমরা কি বলো সব চেয়ে সন্ন্যাসী ঐ কুকুর-বেরাল। মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি, তবে ভিক্ষু দেবতার ভিক্ষা হবে যে অচল। তাঁর ভিক্ষার ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী, যদি দান কর্‌তেন ঘট্‌ত সর্বনাশ।

তবে কি য়ুরোপখণ্ডকে বল্‌বে শিবের চেলা ?

বল্‌তে হয় বৈ কি। নইলে এত উন্নতি হয় কেন ? মেনেছে ওরা মহাভিক্ষুর দাবী। তাই বের ক'রে আন্‌ছে নব নব সম্পদ্‌, ধনে প্রাণে, জ্ঞানে মানে।

কবি এই দীক্ষা আমাদের দিতেছেন যে আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে ত্যাগ করিবার জন্য, ত্যাগ করিতে হইবে কল্যাণের জন্য, সাত্ত্বিক ভাবে সচেতন-ভাবে, তমোভাবে ডুবিয়া গাঁজায় দম লাগাইয়া যে সন্ন্যাস সে সন্ন্যাস নয়, মৃত্যু।

প্রাণের ধনই হলো আনন্দ, যাকে বলি রস। যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু। মানুষের যিনি শিব তিনি বিষ পান করেন বিষকে কাটাবেন ব'লে। ভিক্ষা দাও দ্বারে দ্বারে রব উঠ্‌ল তাঁর কণ্ঠে,—সে ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা। নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান। দুর্বল আত্মার তামসিক দানে দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে'।

বিচিত্রিতা

স্বয়ং কবির এবং অপর নানা চিত্রকরের নানা স্টাইলের ছবি লইয়া ছবির একটি এল্‌বামের মতন করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ছবিকে এক-একটি কবিতা লিখিয়া কবি এই কাব্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছবির নামও বোধ হয় কবি দিয়াছেন, এবং কবির ব্যাখ্যা ছবিকে ছাপাইয়া কবিত্বে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সামাজিক তত্ত্বে মিশিয়া রসালো ও অপূর্ব সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

ছবিগুলি বিভিন্ন লোকের অঙ্কিত এবং তাহাদের বিষয়ও বিভিন্ন বলিয়া কবিতাগুলিতেও বিভিন্ন রসের সমাবেশ হইয়াছে। এই জন্য এই পুস্তকের নাম 'বিচিত্রিতা' সুসঙ্গত হইয়াছে।

চণ্ডালিকা

ইহা নাটিকা। ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত। গদ্যে ও গানে লেখা। এই নাটিকার বিষয়-সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় পরিচয় দিয়াছেন—

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দ্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।

গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে আহার শেষ ক'রে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি; কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হলো। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। তার মা যাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত ক'রে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্ক ফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই যাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হলো। পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হ'য়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

এই বৌদ্ধ আখ্যায়িকা চণ্ডালিকা নাটকে কিছু বদলাইয়া গিয়াছে। এখানে অলৌকিকতা বিশেষ কিছু রাখা হয় নাই, যাহা আছে তাহা রূপক বা symbol। চণ্ডালী প্রকৃতি আনন্দকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। সে তাহার মাকে বলিল—"আমি চাই তাঁকে। তিনি আচম্কা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চল্বে বিধাতার সংসারে, এ ত বড় আশ্চর্য কথা।" সে তাহার মাকে অনুরোধ করিল, মন্ত্র পড়িয়া সে টানিয়া আনুক আনন্দকে তাহাদের বাড়ীর দ্বারে। প্রকৃতির মা মন্ত্র পড়িয়া তুকতাক করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতি কল্পনায় দেখিতে লাগিল, যিনি শুদ্ধচরিত্র অপাপবিদ্ধ সাধু—তিনি সেই মন্ত্রের মোহে কামার্ত হইয়া চণ্ডালের দ্বারে অভিসারে আসিতেছেন; তাঁহার চরিত্রের শুভ্রতা কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার গতি হইয়াছে কুণ্ঠিত, পদক্ষেপ লজ্জিত, বক্ষে ভয়, চক্ষে বুভুক্ষা। যেমন কবির 'উদ্ধার' নামক ছোট

গন্ধে গৌরী বাতায়ন হইতে গুরুদেবকে চোরের মতো পুষ্করিণীতটে শিষ্যবধূর কাছে অভিসারে আসিতে দেখিয়া বজ্রচকিতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিয়াছিল, এই চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিও তেমনি নিজের ধ্যাননেত্রে তাহার প্রিয়তমের পতনের ছবি দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল—

ওরে ও রাক্ষুসী, কী করলি, কী করলি, তুই মরলিনে কেন? কী দেখলেম! ওগো কোথায় সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুন্দর স্বর্গের আলো! কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্ম-পরাজয়ের কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে। মাথা হেঁট ক'রে এলো। যাক্, যাক্, এ-সব যাক্—ওরে তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান করিসনে বীরের। জয় হোক, তাঁর জয় হোক।

এমন সময়ে আনন্দ আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধবন্দনা পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির মা মরিয়া গেল—অর্থাৎ প্রকৃতির মনের সেই পাপ মারজয়ী মহাসন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের পুণ্যপ্রভাবে মরিয়া গেল—চণ্ডালিনীও পুণ্যপ্রভাবে পবিত্র হইয়া গেল। জয় হইল পুণ্যের, জয় হইল সংযমের, জয় হইল করুণার, জয় হইল ক্ষমার, জয় হইল আচণ্ডালে প্রীতির ও সাম্যবোধের।

এইরূপ একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া সতীশচন্দ্র রায় ১৩১০ সালের বঙ্গদর্শনে "চণ্ডালী" নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন।

তাসের দেশ

১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসের শেষে প্রকাশিত নাটিকা, রূপক। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ছোটগল্পের মধ্যে একটি গল্প আছে তাহার নাম—'একটা আষাঢ়ে গল্প'। সেই গল্পটিকে অবলম্বন করিয়া এই নাটিকাটি রচিত হইয়াছে—পুরাতনের ইহা নূতন রূপ, গানে কথায় রসে তত্ত্বে একেবারে ভোল ফিরিয়া গিয়াছে।

রাজপুত্র লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া অলক্ষ্মীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন, কারণ "ভীরু করেছে ঐ লক্ষ্মী। সাহস আছে লক্ষ্মীছাড়ার। যার বিপদ নেই, তার ভরসা নেই।" তিনি কূল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিতে চাহেন নবীনার সন্ধানে; রূপ-কথার দেশের সন্ধানে। তিনি মায়ের কাছে বিদায় চাহিলেন। রাজমাতা বলিলেন—"আমি ভয় ক'রে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাব শ্বেতকরবীর গুচ্ছ।"

রাজপুত্রের সঙ্গী হইল সদাগরের পুত্র। নবীনার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য-যাত্রায় তাহাদের তরী ভগ্ন হইল, তাহারা শেষে উপনীত হইল এক দ্বীপে। সেটা তাসের দেশ। সেখানকার লোকেরা সব কাগজের, পেটেপিঠে চেপ্‌টা, তাহারা চৌকা-চৌকা চালে চলে, সবই সেখানে নিয়মে বাঁধা, তাহারা উঠে বসে চলে ফিরে প্রথা ও দস্তুর অনুসারে; কেহ সেখানে হাসে না, হাসা সেখানে নিয়ম নয় বলিয়াই। তাহাদের মধ্যে পদমর্যাদা ধরাবাঁধা সব থাক-বাঁধা, তাহারা চতুর্বর্ণে বিভক্ত। কে যে কবে কেন সেখানে ঐ রকম ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে তাহার কোনো নির্ণয় নাই, তথাপি সেই মান্ধাতার আমলের নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে কেহ সাহস করে না, বর্ণাশ্রম ধর্ম সেখানে কায়েমী। সমাজে কাহার কি মূল্য ও কোথায় কাহার পরে কাহার স্থান তাহা স্থির করা আছে, তাহার প্রতিবাদ করিতে কেহ সাহস করে না, প্রতিবাদ বা বদল যে করা যায় এমন কথাও কেহ ভাবে না। সেখানে সকলেরই গায়ে ফোঁটা কাটিয়া তাহাদের মূল্য নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে—দুরির চেয়ে তিরি বড়, তিরির চেয়ে চৌকা, এবং তাহার পরে পঞ্জা ছক্কা ক্রমে দহলা পর্যন্ত, তাহার উপরে গোলাম, বিবি, সাহেব; কিন্তু সকলের বড় হইল টেক্কা—তাহার মাত্র একটি ফোঁটা মূল্য হইলে কি হয়, তাহার পদমর্যাদা সকলের চেয়ে বেশি। ইহা

সকলেই মানিয়া লইয়াছে, এমন কি নহলা দহলা পর্যন্ত এক দিনও আপত্তি উত্থাপন করে না যে, টেক্কা মাত্র একটি ফোঁটার জোরে কেমন করিয়া তাহাদের অতগুলি ফোঁটাকে পরাস্ত করিতেছে। কারণ, সেটা নিয়মের দেশ। এই সেখানকার মান্ধাতার আমলের নিয়ম, বাপ-পিতামহ মানিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কে যে সেই নিয়ম করিয়াছে, তাহা কেহ নাই বা জানিল, এবং তাহাতে কোনো বিচার ও ন্যায়সঙ্গতি নাই বা থাকিল। সেখানকার সকলেই সনাতনপন্থী। যাহার হাতের পাঁচ সেই তাহাদের ভাঁজিয়া যথারীতি বিতরণ করে; তাহাদের নিজেদের কোনো মতামত নাই।

এই তাসের দেশে এমন দুইজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহাদের একজন রাজপুত্র ও একজন সদাগরের পুত্র—একজনের দেশে দেশে দিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়ানো বৃত্তি, একজনের বন্দরে বন্দরে অচেনা নবীনাকে সন্ধান করিয়া ফেরাই ব্যবসায়। তাহারা ঘরের বাঁধা-বরাদ্দ ছাড়িয়া অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে, তাহারা বাধা ভাঙিয়া সমস্ত কিছু নিজেরা যাচাই করিয়া দেখিয়া লইতে, বিচার করিতে অকূলে ভাসিয়া বিশ্বে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা হাসে, তাহারা গান গায়, তাহারা নিয়ম ভঙ্গ করে। ইহাদের আবির্ভাবে তাসেরা প্রথমে চমকাইয়া উঠিল; কিন্তু তাহাদের গায়ের হাওয়া লাগিয়া তাসের দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাসের দেশে নিজেদের ইচ্ছা বলিয়া একটা সর্বনেশে বস্তু দেখা দিল। তাসের দেশের খবরের কাগজের সম্পাদক চঞ্চল হইয়া তাসের দেশের কৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য খুব ওজস্বী ভাষায় সম্পাদকীয় স্তম্ভ পূর্ণ করিতে লাগিল। অবশেষে দেশের সকলে আইন-অমান্য করিতে ছুটিল। দেশে আর বাধ্যতামূলক আইন রাখা চলিল না। বিদেশীরা তাসের দেশে আনিল মুক্তির গান, অশান্তির চঞ্চলতা, নিয়মের অবাধ্যতা।

তাসের দেশের মেয়েদের ঊর্মিলা নদী ডাক দিয়া বলে তাহাদের কুঞ্চিত কেশদাম বাতাসে উড়াইয়া নাচিয়া চলিতে; ফুল অনুনয় করে তাহাদের অলকে তুলিয়া ভূষণ হইবার জন্য; পাখীরা গান গাহিয়া নিকুঞ্জ-কাননে প্রেমের প্রলোভন শুনায়। সকল দিকে জাগিয়া উঠিল ইচ্ছা, চারিদিকে শোনা গেল নিয়মের গণ্ডি ভাঙার ডাক। ভীরু হইল সাহসী; সকলে স্বাধীন ইচ্ছায় প্রাণশক্তিতে প্রবল হইয়া সনাতনী জুলুম ও অত্যাচারের বিরোধী হইয়া উঠিল।

এই তাসের দেশ যে আমাদেরই সনাতনপন্থী দেশ তাহা না বলিয়া দিলেও

কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। কত বার কত রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র আমাদের এই নির্জীব তাসের দেশে আসিয়া আমাদের কানে মন্ত্র দিয়াছেন—

ভাঙ্‌তে হবে এখানে এই অলসতার বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেল্‌তে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা। ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।

কিন্তু সেই অমৃতময়ী বাণী তো আমাদের রুদ্ধ প্রাণের দরজায় মাথা কুটিয়া অপমানিত হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে। কবি তাঁহার তূর্যকণ্ঠে এই বাণী পুনঃপুনঃ উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। আমাদের তাসের দেশে কি প্রাণের সাড়া জাগিবে না!



উপসংহার

দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করিলাম। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যতীর্থে পরিক্রমণ সমাপ্ত করিলাম। তীর্থরাজের প্রসাদ ও সুফল আমার ভাগ্যে জুটিল কি না তাহা জানি না—তবে পরম শ্রদ্ধার সহিত গুরুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া দীর্ঘ দশ বৎসরের নিরন্তর চেষ্টায় এই দুষ্কর তীর্থভ্রমণ যে সমাপ্ত করিতে পারিয়াছি ইহারই আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ আমার পুরস্কার। আর একটি কথাও মনে জাগিতেছে—এই তীর্থপথে যাঁহারা পথিকৃৎ তাঁহাদিগকে সসম্মানে ও কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণতি জানাইয়া বলিতেছি যে, এই সুদুর্গম তীর্থে আমি যতদূর পর্যটন করিয়াছি, কেহই এতদূর পরিভ্রমণ করিবার আয়াস স্বীকার করেন নাই। আমি এই পথের শেষ পর্যন্ত একবার দেখিয়া আসিলাম এবং এমন অনেক নূতন তীর্থ আবিষ্কার করিলাম, যাহা আমার পূর্বে অন্য কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ অতি বাল্যকাল হইতেই বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর উৎস-মুখ হইতে উৎসারিত অসংখ্য কবিতা ও গান অপূর্ব ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া আমাদিগকে ও বিশ্ববাসীকে নব নব আনন্দরস পরিবেশন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং কবিতার আলোচনা আমি এই রবি-রশ্মির আলোকে আনিয়া ধরিয়াছি। আমার মন-প্রিজ্‌ম যে সকল রশ্মির যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছে তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কাব্য-বিশ্লেষণ ঠিক নির্দিষ্ট বিজ্ঞান নহে, তাহার সম্বন্ধে কেহই শেষ কথা বলিতে পারে না। মানুষের মনের গঠন-অনুসারে একটি কবিতারই অর্থ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। ইহার উদাহরণ কবি নিজেই দিয়াছেন তাঁহার 'পঞ্চভূত' পুস্তকে 'কাব্যের তাৎপর্য' নামক আলোচনায়।

কবি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন—

কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি;
তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি। —গীতাঞ্জলি

কে কেমন বুঝে তাহার'
কেহ এক বলে, কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,
দেখে তুমি হাসো বুঝি। —চিত্রা, অন্তর্যামী

কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েচে—
'যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে কিছু কি ?'
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, 'অর্থ কী জানি !'
তারা হেসে যায়, তুমি হাসো ব'সে
মুচকি' ! —উৎসর্গ, অপরূপ

ল'য়ে নাম ল'য়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি,
ও সকল আনিস্‌নে কানে।
আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে, কে নাই বোঝে, ভাবুক তা নাহি খোঁজে
ভালো যার লাগে তার লাগে।

—বিসর্জন নাটকের উৎসর্গ

আমার এ সব জিনিস বাঁশির মতো—বুঝ্‌বার জন্যে নয়, বাজ্‌বার জন্যে। —ফাল্গুনী

রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক কবি। বিশ্বপ্রকৃতি মহামানব যুগধর্ম ইত্যাদি সৃষ্টির মধ্যে যতপ্রকারের রূপবৈচিত্র্য আছে তাহার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কবির নয়। কবি তাহাদের সঙ্গে নব নব রস-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন। কবি সাধক দ্রষ্টা যুগে যুগে স্রষ্টার সঙ্গে যে গভীর রস-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন, লোকে তাহাকেই রস-ধর্ম বলিয়া মানিয়া লয়। সাধক কবিরা যে ভগবানের সহিত অন্তরঙ্গ রস-সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, তাহাই মহামানবের জীবনধর্ম হইয়া উঠিয়াছে। রসময়ের সহিত এই রস-সম্বন্ধ-বন্ধনের নামই মিস্টিসিজ্‌ম্। কিন্তু ভক্ত প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ যখনই প্রেমে আত্মহারা হইতে চাহিয়াছেন, তখনই শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বিচারের বল্গার দ্বারা সেই আবেগকে শাসন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজ্‌ম্‌কে সেইজন্য সম্যক্‌দর্শন বলা যাইতে পারে।

তিনি যাহা দেখেন বা অনুভব করেন, ঠিক বিচার করিয়া প্রকাশ করেন না, অতীন্দ্রিয় একটি অনুভবকে প্রকাশ করেন। তাহার দ্বারাই সত্যের ও সৌন্দর্যের গভীর রূপ প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু সেই অনুভবের অন্তরালে কবির মগ্নচেতনার মধ্যে একটি বিচারবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র ভাব-বিলাসিতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য বোধ্য-অবোধ্যের সীমানায় দাঁড়াইয়া পাঠককে ও সমালোচককে বোঝা-না-বোঝার দোটানায় ফেলিয়া রঙ্গ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যাখ্যা বহু লোকে বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সকলের উক্তির সার সংগ্রহ করিয়াছি, এবং অনেক স্থলে কবির নিজের অভিমতের দ্বারা যাচাই করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত আমার বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি অবশেষে এই বলিয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকটে ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইতে চাই—

বুঝেছি কি বুঝি নাই বা সে তর্কে কাজ নাই,
ভালো আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই। —প্রবাহিণী

পরিশিষ্ট

মৃত্যু-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা

রবীন্দ্রনাথ সত্য শিব সুন্দরের পূজারী কবি, 'জগতে আনন্দ-যজ্ঞে' তাঁহার নিমন্ত্রণ, সেই যজ্ঞের তিনি প্রধান পুরোহিত। তাই তাঁহার নিকট কোনও ব্যাপারই আনন্দহীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না। যে মৃত্যুর ভয়ে জগৎবাসী সন্ত্রস্ত, সেই মৃত্যুকেও তিনি অভয়-মূর্তিতে দেখিয়াছেন, এবং মৃত্যুর বিভীষিকা মোচন করিয়া মৃত্যুকেও সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন।

কিশোর কবি রাধার বেনামী মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।

—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

কারণ মৃত্যুতে সকল সন্তাপ দূর হইয়া যায়। আর বাস্তবিক মৃত্যু তো কোথাও নাই।—

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
*　　*　　*
এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে,
　　নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি।
চারি দিক্ হ'তে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
　　জীবনের স্রোত মিশে আসি'।
*　　*　　*
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
　　রচিত হতেছে পলে পলে,
　　অনন্ত-জীবন মহাদেশ।

—প্রভাত-সঙ্গীত, অনন্ত জীবন

মহাজীবন হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি-জীবন যেন অগ্নিজ্বালা হইতে বিনির্গত বিস্ফুলিঙ্গ, তাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই লয় পাইয়া নির্বাণ লাভ করে। আর পার্থিব জীবনই তো একমাত্র জীবন নহে, আর এই জীবনও

তো মরণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নহে, প্রতি পলে কত পরিবর্তন ঘটে এই দেহের অন্তরালে, শৈশবের পরে যৌবন ও যৌবনের পরে বার্ধক্য এবং বার্ধক্যের পর দেহান্তর একই মৃত্যুর শৃঙ্খল-পরম্পরা।

যতটুকু বর্তমান তারেই কি বল প্রাণ ?
সে তো শুধু পলক নিমেষ !
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার
কোথাও নাহিক তার শেষ !
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ ম'রে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে !
* * *
মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি।
জীবন তো মৃত্যুর সমাধি !

জীবন-মরণ তো কেবল ইহলোকের ব্যাপার নহে, তাহা লোক-লোকান্তরের একটি সংলগ্ন ঘটনা—

কবে রে আসিবে সেই দিন—
উঠিবে সে আকাশের পথে,
আমার মরণ-ডোর দিয়ে
বেঁধে দেবো জগতে জগতে।
আমার মরণ ডোর দিয়ে
গেঁথে দেবো জগতের মালা,
রবি শশী একেকটি ফুল,
চরাচরে কুসুমের ডালা।

—প্রভাত-সঙ্গীত

কারণ—

অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প'লে
পায় কি নিস্তার ?

এই মরণ-যাত্রায় কাহারও সহিত কাহারও বিচ্ছেদ হয় না, কারণ সকলেই মরণ-যাত্রী। কেহ আগে আর কেহ পিছনে চলিতেছে মাত্র, মহাযাত্রা-পথে

আবার লোক-লোকান্তরে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।—

তোরাও আসিবি সবে উঠিবি রে দশ দিকে,
এক সাথে হইবে মিলন,
ডোরে ডোরে লাগিবে বাঁধন।

জীব অণুচৈতন্য, মহাপ্রাণ বিভুচৈতন্য। অণু ক্রমাগত বিভুত্বলাভের সাধনা করিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

অণুমাত্র জীব আমি কণামাত্র ঠাঁই ছেড়ে
যেতে চাই চরাচরময়।
এ আশা হৃদয়ে জাগে তোমারই আশ্বাস-বলে,
মরণ, তোমার হোক জয়।

—প্রভাত-সঙ্গীত, অনন্ত মরণ

বিশ্বজগৎ নাবিক, আমরা তাহার যাত্রী পথিক, আমরা প্রবাসী, অনন্তের মিলন-প্রয়াসী হইয়া অভিসারে যাত্রা করিয়া চলিয়াছি।

গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হ'তে,
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী ল'য়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান॥
অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিভে যাই,
ম'রে যাই অসীম মধুরে,
বিন্দু হ'তে বিন্দু হ'য়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

—ছবি ও গান, পূর্ণিমায়

আমাদের জীবনের খণ্ডতা কেবল আমাদের পার্থিব জীবনের ব্যাবহারিক বোধ মাত্র, কিন্তু আসলে—

আকাশ-মণ্ডপে শুধু ব'সে আছে এক চির-দিন।

—কড়ি ও কোমল, চির-দিন

আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, তাই আমরা মরণকে ভয় করি। আমরা ভাবি মৃত্যু বুঝি

জীবনের শেষ। কিন্তু দেহটাই আমাদের বর্তমানে সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

—পঞ্চভূত, মনুষ্য

আমাদের অধিষ্ঠান ভূমার মধ্যে। যাহা ভূমা তাহা সত্য, তাহা অমৃত। তাই আমাদের মরণ নাই। মৃত্যু বলিয়া প্রতীয়মান অবস্থা জীবনেরই প্রকারান্তর মাত্র; অসম্পূর্ণ জীবনের সম্পূর্ণতা-লাভের সহায় ও উপায় মরণ। এই সীমাবদ্ধ জীবনে যাহা অপূর্ণ অপ্রাপ্ত থাকে, তাহার সম্পূরণ হয় মরণে। মৃত্যুর পূত-ধারায় ইহ-জীবনের সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ গ্লানি ধৌত হইয়া যায়, তাহার পরে অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ।

জীবনে যত পূজা হলো না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা —গীতাঞ্জলি

জীব তাহার জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করে পরিবর্তন-পরম্পরার ভিতর দিয়া এবং সেই পরিবর্তনেরই নামান্তর মৃত্যু। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ মাতৃগর্ভে বাস করিবার সময়ে মাতাকে চিনে না, কিন্তু মাতৃক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই মাতাকে আপনার সর্বাপেক্ষা আত্মীয় বলিয়া চিনিয়া লয়। তেমনি আমরা মৃত্যুকে অপরিচয়ের জন্য বৃথা ভয় করি। কিন্তু মৃত্যু জীবের পরমাত্মীয়, সে আত্মার প্রণয়ী। মৃত্যু প্রাণের প্রণয়-লাভের জন্য দিবারাত্র সাধনা করিতেছে, তাহার মন হরণ করিবার জন্য তাহার নিরন্তর অবিশ্রাম আরাধনা চলিতেছে; মৃত্যুর চঞ্চলা প্রেয়সী প্রথমে তাহার কাছে ধরা দিতে চাহে না, কিন্তু অবশেষে তাহাদের মনোমিলন ঘটিয়া যায়।—

চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়,
স্থির নাহি থাকে,
মেলি' নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চ'লে যায়
নব নব শাখে।
তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে
বসি' নিরলস
ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হ'য়ে যাবে,
মানিবে সে বশ।

* * *

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এস বরবেশে,

আমার পরাণ-বঁধু ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু ; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি' নিয়ো।
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন-দানে
পাণ্ডু করি' দিয়ো। —সোনার তরী, প্রতীক্ষা

মৃত্যুকে যাহারা ভাল করিয়া চিনিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারা তাহাকে ভীষণ মনে করে ; কিন্তু যাহার সহিত মৃত্যুর মনোমিলন ঘটে, যাহার প্রাণ সে হরণ করে, সে তাহার মনোহারিত্ব বুঝিয়া তাহার মিলনের জন্য সমুৎসুক হইয়াই থাকে—

শুনি' শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
ক্ষেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

—উৎসর্গ, মরণ

যে মৃত্যু লাভ করিয়াছে সে তো সমাপ্ত হইয়া যায় নাই—

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ তারে সর্ব দৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া।

—চিত্রা, মৃত্যুর পরে

আমার জীবন তো আমার এই দেহটির মধ্যেই পরিসমাপ্ত নহে, তাহা নব নব কলেবরে আমার হইয়া আমাকে আমিত্বের আস্বাদ জানাইতেছে ও জানাইবে। আমার জন্ম হইতে জীবন মৃত্যুর অভিসারে চলিয়াছে, সে কি আজিকার ঘটনা ? সে যে—

শত জনমের চির সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী।

—চিত্রা, অন্তর্যামী

আমার জীবনদেবতা যদি আমার ইহ-জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতার আনন্দ না পাইয়া থাকেন, তবে তাহাতেই বা দুঃখ করিবার বা নিরাশাস হইবার কি আছে—

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আর বার,
চির-পুরাতন মোরে,
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন-ডোরে। —চিত্রা, জীবনদেবতা

অনন্ত-পথ-যাত্রী মানব তাহার যাত্রা-পথের একটি আতিথ্যস্থান ছাড়িয়া যাইতে কাতর হয়, সঙ্গীদের ছাড়িয়া যাইতেছে মনে করিয়া ভয় পায়, কিন্তু সে তো চির-একাকী,—

তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে
কোথা হ'তে কোথা গেছ না রহিবে মনে। —চৈতালি, যাত্রী

এবং নব নব পরিচয়ের ভিতর দিয়া তাহার যাত্রা—

পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা ভুলিয়া যাই।
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে
চির জনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে। —গান

যিনি জীবন মরণের বিধাতা, তিনি প্রাণের সহিত মরণের ঝুলন ও দোল খেলা দেখিতেছেন,—তিনি প্রাণকে দোলা দিয়া মরণে-জীবনে চালাচালি করেন,—

পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে নিতেছ টানি'।

* * * *

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও,
বাম হাত হ'তে ডানে।

তাহাতে—

আছে তো যেমন যা ছিল।
হারায় নি কিছু ফুরায় নি কিছু,
যে মরিল, যে বা বাঁচিল। উৎসর্গ, মরণ-দোলা

মৃত্যু পরম কারুণিক, সকলের ভেদ ঘুচাইয়া সমতা-সম্পাদনের সহায়—

ইহ-সংসারে ভিখারীর মতো
বঞ্চিত ছিল যে জন সতত,
করুণ হাতের মরণে তাহারে
বরণ করিয়া নিলে।

* * *

রাজা মহারাজা যেথা ছিল যারা,
নদী গিরি বন রবি শশী তারা,
সকলের সাথে সমান করিয়া,
নিলে তারে এ নিখিলে।

—মোহিত সেন সংস্করণ, মরণ-বরণ

রাজা প্রজা হবে জড়ো,
থাক্‌বে না আর ছোট বড়,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌ব সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে। —প্রায়শ্চিত্ত

মৃত্যুভীতি নবোঢ়ার প্রণয়ভীতির তুল্য, কিন্তু একবার প্রণয়ীর সহিত পরিচয় হইয়া গেলে আর ভয় থাকে না—

প্রথম-মিলন-ভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাট্ মূর্তি নিরখি' মধুর।
সর্বত্র বিবাহ-বাঁশি উঠিতেছে বাজি',
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

জন্মের পূর্বে এই দেহ ও সংসার জীবের অজ্ঞাত থাকে, তাহার সঙ্গে পরিচয় হওয়ামাত্র তাহাদের—

নিমেষেই মনে হলো মাতৃবক্ষ সম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।

তেমনই 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর।'

জীবন আমার
এত ভালবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

ইহলোক ও পরলোক দুই-ই বিশ্বমাতার অমৃতপূর্ণ স্তন, আর মৃত্যু—

সে যে মাতৃপাণি
স্তন হ'তে স্তনান্তরে লইতেছে টানি'। —সোনার তরী, বন্ধন

নিজের মরণে যেমন ভয় বা দুঃখের কোনও কারণ নাই, প্রিয়জনের মৃত্যুতেও তেমনই কোনও ক্ষোভের কারণ নাই।—আমরা ক্ষোভ করি, যে-হেতু—

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা হ'লে
প্রাণ করে হায় হায়।

কিন্তু বাস্তবিক ক্ষোভের কোনো কারণ নাই—

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু। —নৈবেদ্য

যখন মৃত্যু আমাকে পরলোকে লইয়া যাইবে, তখন—

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া,
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া। —নৈবেদ্য

মৃত্যু তো ইহলোক হইতেও চিরবিদায় বা চিরনির্বাসন নহে। দেহ ও আত্মা দুই-ই তো এখানেই নানা আকারে রহিয়া যায়।—মৃত্যুতে হারাইয়া-যাওয়া খোকা হাওয়ায় জলে, তারা আর চাঁদের আলোয় মায়ের কাছে আসা-যাওয়া করে, সে স্বপ্নের ফাঁকে মায়ের মনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। তাই খোকা মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছে—

মাসী যদি শুধায় তোরে—
খোকা তোমার কোথায় গেল চ'লে।

বলিস্—খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকের কোলে। — শিশু, বিদায়

সাজাহানের প্রেয়সী তাজমহলে সমাধিতলে কেবল ছিলেন না, তিনি সাজাহানের নিকট সর্বব্যাপিনী—

যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।— বলাকা, সাজাহান

প্রিয় যখন মৃত্যুতে নয়ন-সম্মুখ হইতে অপসারিত হইয়া যায়, তখনও সে অন্তর্হিত হয় না।—

নয়ন-সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল। — বলাকা, ছবি

উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে
সঙ্গীত উদার।
সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।
ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখ তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া। —চিত্রা, মৃত্যুর পরে

আমি যখন আমার বর্তমান দেহে থাকিব না, তখনও তো পৃথিবীতে সকাল-সন্ধ্যা ঋতু-পর্যায় আসিবে; কালে হয় তো আমার পরিচিতদের মন হইতে আমার স্মৃতি মুছিয়া যাইবে, কিন্তু আমি তো লোপ পাইব না—

তখন—

কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় কর্‌বে খেলা এই-আমি।
নতন নামে ডাক্‌বে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আস্‌ব যাব চিরদিনের সেই আমি। —প্রবাহিণী

বলাকার উড়িয়া চলা দেখিয়া কবির—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে,
প্রাণ হ'তে প্রাণে।

মৃত্যুর প্রেম সর্বনাশা, তাই সে ক্রমাগত প্রাণ হইতে প্রাণ টানিয়া নব নব সুধাপাত্র আস্বাদন করাইয়া লইয়া চলে,—

সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া। —বলাকা, নদী

তাঁহার

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে।

সেই মহাকাল প্রত্যেককে

ডাক দিল শোন মরণ-বাঁচন-নাচন-সভার ডঙ্কাতে। —প্রবাহিণী

আমরা সকলেই এখানে প্রবাসী; তাই কবি সুদূরের পিয়াসী হইয়া বলিয়াছেন—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। —উৎসর্গ, প্রবাসী ও সুদূর

বয়সের জীর্ণ পথশেষে মরণের সিংহদ্বার পার হইয়া নবজীবন ও নবযৌবন-লাভের আহ্বান আমাদের কাছে নিরন্তর আসিতেছে; কিন্তু আমাদের অজ্ঞানাতে ভয় লাগে; তাই আশ্বাস দিয়া কবি বলিতেছেন—

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠ্‌বে জীবন ভ'রে।
জানি জানি আমার চেনা
কোন কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায়
টান্‌বে অচিন-ডোরে।
ছিল আমার মা অচেনা
নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো,
তাই তো হৃদয় দোলে। —গীতালি

মৃত্যুর প্রেমাভিসারেই জীবনের মহাযাত্রা—

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
র'ব না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।
ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি। —বলাকা

কবি বলেন-

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ। —বলাকা

এবং সেই জন্য তিনি নির্ভয়ে বলিতে পারিয়াছেন—

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়?
জয় অজানার জয়। —প্রবাহিনী

সেই অজানা মৃত্যুর ভিতর দিয়া—

চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি'। —বলাকা

অতএব মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া—

বলো অকম্পিত বুকে,—
তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ'।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক। —বলাকা

মৃত্যু তো মানবের—

বহু শত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

জীবের জীবন লইয়া—

দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া ;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চল্‌ছে নিরাকার। —বলাকা

মহাপ্রাণ বা সমগ্র প্রাণ হইতে যে প্রাণধারা নিরন্তর প্রবহমান হইতেছে তাহা তো মৃত্যুর দ্বার দিয়াই বহিয়া চলিয়াছে—

মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা। —নটীর পূজা

সেই প্রাণে মন উঠ্‌বে মেতে
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ। —গান

জগতে কিছুই শেষ হয় না, কারণ শেষ তো অশেষেরই অংশ—

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বল্‌বে।
* * *
ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চ'লে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে
মরণে ফল ফল্‌বে। —গীতাঞ্জলি

শেষের মধ্যে অশেষ আছে,
এই কথাটি, মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে। —গীতাঞ্জলি

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ?
কী মহিমা
জ্যোতিহীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি'
যায় গলি',
গ'ড়ে তোলে অসীমের অলঙ্কার। —পূরবী, শেষ

কবি শরৎঋতু-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড় উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কবির ফাল্গুনী নাটকের অন্তরের কথাও এই—

নূতন ক'রে পাবো ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
ও মোর ভালোবাসার ধন।

কবি বলেন—

মৃত্যু সে যে পথিকের ডাক। —পূরবী, মৃত্যুর আহ্বান

এবং—

অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ। —পূরবী, কঙ্কাল

'সৃষ্টিকর্তা' যিনি—

তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়-তিমিরে। —পূরবী, সৃষ্টিকর্তা

সৃষ্টিকর্তার এই ডাক কেন, না—

জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়। —পূরবী, সুপ্রভাত

ক্লান্ত হতাশ জনকে কবি বারংবার আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা,
আরেক দেশে চল্ রে সোজা
নতুন ক'রে বাঁধ্‌বি বাসা,
নতুন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই। —বৌঠাকুরাণীর হাট

ভগবান্ অনন্ত, আর তাঁহার সৃষ্ট জীবনও অনন্ত ও অনাদি—

সকলেরে কাছে ডাকি আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ,
পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগৎ গাইছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।
* * *
জাগে নব নব প্রাণ, চিরজীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক-লোকান্তর প্রাণে মগ্ন চরাচর
প্রাণের সাগরে সন্তরণ।
জগতে যে দিকে চাই বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রিগণ। —গান

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।

সেই আদি কাল কি অল্পকাল,—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে এই জন্য যে তাহার আহ্বানে সংসার ছাড়িয়া যাইবার সময় আমাদের প্রিয় সামগ্রী পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু মরণ তো রিক্ত নয়।

কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধর্‌বে যবে!
জীবনে তুই যা নিয়েছিস্,
মরণে সব দিতে হবে!

অতএব মৃত্যু যখন সমারোহ করিয়া প্রিয়সমাগমের জন্য আসে তখন—

রাজার বেশে চল্‌ রে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে।

বর যে দিন বধূকে বরণ করিয়া লইতে আসিবে, সে দিন তো তাহাকে শূন্য হাতে বিদায় করিলে চলিবে না, তাহাতে প্রণয়ের অপমান হইবে যে।

মরণ যে দিন দিনের শেষে আস্‌বে তোমার দুয়ারে,
সে দিন তুমি কি ধন দিবে উহারে?
ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি',
শূন্য বিদায় কর্‌ব না তো উহারে,—
মরণ যে দিন আস্‌বে আমার দুয়ারে।

মৃত্যু-বরের জন্য জীবন-বধূ মিলনোৎসুক হইয়া সর্বক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—

সারাজনম তোমার লাগি'
প্রতিদিন যে আছি জাগি'!

* * *

যা পেয়েছি, যা হয়েছি,
যা কিছু মোর আশা,
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবন-বধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা,

* * *

সে দিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন, কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

—গীতাঞ্জলি

আমি অনাদি, আমার জন্য অনাদি কাল প্রতীক্ষা করিতেছে, মৃত্যু সেই অনাদি মহাকালেরই মিলনদূত,—সেই জন্য আমার অভিসারও অনাদি অনন্ত,—

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই।

তাই—

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চ'লে যাব নবজীবনলোকে,
নূতন দেখা জাগ্‌বে আমার চোখে,
নবীন হ'য়ে নূতন সে আলোকে
পরবো তব নবমিলন ডোর।

মরণযাত্রায় তো মানব একাকী যাত্রী নয়, তাহার সঙ্গে তাহার বিধাতাও যে সহযাত্রী—

যবে মরণ আসে নিশীথ গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে,
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ। —গীতিমাল্য

আমাদের সংসার-বন্ধন ছাড়িয়া যাইতে ক্লেশ বোধ হয়, তাই মৃত্যু সেই বন্ধন মোচন করিয়া আমাদিগকে আমাদের প্রিয়তমের সকাশে লইয়া যায়, কাজেই মৃত্যু ভয়ানক নহে, সে আনন্দদূত।—

মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে,
তুমি আমার আনন্দ।

আমার জীবনদেবতার সহিত মিলন হইবে বলিয়াই আমার পরাণবধূ স্বয়ংবরা হইয়া মৃত্যুর পথে অভিসারিকা—

চল্‌ছে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদি স্রোত বেয়ে।
* * * *
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন-তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা। —গীতিমাল্য

আমি যে এই অঙ্গ ধারণ করিয়া আমার প্রাণকে আশ্রয় দিয়া প্রকাশ করিয়াছি,

সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থ-জলের ধারায় করেছে তায় ধন্য। —গীতিমাল্য

মৃত্যু যদি না থাকিত তাহা হইলে জীবনই থাকিতে পারিত না, মৃত্যুর দ্বারাই আমরা জীবনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি—

মরণকে প্রাণ বরণ ক'রে বাঁচে। —গীতালি

এবং প্রত্যেক জীব—

বহিল মরণ-রূপী জীবন-স্রোতে।
সে যে ঐ ভাঙা-গড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে। —গীতিমাল্য

"সবাই যারে সব দিতেছে", সেই আমাদের প্রিয়তম আমাদের সর্বস্ব হরণ করিবার জন্য

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌ছে জীবন মাঝে,
ও যে আসছে বীরের সাজে।

সেই প্রিয়তমকেই বল্‌তে হবে—

মরণ স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তবে মিলন-বেশে,
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধ বাহুর ডোরে। —গীতালি

মরণই আমাদের জীবন-তরণীর কাণ্ডারী,—

মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

গানের রাজা কবি জীবন-মরণের দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

তোমার কাছে এ বর মাগি—
মরণ হ'তে যেন জাগি
গানের সুরে।

যেম্নি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে
গানের সুরে।

মানুষের জীবন তো অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল ধরিয়া পথিক, কিন্তু সে চির-পুরাতন হইয়াও মৃত্যুর বরে চির-নূতন—

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
কে বলে, "যাও যাও"—আমার
যাওয়া তো নয় যাওয়া
টুটবে আগল বারে বারে
তোমার দ্বারে
লাগ্‌বে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া।

* * *

পথিক আমি, পথেই বাসা,
আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা।
ভোরের আলোয় আমার তারা
হোক না হারা,
আবার জ্বলবে সাঁঝে আঁধার-মাঝে তা'রি নীরব চাওয়া।

—প্রবাহিনী

কবি একদিন রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

পরজন্ম সত্য হ'লে
কি ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টান্‌বে ধরে
বাংলা দেশের এ রাজধানী। —কণিকা, কর্মফল

কিন্তু কবি পরজন্মে স্থির বিশ্বাস করেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে
দুঃখ-সুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে। —গীতালি

কবি লিখিয়াছেন—

জগৎ-রচনাকে যদি কাব্য হিসাবে দেখা যায়, তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেইখানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা চিরস্থায়ী সমাধি-মন্দিরের মতো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুরূহ হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যেদিকে মৃত্যু সেইদিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ধর্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে।—একে যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বর্তমান তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল,—আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত, তবে তাহার একেশ্বর দৌরাত্ম্যের আর শেষ থাকিত না—তবে তাহার উপরে আর আপীল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দেশ করিয়া দিত যে ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে—অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত, মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত?

মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো মর্যাদাই থাকিত না। এখন জগৎসুদ্ধ লোক যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত।

জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেইজন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের অমরতা, সব সেইখানে। যে-সব জিনিস আমাদের এত প্রিয়, কখনও তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না; সেগুলি মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই—সুবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিষ্ফল হয়,—সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, আমাদের অমরতা অসীমতাকে অপ্রমাণ করে—জগতের যে সীমায় মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার, আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনার কোনো প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্মশানবাসী,—আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যু-নিকেতনে।

জগতের নশ্বরতাই জগৎকে সুন্দর করিয়াছে। এইজন্য মানুষের দেবলোকেও মৃত্যুর কল্পনা,—সতীর দেহত্যাগ, মদন-ভস্ম ইত্যাদি। —পঞ্চভূত

জীবনকে সত্য ব'লে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই ব'লে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস ক'রেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়—যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন।

ইহাই ফাল্গুনী নাটকের অন্তরের কথা।

যুবকদল যখন জগতের সেই যে বিরাট্ বৃদ্ধ,—যে অগস্ত্যের ন্যায় পৃথিবীর "যৌবন-সমুদ্র শুষে খেতে চায়", তাহাকে ধরিবার জন্য অভিযান করিয়া বাহির হইয়াছিল, তখন তাহারা বলাবলি করিতেছিল—

বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনি সকলের দিকে চোখ মেলি। আর দেখি বড় মধুর। যদি সবাই চ'লে চ'লে না যেতো তা হ'লে কি কোন মাধুরী চোখে পড়তো! চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাক্ত তা হলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তা'র মধ্যে কান্না আছে, তাই যৌবনকে সবুজ দেখি। জগৎটা কেবল 'পাবো' 'পাবো' বলছে না,—সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌ছে 'ছাড়বো' 'ছাড়বো'। সৃষ্টির গোধূলি-লগ্নে 'পাবো'র সঙ্গে 'ছাড়বো'র বিয়ে হ'য়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙ্‌লেই সব ভেঙে যাবে। —ফাল্গুনী

প্লাবন ব'য়ে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধে রে—
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে— —গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা-ফুলের মেলা।
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরাফুলের খেলা!
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌ছে সারা বেলা। —অরূপ-রতন

মৃত্যু যে অবসান ও শেষ নহে তাহা কবি বারংবার বলিয়াছেন।—

আমাদের মধ্যে একটা মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে-দেখা কানে-শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের আড়ালে প'ড়ে যায়, মনে করি সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারিনে। আমার চোখে-দেখা কানে-শোনা দিয়েই তো আমি জগৎকে সৃষ্টি করিনি যে, আমার দেখা-শোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। যাকে চোখে দেখ্‌ছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জান্‌ছি, সে যার মধ্যে আছে; যখন তাকে চোখে দেখিনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানিনে, তখনো সে তারই মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা তো ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ, সেখানে তিনি ফুরিয়ে যাননি। আমি যাকে দেখ্‌ছিনে, তিনি তাকে দেখ্‌ছেন—আর তাঁর সেই দেখার নিমেষ পড়্‌ছে না।

—শান্তিনিকেতন, দ্বাদশ খণ্ড, মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি ব'লে যে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিসকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়—তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি

ব'লে গাল দিতে থাকে—কিন্তু সংসার যেমন তেমনি থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না। অতএব মৃত্যুকে যখন দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখ্‌তে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়। —শান্তিনিকেতন, সপ্তম খণ্ড, মৃত্যু ও অমৃত

তাই কবি বলিয়াছেন—

যখন আমার আমি
ফুরায়ে যায় থামি',
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ।

এবং—

মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি' বহিছে যেই প্রাণ,
সেই তো তোমার প্রাণ। —গীতালি

প্রাণ যে মুক্ত-ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিতে পারিতেছে তাহার কারণ—

নাচে রে নাচে, মরণ নাচে
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে। —মুক্তধারা

মরণকে যে প্রাণের পরিচয় বলিয়া না জানিতে পারে তাহার প্রাণ হয় ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ।—

মরণকে তুই পর করেছিস্ ভাই,
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হলো তাই। —প্রবাহিণী

অতএব—জীবনেশ্বর তো কেবল জীবনেরই দেবতা নন, তিনি মৃত্যুবিধাতা—

তোমার মোহন রূপে
যে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ-নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে। —গীতালি

মৃত্যু হইতেছে জীবনের পরিণতি,—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা। —গীতাঞ্জলি

জীবনকে তোর ভ'রে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে। —গীতালি

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাহার 'পরে।

কবি কীট্‌সও বলিয়াছেন যে—

Death is Life's high meed.
Death is the Crown of Life.

পূর্ণাৎপূর্ণ যিনি তাঁহারই মধ্যে তো সকল অংশ নিবিষ্ট ও নিহিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব কোথাও কোনও ক্ষতি নাই, বিনাশ নাই, বিচ্ছেদ নাই। এই সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়া কবি আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিয়াছেন—

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু,
বিরহ-দহন লাগে;
তবুও শান্তি তবু আনন্দ
তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে,
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে। —গান

কবি জীবন-মরণ-বিধাতার স্বরূপ অনুভব করিয়া প্রার্থনারও ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রার্থনার আবশ্যক হয়। কিন্তু পূর্ণাৎপূর্ণ যিনি তিনি তো কোনোমতেই অংশকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তাহা করিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হইবে। তাই কবি সংশয়াতীত হইয়া, পূর্ণের মধ্যে অংশের নিশ্চয় আশ্রয় জানিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। যতক্ষণ ভয়ের স্বরূপ জানা না যায়, ততক্ষণই আশঙ্কা থাকে; কিন্তু মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে, মৃত্যুকে আর ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয় না। বজ্রাঘাত হইবে এই সম্ভাবনাতেই ভয়, কিন্তু বজ্রপাত হইয়া গেলে আর ভয় কিসের? যিনি জীবন-বিধাতা, তিনিই তো স্বয়ং মৃত্যুরূপী; তিনি মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া মানবের পরীক্ষা করেন। কিন্তু যে মানব মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে পারে, তখন সে বিধাতার মৃত্যুভয়-

দেখানোকে জয় করিয়া স্বয়ং বিধাতার উপরও জয়ী হয়। তাই মৃত্যুঞ্জয় কবি কহিয়াছেন—

যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি,
তোমারে আমার চেয়ে বড় ব'লে নিয়েছিনু গণি'।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোট হ'য়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।
আমি তার চেয়ে বড়, এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে তাঁহার বাল্যকালের কথা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"...আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ-প্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশ-প্রেমের সময় নয়—তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।......

"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দু-মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ....ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়-সঙ্গীত 'মিলে সব ভারত-সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প-ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত, ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।"

এই মেলায় চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবি লর্ড লিটনের

দরবার সম্বন্ধে একটি পদ্য রচনা করেন। সেই কাব্যে বয়সের উপযুক্ত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে ছিল। কবি সেটা পড়িয়াছিলেন 'হিন্দু-মেলায়' গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে কবি নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

কবি লিখিয়াছেন,—"জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল···ইহা স্বাদেশিকের সভা।······আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল·········এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ [বীরত্বের] উত্তেজনার আগুন পোহানো।"

"·········রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত ······তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল।"

"আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। গঙ্গার ধারে তাঁহার একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণ-নির্বিচারে আহার করিলাম।"

"স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল।"

"ছেলে-বেলায় রাজনারায়ণ-বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল, তখন সকল দিক্ হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না।······দেশের উন্নতি-সাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতো রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান্ করিতেন তাহার আর অন্ত নাই।·········এদিকে তিনি মাটির মানুষ, কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি [গান] ধরিতেন······

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে একটি সুসম্পূর্ণ স্বদেশ-প্রেমের আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হইয়াছেন এবং সেই ভাবই তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার যে স্বপ্ন ও কল্পনার ভিতর দিয়া পরিণত বয়স বুদ্ধি ও বিবেচনায় উপনীত হইয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় 'চিরকুমার সভা'য় চন্দ্রবাবুর কল্পনা ও প্রচেষ্টার বর্ণনা উপলক্ষে ঠাট্টার সুরে আমাদের শুনাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ষোলো বৎসর মাত্র, সেই বাল্যকালেই বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য নামে একটি প্রবন্ধ প্রথম বৎসরের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অল্প বয়সে বিলাতে গিয়াও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। বিলাতে বরাবর তিনি দেশী কাপড় পরিয়াছেন, এবং তাহার জন্য অনেক বিদ্রূপও সহ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহেবিয়ানাকে চিরদিনই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' ১২৮৬ সালে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে একটি ব্যঙ্গ-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

মা এবার ম'লে সাহেব হবো ;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিব নাম ঘোচাবো।
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা বাগানে বেড়াতে যাবো,
আবার কালো বদন দেখ্‌লে পরে ব্লাকি বলে' মুখ ফেরাবো।

১৩০২ সালে রচিত চৈতালি নামক পুস্তকে পর-বেশ-পরিহিত ছদ্মবেশী সাহেবদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

কে তুমি ফিরিছো পরি' প্রভুদের সাজ !
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ !
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হ'য়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান ?
বলিছে না, ওরে দীন, যত্নে মোরে ধরো,
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর ?
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তব কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি' তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে নাকি তব স্বজাতিরে ?
বলিতেছে, যে মস্তক আছে মোর পায়,
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায় !
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি' এ কি অহঙ্কার !
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার !

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে ১৮৯০ সালে জাহাজে চড়িয়া তিনি লিখিয়াছেন—"সামান্য এই কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে চ'লেছি, কিন্তু ভারতবর্ষ একান্ত করুণ স্বরে আমাকে আহ্বান করছে, বলছে—বৎস, কোথায় যাস্! আর যাই করিস্ অবজ্ঞার ভাবে চ'লে যাস্‌নে, আর অবজ্ঞার ভাবে ফিরে আসিস্ নে।"

পরিণত বয়সেও তিনি স্বদেশবাসীর দ্বারা মাতৃভূমির অপমানে ব্যথিত হইয়া কাতর কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি'?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায়?
সে যে আমার জননী রে
ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি!
আপন সন্তান
করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে!

কবি বাল্যকাল হইতে বাংলা-দেশকে মায়ের মতন ভালবাসিয়া আসিয়াছেন। বাল্য রচনা 'আলোচনা' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"এমন মায়ের মতো দেশ আছে? এতো কোলভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন স্নেহধারা-শালিনী ভাগীরথী-প্রাণা কোমল-হৃদয়া, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়?"

কিছুদিন কবি আপনার ব্যক্তিগত হৃদয়ের সুখদুঃখ ও ভাবপুঞ্জের ভাণ্ডারে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর পান নাই; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে, স্বার্থ বলি দিয়া স্বদেশের সেবায় ও উন্নতিতে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার মনে 'দুরন্ত আশা' জাগ্রত হয়; তখন নিজেকে ও 'মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালী-সন্তান'দের অকর্মণ্য 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন! বাঙালীর হীনাবস্থা দাস্য ও নিশ্চেষ্টতা কবিচিত্তকে নিপীড়িত করিয়াছে, তাই তিনি কাতর হইয়া

স্বদেশবাসীদের বারংবার বিদ্রূপের ব্যথা দিয়া উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন—

দূর হোক্ এ বিড়ম্বনা বিদ্রূপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনাভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়-তলে সরম-তাপ সতত জ্বলে
তাই তো চাহি হাসির ছলে করিতে লাজ দান।

কবি কাতরকণ্ঠে জীবনদেবতাকে বলিয়াছেন—ভাববিলাসিতা ও অকর্মণ্য জড়তা হইতে 'এবার ফিরাও মোরে'। স্বদেশের যে-সব লোক নীরবে শত শতাব্দীর অত্যাচারের ভারে পিষিয়া মরিতেছে—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

কবির আদর্শ-স্বদেশ য়ুরোপের বিলাস-বাহুল্যে ও ক্ষমতাদর্পে ভয়ঙ্কর নহে; সেই স্বদেশের রূপ শান্ত, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, সাম্যের প্রভাবে উদার, সেখানকার স্বাধীনতা অপরের পরাধীনতার বুকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—সেই স্বদেশের—

হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়-গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা—

পাশাপাশি হাত-ধরাধরি করিয়া বিরাজিত।

কবি বিশ্বপ্রেমিক। অতি শৈশব হইতে তাঁহার কবিচিত্ত সঙ্কীর্ণ দেশকালের সীমায় আবদ্ধ থাকার দুঃখের ও দীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। তাই তাঁহার স্বদেশপ্রেম কখনো অত্যুগ্র স্বাদেশিকতায় পরিণত হইতে পারে নাই। আমার দেশের সব ভালো, আমার দেশের ভালো করিতে যদি অপরের মন্দ করিতে হয় তাহাও স্বীকার,—এমন উৎকট ভাব সত্যসন্ধ প্রেমিক কবির চিত্তে কখনও স্থান পাইতে পারে না। তাই তাঁহার সেই ছেলেবেলা হইতে দেখা যায়, তিনি স্বদেশকে ভালোবাসিয়া বিদেশকে মন্দ-বাসেন

নাই ; বিদেশের মোহ ও অনুকরণকে ঘৃণা করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশের মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণের সমাদর করিয়াছেন। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে তিনি লিখিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন য়ুরোপের ভালো য়ুরোপের পক্ষেই ভালো, আমাদের ভালো আমাদেরই ভালো। কিন্তু কোনো প্রকৃত ভালো কখনই পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, তারা অনুযোগী। অবস্থা-বশত আমরা কেহ একটাকে, কেহ আর-একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্বাঙ্গীণ হিতের প্রতি দৃষ্টি কর্‌লে কাউকেই দূর ক'রে দেওয়া যায় না।" বাল্যকাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের কথাই কবি লিখিয়া আসিয়াছেন ; বিশ্বভারতীর পূর্বাভাস তিনি বাল্যকালেই দিয়াছেন। ১২৮৬ সালে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে প্রকাশিত 'কবিকাহিনী' নামক কাব্যে কবি লিখিয়াছিলেন—

কবে দেব এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি' প্রভাতের শিশির-সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি' ?
নাহিক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা ;
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস !
সেদিন আসিবে গিরি ! এখনই যেনো
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে—
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয় !

বিশ্বপ্রেমের এই মহাদর্শ তাঁহার মনে চিরজাগ্রত, তাই 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র কবিতাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম রচনার মধ্যে পর্যন্ত এই সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক মহামিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'প্রভাত-উৎসব', 'স্রোত' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও "জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পারা" ও "জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো যে যেথা আছো ভাই",—প্রভৃতি মহাবাণী প্রচুর দেখিতে পাই।

কবি স্বদেশ-জননীকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছেন—তিনি তাঁহার সন্তানদের 'স্নেহগ্রাস' হইতে মুক্তি দান করুন—

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি' !
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রৎ প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।

* * *

চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব দেবতার ;
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।

ভারতমাতা স্নেহাধিক্যে বিধি-নিষেধের গণ্ডি দিয়া দিয়া সন্তানদের পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে কবিচিত্ত ব্যথিত বইয়া আর্তনাদ করিয়াছে—

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছো বাঙালী ক'রে মানুষ করো নি !

কিন্তু একদিকে যেমন বিশ্বপ্রেমের মহান্ আদর্শে কবির কাছে স্বদেশ একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, তেমনি আবার বিশ্বপ্রেমের বন্যায় স্বদেশ তাঁহার কাছে ডুবিয়া হারাইয়া যায় নাই। তিনি বারংবার 'ভুবন-মনোমোহিনী জনক-জননী-জননী' স্বদেশ-মাতাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"এবার ফিরাও মোরে !" নববর্ষে তিনি ভারতবর্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

নব বৎসরে করিলাম পণ
লবো স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লবো শিক্ষা !
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিবো আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িবো পরের ভিক্ষা !

"ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"—এই মহাবাণী তিনি আমাদের দেশে পুনঃ প্রচার করিয়া বারংবার বলিয়াছেন যে স্বদেশের দুঃখমোচন ভিক্ষার দ্বারা হইবার

নয়, নিজের জননীর লজ্জা মোচন করিতে হইবে নিজেদের চেষ্টার দ্বারা, অর্জনের দ্বারা, নিজেদের ত্যাগের দ্বারা।—

তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেনো তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক্ গর্ব, করি' করজোড়
ভরি ভিক্ষাঝুলি!
পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেনো রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।

স্বদেশের দৈন্যের লজ্জা ঘোচাবার 'পথ ও পাথেয়'ও কবি নির্দেশ করিয়াছেন —কেবল স্বদেশ স্বদেশ বলিয়া, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া ভাববিলাসিতা করিলে চলিবে না। কবি স্বদেশবাসীদের ডাক দিয়া বলিতেছেন—

"তাই বারংবার বলিয়াছি এবং বারংবার বলিব শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঐ পরের দিক্ হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে, তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানা-দিগভিমুখী মঙ্গল-চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো; কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এতোদূর বিস্তৃত করো যে দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান, সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।"

আমরা যদি উচ্চ-নীচের কৃত্রিম ভেদ ও বিরোধ ঘুচাইতে না পারি, তবে—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান!

যতোদিন আমরা দেশের সকল জাতি ও ধর্ম-নির্বিশেষে মিলিত হইতে না পারিব, ততোদিন আমাদের দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ কথা কবি বারংবার বলিয়াছেন—

"একথা বলাই বাহুল্য, যে-দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই,

সে-দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার ‘স্ব’-জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা—কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালী যদি স্বাধীন হয়, তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না। এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবে পূর্বপ্রান্তের আসামী তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত, এমন কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।”

এইজন্য কবি মঙ্গল-মহোৎসবের পুরোহিত হইয়া আবাহন-মন্ত্র উদ্‌গীত করিয়াছেন—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
 হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
 এসো এসো খ্রীস্টান!
এসো ব্রাহ্মণ. শুচি করি’ মন
 ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
 সব অপমানভার!
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
 তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের
 সাগরতীরে।

‘শিবাজী’ নামক প্রসিদ্ধ কবিতাতেও কবি এই একই কথা বলিয়াছেন—

সে-দিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
 শির পাতি’ লবো।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
 ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি’ উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী-বসন
 দরিদ্রের বল।
‘এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে’ এ মহাবচন
 করিব সম্বল।

কবির উদার হৃদয় স্বদেশকে মহামানবের মিলনভূমি বলিয়া অনুভব করিয়াছে। কবির কাছে ভারতবর্ষ কোনো বিশেষ জাতি বা ধর্মাবলম্বীর দেশ নয়। কবির মতে ভারতবাসী মাত্রই হিন্দু জাতি, ধর্ম তাহার যাহাই হউক। কবি 'পরিচয়' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াও তুমি হিন্দু থাকিতে পারো? নিশ্চয় পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই।······ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মহাশয় হিন্দু-খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু-খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-খ্রীষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ, তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীষ্টান। ······বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। হিন্দু শব্দ ও মুসলমান শব্দ একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। মত-পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে জাতীয়ত্বের আদর্শ স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন: "এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্ব জাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্য রূপে পাওয়া যায় —এই কথা নিশ্চিতরূপে বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।"

এই তত্ত্বকে 'গোরা' নামক উপন্যাসে গোরার মুখ দিয়া কবি সুস্পষ্ট করিয়াছেন। আমরা দেখি গোরা নিজেকে ভারতবর্ষীয় হিন্দু মনে করিয়া যখন প্রাণপণে আপনার চারিদিকে গোঁড়ামির দেয়াল তুলিয়াছিল, তখনই তাহার নিজের দেওয়া দেয়াল অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল, সে জানিতে পারিল—সে হিন্দু নয়, সে ম্যুটিনির সময়কার কুড়ানো ছেলে, তাহার বাপ একজন আইরিশ্-ম্যান। এই জানাজানির সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও বুঝিতে পারিল—"ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে,—আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পঙ্‌ক্তিতে কোনো জায়গায় আমার আহারের আসন নেই।" ইহাতে গোরা খুশী হইয়াই পরেশবাবুকে বলিয়াছে,—"আমি দিনরাত্রি যা হ'তে চাচ্ছিলুম অথচ হ'তে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো

সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন; দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি; কিন্তু কোনো মতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে ব'স্‌তে পারি নি—এতোদিন আমি আমার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি—কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারি নি। সেজন্যে আমার মনের ভিতর খুব একটা শূন্যতা ছিলো। আজ আমি বেঁচে গেছি পরেশ-বাবু।"

অবশেষে গোরা পরেশবাবুকে বলিল—"আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

কবি ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড সত্তা-রূপে উপলব্ধি করিলেও বঙ্গভূমিকে বিশেষভাবে ভালবাসিয়া বারবার বলিয়াছেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

কবি বারবারই বলিয়াছেন—

তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।

অথবা—

সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে;
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালবেসে!

কবির কাছে স্বদেশ-মাতা কেবলমাত্র মৃন্ময়ী নহেন, তিনি চিন্ময়ী—

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী!

এই চিন্ময়ী স্বদেশ-জননী বিশ্বমাতারই খণ্ড প্রকাশ রূপে কবির চক্ষে প্রতিভাত—

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা !
তোমাতে বিশ্বময়ীর
তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।

সেই মাটির দেশই কবির দেহমনে মিলাইয়া আছেন প্রাণ-রূপে ভাব-রূপে—

তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি
মর্মে গাঁথা।

তাই কবি ভক্তি-গদ্‌গদ চিত্তে দেশ-মাতাকে প্রণাম করিয়াছেন—"নমো নমো নমঃ সুন্দরি মম জননী বঙ্গভূমি !"

কবির মনে এইরূপ স্বদেশপ্রীতি সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক প্রীতির সঙ্গে ওতঃপ্রোত হইয়া মিশিয়া থাকাতে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা কবির কাছে ভয়ঙ্কর—

Nationalism is a great menace. It is the particular thing which for years has been at the bottom of India's troubles.

সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার উর্ধ্বে ভারতবর্ষকে উঠিতে হইবে, ইহাই তাঁহার বহুকালের সাধনা ও উত্তরাধিকার—

She has tried to make an adjustment of races, to acknowledge the real difference between them where these exist, and yet seek for some basis of unity. This basis has come through our saints like Nanak, Kabir, Chaitanya and others, preaching one God to all races of India.

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে আনন্দ, বিরোধে দুঃখ। এই বিরোধ দূর করিবার জন্য কালে কালে দেশে দেশে মহাপুরুষেরা চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের বিরোধের কারণ হইতেছে অহঙ্কার এবং স্বার্থপরতা; এই অহং ভাবকে এক প্রেমস্বরূপের বোধের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া সকল বিরোধের সমন্বয় করিতে হইবে; তাহা ছাড়া অন্য গতি নাই—

Each individual has his self-love. Therefore his brute instinct leads him to fight with others in the sole pursuit of his self-interest. But man has also his higher instincts of sympathy and mutual help. The people who are lacking in this higher moral power and who therefore cannot combine in fellowship with one another must perish or live in a state of degradation. Only those people have survived and achieved civiliza-

tion who have this spirit of co-operation strong in them. So we find that from the beginning of history men had to choose between fighting with one another and combining, between serving their own interest or the common interest of all.

স্বার্থপর স্বজাতি-প্রীতি বা স্বদেশ-প্রীতির পরিণাম বিনাশ—

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে.........
স্বার্থ যতো পূর্ণ হয়, লোভ-ক্ষুধানল
ততো তার বেড়ে উ: ,—বিশ্ব ধরাতল
আপনার খাদ্য বলি' না করি' বিচার
জঠরে পুরিতে চায় !.........
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া পরার্থে আত্মোৎসর্গই যে যথার্থ স্বদেশপ্রীতি একথা তিনি বারংবার বলিয়া 'সফলতার সদুপায়' নির্দেশ করিয়াছেন —"ভাবিয়া দেখো, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি—তুমি সাধারণ মনুষ্য-স্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠো, তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব করো, তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, 'আচ্ছা তোমার মুখে ধর্মোপদেশ আমরা পরে শুনবো, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ-মনুষ্য-স্বভাবের নিম্নতম কোঠায় আমি আছি, সেই কোঠায় তুমিও এসো, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই—স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ করো, স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পারো, অন্তত আরাম বলো, অর্থ বলো, কিছু একটা দাও ! তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা কিছুই করিবে না ?' একথা বলিলে তাহার কি উত্তর আছে ?"

আমাদের জাতীয় জীবনের জড়তার এই লজ্জা-মোচনের উপায়-স্বরূপ কবি কতকগুলি কর্ম নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন কালে যে সমাজ-ব্যবস্থা ছিলো,—"সেই সমাজ আমাদের এখনো আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতধারা 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্' এই গান করিয়া ধাবিত হইতেছে না।—

মালা ছিলো, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।

"সেইজন্য আমাদের এতোদিনকার সমাজ আমাদিগকে বল দিতেছে না, গৌরব দিতেছে না, আধ্যাত্মিকতার দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিতেছে না, আমাদিগকে চতুর্দিকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। এ সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য যখন আমরা সচেতন ভাবে বুঝিব, ইহাকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্য যখন সচেষ্ট ভাবে উদ্যত হইব, তখনই মুহূর্তের মধ্যে বৃহৎ হইব, মুক্ত হইব, অমর হইব—জগতের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষিরা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবে, এবং পিতামহগণ আমাদের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন।"

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ-সেবার যে-সব উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে উত্তেজনা নাই, পরের প্রতি দ্রোহ বা বিদ্বেষ নাই; এজন্য তাঁহার প্রণালী শীঘ্র লোকের মন হরণ করে না। তিনি বহুদিন পূর্বে স্বদেশজননীকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করেন—

নিজহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে, তাই যেনো রুচে,—
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে, তাহে লজ্জা ঘুচে।

কিন্তু পরবিদ্বেষের বশে যখন বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া ফেলার ধূম লাগিয়াছিল, তখন কবি তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। এই কথা তিনি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ ও নিখিলেশ চরিত্রের তারতম্য দ্বারা ও একাধিক প্রবন্ধে বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—

Prof. Thompson বলিয়াছেন—

He (Rabindranath) faces both East and West, filial to both deeply indebted to both.... He has been both of his nation, and not of it, his genius has been born of Indian thought, not of poets and philosophers alone, but of the common people, yet it has been fostered by Western thought and by English literature; he has been the mightiest of national voices, yet he has stood aside from his own folk in more than one angry controversy.

কবির কাছে স্বদেশ এত সত্য যে সেখানে কোনো রকমের ভেদ-বিচ্ছেদ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। স্বদেশ তো কেবল মাটির দেশ নহে, দেশবাসীদের লইয়াই তো দেশ! আমার স্বজাতি ও স্বধর্মী বলিয়া পরিচিত যে লোক অন্যায় উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়া পরধর্মকে ভয়াবহ প্রতিপন্ন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা সৎকর্মশীল বিধর্মী যে আমার অধিক আত্মীয়, একথা কবি 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে

আমরা এ কী ভয়ঙ্কর অধর্ম করিতেছি। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোকে পীড়ন করিতেছে, তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে ; আর উৎপাত স্বীকার করিয়াও মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে !"

রবীন্দ্রনাথ দেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ ও ভাষাকে ভালবাসিয়াছেন বলিয়া স্বদেশের সব ভালো ও বিদেশের সব মন্দ এমন কথা কখনো বলিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশের সমস্ত ত্রুটি ও অপূর্ণতা স্পষ্ট ভাষায় নির্মমভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, কারণ তিনি সত্যদ্রষ্টা কবি। সমাজে ধর্মে শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বত্র তিনি সংস্কারক দেশবন্ধু। কবি আমাদের 'শিক্ষার হেরফের' ঘুচাইয়া "আমাদের······ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন" সমঞ্জস করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন ; 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' করিয়া কবি বলিয়াছেন—"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, একথা ধ্যান করা নেশা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্যভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি-বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানীগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।" কবি দেশের ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া আরো বলিয়াছেন—"আমি জানি, ইতিহাস-বিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমর মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে, তখন তাহাকে তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যাত করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন-হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে,—কর্মের পথে। দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে প্রত্যক্ষ

বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও, তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার আবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানিসভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে।"

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার আদর্শ যে দিগ্বিজয় বা সাম্রাজ্য বিস্তার নহে, তাহা যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপনা করা, তাহা তিনি বার বার বলিয়াছেন। অতি বাল্যকালে ১২৮৫ সালের ভারতীতে 'কাল্পনিক ও বাস্তবিক' নামক প্রবন্ধে তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে একটি আদর্শ সভ্যতা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যে সভ্যতা অপরকে অসভ্য রাখিয়া প্রভুত্ব করিতে উৎসুক হইবে না, যে স্বাধীনতা অপরের পরাধীনতার বুকে চাপিয়া বিরাজ করিবে না। কবি লিখিয়াছিলেন—"মনে হয়, ঐ সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কোনো অধীনতায়-ক্লিষ্ট অত্যাচারে-নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইব, তখন স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাহাদের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া দিব। আমরা নিজে শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্যন্ত অধীন ভাবে অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রু মোচন করিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই কাতর জাতির মর্মের বেদন যেমন বুঝিব, তেমন কে বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যে-সকল দেশ নিদ্রিত আছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আমরা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য পড়িবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক আমাদের ভাষা শিক্ষা করিবে। আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জন করিতে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে!"

আটচল্লিশ বৎসর পূর্বে কবি-চিত্ত যে আদর্শ ধারণা করিয়াছিল, তাহাই আজ বিশ্বভারতী রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিশ্বভারতী বিশ্বমানবের জ্ঞান-সাধনা ও জ্ঞান-বিনিময়ের তীর্থক্ষেত্র। এইজন্য যখন বিদেশী শিক্ষা ও শিক্ষায়তন বর্জন করিবার হুজুগ দেশের বুকে মাতামাতি করিতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার সমর্থন না করাতে পরম নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু সত্য-সন্ধ কবি কখনো নিন্দা বা গ্লানির ভয়ে নিজের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। আবার এই কবিই স্বদেশের লোককে বিদেশী ধরণের শিক্ষাকে প্রকৃত স্বদেশী ধরণে পরিণত করিতে

বলিয়া এবং 'শিক্ষার বাহন' মাতৃভাষাই হওয়া উচিত বলাতে দেশের লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কবি কখনো গতানুগতিক হইয়া সাময়িক উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে বহুবার লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে এইখানেই কবির পরম গৌরব ও মহত্ত্ব নিহিত আছে।

পরের পরাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা ঐ মহৎ নামের যোগ্য নয় এ কথা তিনি রূপকের মধ্য দিয়া 'কাঙালিনী' নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 'জীবন-স্মৃতিতে'ও তিনি লিখিয়াছেন—

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে,
হেরো ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে—

এ তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই?

তাই কবি নিজের প্রিয়তম পিতৃভূমি ভারতের জন্য আদর্শ স্বাধীনতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস-শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত!

কবির স্বদেশপ্রেম এমনই অসাধারণ, এমনই স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধীয় কবিতাবলী সুভাষিত সমুদ্র-বিশেষ। সেই

রত্নাকর হইতে কয়েকটি মাত্র মণি উদ্ধার করিয়া আমি উপস্থিত করিলাম; কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি দেখাই এই সমস্যায় পড়িয়া আমি নিপুণ মণিকারের মতন সুবিন্যস্ত মালা গাঁথিয়া এই রত্নাবলী উপস্থিত করিতে পারিলাম না; ইহার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। উপসংহারে কবিকণ্ঠের উদাত্ত বাণীর সঙ্গে আমার শ্রদ্ধাকুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া প্রার্থনা করি—

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান্‌।
বাংলার ঘর বাংলার হাট,
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান্‌।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান্‌।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যতো ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান্‌।

মিস্‌টিসিজম্‌

বিশ্ব, প্রকৃতি, মহামানব, যুগধর্ম ইত্যাদি সৃষ্টির রূপবৈচিত্র্যের সহিত সাধারণ মানুষের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কবির নয়। কবি তাহাদের সহিত নব নব রস-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন। সাধারণ লোক আপন আপন জীবনে কবির রচিত সম্বন্ধ অনুসরণ করেন না। কিন্তু কবি, সাধক দ্রষ্টাগণ যুগে যুগে জগৎস্রষ্টার সঙ্গে যে গভীর রস-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন, লোকে তাহাকে রসধর্ম বলিয়া মানিয়া লয়। কবিরা যে বলিয়া গিয়াছেন—ভগবান জ্ঞান ধ্যান তপস্যা ত্যাগ বৈরাগ্য ইত্যাদির দ্বারা

অধিগম্য ও নৈয়ায়িক যুক্তির দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদ্য, সে তত্ত্ব জনসাধারণ অনুসরণ করিতে পারে না। সাধক কবিরা যে ভগবানের সহিত অন্তরঙ্গ রস-সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, তাহাই মহামানবের জীবনধর্ম হইয়া উঠিয়াছে। রস-ময়ের সহিত এই রস-সম্বন্ধ বন্ধনের নামই মিস্‌টিসিজম্।

নদী যেমন দুই কূলে শ্যাম সমারোহ পরিবেশন করিয়া সর্ব কর্ম সমাধা করিয়া তাহার অন্তহীন ধারা সিন্ধুর চরণে জলাঞ্জলি দান করে, রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মাধুর্য-ধারা তেমনি মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া অনন্তের সহিত মিলিত হইয়াছে।—

মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু
মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্যকাজে, তার সর্ব কর্ম সারি'
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।

তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার উপান্ত সিন্ধুরই মত অনন্ত অরূপ বিরাট। কবি তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান উৎসর্গ করিবার জন্য যৌবনেই দেবতা খুঁজিয়াছেন—

তবু ওগো দেবী, নিশিদিন করি পরাণপণ
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধনার ধন
ব্যর্থ সাধনখানি!

মানুষকে দেবতা করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। কবি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' জীবনদেবতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি তৃপ্তি লাভ করেন নাই। তাহার পরে কবি ভগবানকে নানা ভাবে নানা রূপে আহ্বান করিয়া মনের বেদীতে বসাইয়াছেন—অপরূপকে রূপ না দিলে, নির্গুণকে গুণময় করিয়া না তুলিলে, অব্যক্তে ব্যক্তিত্ব আরোপ না করিলে যে সকল মাধুর্যই নিষ্ফল হইবে

তাহা 'নৈবেদ্য' রচনার সময়ে তিনি বুঝিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভগবানের সম্মুখে জোড়করে দাঁড়াইলেন—

করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে।

এবং বলিলেন—

মহারাজ ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে।

কবি ভগবানকে রাজা, রাজার দুলাল, প্রভু ইত্যাদি রূপে কল্পনা করিয়াছেন 'খেয়া'য়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাধুর্যের দ্বন্দ্ব তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহার পরে কবি ভগবানকে অন্তরতর করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন,—তখন তাঁহাকে তিনি অতিথি, সখা, বর, দয়িত ইত্যাদি মাধুর্যময় রূপে কল্পনা করিয়া ক্রমে অন্তরের আত্মীয় করিয়া লইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—এ বিশ্বে যাহা কিছু মোহন, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু প্রিয় সমস্তের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

মানবকে দেবতার পদে বসাইয়া একদিন কবির তৃপ্তি হয় নাই, পরে মহামানবকে ভালবাসিতে পারিয়া তাহার মধ্যেই তিনি মহাদেবকে দেখিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার আকুল অতৃপ্তির অন্ত হয় নাই।

এই অতৃপ্তির দ্বারাই পরিমিত হয় রবীন্দ্র-প্রেমের আকুতি ও গভীরতা। কবির চিত্তে রসময়ের সহিত মিলনাগ্রহের অন্ত নাই। তাহা ছাড়া, যে কবির চিত্তে শত সহস্র ইন্দ্রিয় উন্মুক্ত সেই কবিচিত্তের বিপুলতারও সীমা নাই। মাধুর্যের যে অনুভূতি কবির অন্যান্য রচনায় গভীর ভাবেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি যে গভীরতম ও নিবিড়তম হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

তবু ভারতবর্ষের পক্ষে এটুকু যথেষ্ট নহে। এ দেশ মিস্‌টিক দরদী ও সাধক কবির দেশ—ভগবৎ প্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন এদেশে যথেষ্ট। তাই দেখি কয়েকটি কারণে রবীন্দ্রনাথের রসধর্ম চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই, জাতিরও জীবনধর্ম হইয়া উঠে নাই। যে কয়েকটি কারণে রবীন্দ্রনাথের রসধর্ম চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই, এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল :—

১। ভক্ত প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ যখনই প্রেমে আত্মহারা হইতে চাহিয়াছেন, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তখনই ছন্দের সুসঙ্গতির বল্গার দ্বারা তাঁহাকে শাসন করিয়াছেন।

২। রবীন্দ্রনাথ অন্য কাহারো আরাধ্য ব্যক্তিত্ব গ্রহণ না করিয়া আপনার আরাধ্য ব্যক্তিত্ব রচনা করিয়া লইয়াছেন। সে ব্যক্তিত্ব কোনো বিশিষ্ট অবিচল বিগ্রহরূপ ধারণ করে নাই—ক্রমাগতই সে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটিয়াছে কবির অতৃপ্তির ফলে।

৩। ভারতবর্ষের সাধক কবিরা কেবল রচনায় নয়, জীবনের সর্ববিভাগেই সাধক—তাঁহাদের 'সকল বাক্য সকল কর্ম প্রকাশে তাঁর আরাধনা'। ভাবমগ্ন অবস্থার সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের সর্বাবস্থারই সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তাহা নাই। এইজন্যই সাধকদিগের রচনার গভীর আন্তরিকতা রবীন্দ্র-রচনায় পাওয়া যায় না।

৪। যুগে যুগে ভগবানের যে মানস-প্রতীকগুলি রসমূর্তি হইয়া দেশবাসীর প্রেম আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, রবীন্দ্রনাথ সে সকল প্রতীক গ্রহণ না করিয়া স্বরচিত প্রতীকের সহিত প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। সেইজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রেম মধুর রসের সাধক চণ্ডীদাসাদি কবির, অথবা বাৎসল্য রসের সাধক রামপ্রসাদাদির প্রেমের আকুতি ও আকুলতা লাভ করে নাই।

যাঁহারা ভারতবর্ষীয় রসশাস্ত্রের তেমন সন্ধান রাখেন না, তাঁহারা অনেকে মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের রসধর্মে ইউরোপীয় Scholastic Philosophers, Christian Saints (যথা—St. Augustine, St. Francis of Assissi) ও Psalmists ইত্যাদির প্রভাব আছে। ভগবানে রসধর্ম প্রভুধর্ম আরোপ করিয়া দাস্যভাবের সাধনার সূত্রানুসন্ধানে ইউরোপে যাইবার প্রয়োজন নাই,—কবি শান্ত-রসের দাস্যসাধনার বাণী এ দেশের রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতেই পাইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে বেদান্তের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়ার জন্য কবির রসধর্মের পরিপুষ্টিতে বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের সহিত উপনিষদ ও গীতা ছিল, সেজন্য তিনি যে রসময়—রসো বৈ সঃ—তাহা কবি যৌবনেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কবির 'নৈবেদ্যে'র বাণী শান্তরসের সাধক সনক সনাতনের এবং দাস্য-রসের সাধক অক্রূর উদ্ধব বিদুরের জীবন হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব মিস্টিকদের প্রভাব কবির কাব্যে খুব সুস্পষ্ট নহে,—সহজিয়া তন্ত্র, পরকীয়াবাদ, অথবা শক্তিসাধনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের রসধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বহিরঙ্গসর্বস্ব অনুকৃতি মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের রসধর্মে বাউল সাধকদের প্রভাব যথেষ্ট আছে। ভাব-তন্ময় কবি অনেক সময়ে তুড়ি দিয়া বিশ্বসংসারকে উড়াইয়া দিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়িয়াছে দরদিয়া ও মরমিয়া দলের। বাংলার শ্রীগৌরাঙ্গ কবির জীবনে যাহা করিতে পারেন নাই, উত্তর ভারতের নানক কবীর দাদূ সুরদাস তাহা করিয়াছেন। কবি যে শ্রীভগবান আর ভক্তের মধ্যে আর কোনো প্রতীক স্বীকার করেন নাই,—প্রত্যক্ষ ও অপরতন্ত্র ভাবে ভগবানের সঙ্গে ভক্তির মিলন-মাধুর্য উপভোগ করিতে পারিয়াছেন,—তাহা কেবল ঐ সকল মহাপুরুষদের বাণীর প্রভাবে। চিরপ্রচলিত যুগযুগারাধিত রসমূর্তিগুলিকে পরিহার করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক প্রভাব এড়াইয়া—রসময়ের সহিত মিলন-লীলার অভিনয় নানক কবীর প্রভৃতি সাধক কবিদের বাণীতে এদেশে প্রথম পরিস্ফুট হয়। হয়তো সন্থ মুসলমানাক্রান্ত ভারতবর্ষে এই রস-ধর্মের প্রয়োজন হইয়াছিল, হয়তো সুফিরসধর্ম তাঁহাদের বাণীতে ওতঃপ্রোত। যেজন্যই হোক, ভারতে নূতন রসধর্মের উদয় হইয়াছিল। সেই রসধর্ম রবীন্দ্র-কাব্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মিস্‌টিসিজ্‌মের সূত্র অনুসন্ধান করিতে হইলে পাঠান যুগের উত্তর ভারতেই করিতে হইবে।

যোগাযোগ

এই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকাটি না জানিলে ইহার মধ্যে যে-সব সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে, এবং সেগুলি মীমাংসার দিকে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহা বোঝা যাইবে না। তাই আমরা সংক্ষেপে গল্পের প্লটটি বলিতে বলিতে প্রসঙ্গত সমস্যা, মীমাংসা ও চরিত্রগুলির বিশেষত্ব আলোচনা করিয়া যাইব। আমার এই আলোচনা সমালোচনা নয়, কবিগুরুর অসংখ্য শ্রদ্ধান্বিত পাঠকের মধ্যে একজনের মনে এই উপন্যাসখানি কেমন লাগিয়াছে তাহারই পরিচয়।

এক গ্রামে দুই জমিদারের বাস ছিল, ঘোষাল-বংশ আর চাটুজ্জে বংশ। উভয় বংশে রেষারেষি ছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা লইয়া। 'ঘোষালেরা স্পর্ধা ক'রে চাটুজ্জেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়েছিল'। ঘোষালেরা রাতারাতি বিসর্জনের রাস্তা জুড়িয়া তুলিল এক তোরণ, তাহাতে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা গেল না। তাহার ফলে দু-পক্ষের অনেক লোকের মাথা ভাঙিল। কাজেই মামলা-মোকদ্দমা হইতে হইতে উভয় পক্ষই জেরবার হইয়া গেল, বিশেষ

করিয়া ঘোষালেরা। শেষকালে তাহাদের বংশমর্যাদা উচ্চ নয় বলিয়া তাহাদের সমাজেও হেয় করা হইল। তখন ঘোষালেরা সর্বস্বান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গেল। সেই ঘোষাল-বংশের আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়ত-দারদের মুহুরী হইল। তাহার ছেলে মধুসূদন ছেলেবেলা হইতেই আড়তে মানুষ হইয়া ব্যবসার হাটহদ্দ জানিয়া লইল, আর লেখাপড়া ছাড়িয়া ব্যবসায়ে ঢুকিয়া ক্রমে মহারাজ হইয়া উঠিল। মধুসূদন ছেলেবেলা হইতে হিসাবে দক্ষ, দৃঢ়স্বভাব, এক কথার মানুষ, যাহা ধরে বা বলে তাহা করে। সে অর্থসঞ্চয়ে এমন মন দিল যে তাহার মা পুত্রবধূর মুখদর্শনের আশা ত্যাগ করিয়াই পরলোকে প্রস্থান করিলেন। যখন মধুসূদন কারবার খুব ফলাও করিয়া তুলিয়া রাজা মহারাজা খেতাব পাইয়া সমাজে লোকমান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন সে বলিল—এইবার বিবাহের ফুরসৎ হইয়াছে।

নানা জায়গা হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। মধুসূদন চোখ পাকাইয়া বলিল—ঐ চাটুজ্জেদের মেয়ে চাই। মধুসূদন তাহার পূর্বপুরুষের লাঞ্ছনার কথা এক দিনও ভোলে নাই। যাহারা তাহাদের কুলের খোঁটা দিয়া দেশছাড়া করিয়াছিল, চাই তাহাদেরই ঘরের মেয়ে। মধুসূদন পণ করিয়াছিল—টাকার জোরে সে চাটুজ্জেদের কুলগর্ব খর্ব করিয়া ছাড়িবে।

নুরনগরের চাটুজ্জেদের অবস্থাও এখন ভাল নয়, তাহাদের জমিদারী দেনায় জড়াইয়াছে। তাহাদের পরিবারের মধ্যেও ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। এক ভাগে আছে দুই ভাই—বিপ্রদাস আর সুবোধ, আর পাঁচ বোন। চার বোনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—তাহাদের বাপ মা বাঁচিয়া থাকিতেই তাঁহারা অনেক পণ দিয়া মেয়েদের বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। ছোট বোন কুমুদিনীর বিবাহ হইবার আগেই তাহার বাবার অসচ্চরিত্রতার জন্য তাহার মা রাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান। সেই শোকে কুমুদিনীর বাবা অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান, এবং তাহার অল্পদিন পরে তাহার মাও স্বামীর সহগমন করেন; তখন তাহার রক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে তাহার বড়দাদা বিপ্রদাসের উপর। বিপ্রদাস বোনকে লেখাপড়া গান-বাজনা বন্দুক-ছোঁড়া প্রভৃতি বহুবিষয়ে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলেন। কুমুদিনীর বয়স হইয়াছে উনিশ। এখন তাহার বিবাহ দিতে হইবে। অথচ চাটুজ্জে-বংশের মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত পণের টাকার সঙ্গতি তখন বিপ্রদাসের নাই। এই সময় হঠাৎ বিপ্রদাসের এক মাড়োয়ারী মহাজন বিপ্রদাসকে টাকার তাগাদা দিয়া বসিল, এবং সেই সময়েই একজন বন্ধু অনেক দিন পরে হঠাৎ আসিয়া বিপ্রদাসকে পরামর্শ

দিল্ল যে মহারাজ মধুসূদনের কাছ হইতে এক থোকে এগার লক্ষ টাকা ধার লইয়া তিনি তাহার সব খুচরা দেনা মিটাইয়া ফেলুন। বিপ্রদাস তাহাই করিলেন।

ছোট ভাই সুবোধ বলিল—এখন উপার্জনের পথ দেখিতে হইবে, সে বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে। সে গেল বিলাত।

মাড়োয়ারীর তাগাদা আর বিপ্রদাসের বন্ধুর অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়ত কৌশলী মধুসূদনের কৌটিল্যনীতিরই ফল।

কুমুদিনীর বিবাহের পণ জোটানো ও পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা করিতেই তাহার দাদা বিপ্রদাসের আতঙ্ক হয়। তাই কুমুদিনী নিজের জন্ম নিজে সঙ্কুচিত। তাহার বিশ্বাস সে অপয়া। সে মনে মনে কেবল ভাবে—'কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাত রাজার ধন মাণিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হ'য়ে থাকব।'

কুমুদিনী 'বংশের দুর্গতির জন্যে নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালবাসা দেয়,—কঠিন দুঃখে নেঙড়ানো ওর ভালবাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্তব্য করতে পারছে না ব'লে ওর ভাইরাও বড় ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে।'

বিপ্রদাস সাবেক চাল বজায় রাখা কঠিন দেখিয়া কুমুদিনীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। দেশ ছাড়িয়া কুমুদিনীর মন খাঁ খাঁ করে। বিপ্রদাস বেশি করিয়া বোনকে সাহিত্য এসরাজ বন্দুক-ছোঁড়া শেখান, একসঙ্গে দাবা খেলেন। এখানে আসিয়া ভাই-বোন পরস্পরের সঙ্গী হইল। কিন্তু কুমুদিনীর মনটা জন্ম-একলা। বিপ্রদাসও নানা চিন্তায় গম্ভীর প্রশান্ত।

কুমুদিনী 'দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক একেবারে নিবিড় কালো, আর একটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরী। রঙ শাঁখের মতন চিকণ গৌর; নিটোল দু-খানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান,—কৃতজ্ঞ হ'য়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি সকরুণ ধৈর্যের ভাব। এক রকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি। কুমুদিনী ঘরে লেখাপড়া করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরানো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস।'

তাহার দাদা তাহাকে দেখিয়া ভাবেন—'ও যে চাঁদের আলোর টুকরো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর ক'রে রেখেছে।'

আর 'বিপ্রদাসের দেবতার মত রূপ, বীরের মত তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। তাঁর মুখে সেই বিষাদ তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া, ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা। তখনকার কালে শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভজ্‌ম্ তাঁর ধর্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা তাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই তাঁর জীবন পূর্ণ ক'রে আবির্ভূত ছিলেন।' অতি ক্রোধের সময়েও তাঁহার শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না।

বিপ্রদাসের ভাই সুবোধ বিলাত গিয়া অপব্যয় করিতেছে, আর ক্রমাগত দাদার কাছে টাকা চাহিয়া পাঠাইতেছে। বিপ্রদাস ভাইয়ের অবিবেচনায় বিব্রত ও ব্যথিত হন, কিন্তু কষ্ট করিয়া টাকা পাঠান। একবার সুবোধ একথোকে দেড়-শ পাউণ্ড্ চাহিয়া পাঠাইল। দাদাকে চিন্তিত দেখিয়া কুমুদিনী ব্যাপার জানিতে পারিল, এবং তাহার মায়ের গহনা বেচিয়া ছোট দাদাকে টাকা পাঠাইতে সে অনুরোধ করিল। কিন্তু ঐ সকল গহনা বিপ্রদাস কুমুদিনীর বিবাহের জন্য সম্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই বিপ্রদাস, টাকা পাঠাইতে পারিবেন না লিখিলেন। ইহাতে সুবোধ লিখিল—তাহার অংশের জমিদারী বিক্রয় করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতে। সুবোধের এই প্রস্তাব বিপ্রদাস আর কুমুদিনীর বুকে বাজিল। বিপ্রদাস নিজের তালুক পত্তনী দিয়া টাকা পাঠাইলেন।

এমন সময় আসিল মধুসূদনের ঘটক। বিপ্রদাস বেশি বয়সী পাত্রে বোন সম্প্রদান করিতে নারাজ হইলেন। কুমুদিনী ভাবে তাহার দিদিদের কথা। তাহারা তো তাহাদের স্বামী বাছিয়া লয় নাই, মানিয়া লইয়াছে,—যেমন করিয়া মা মানিয়া লয় ছেলেকে। কুমুদিনী ভাবে সতীসাধ্বীদের কথা, যাহারা নির্বিচারে স্বামীর সব আচরণ সহ্য করে। সে কদিন ভাবিয়া ভাবিয়া অচেনা অদেখা মধুসূদনকেই পতিত্বে বরণ করিয়া ফেলিল। সে দেবতার কাছে সঙ্কেত মানত করিয়া মনে করিল সে দৈবসঙ্কেতে তাহার মনোনয়নের সমর্থনই পাইয়াছে। তাহার দাদা তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে সে জোর দিয়া বলিল—সে মধুসূদনকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।

সম্বন্ধ অগত্যা পাকা হইল। কুমুদিনী খুশি। তাহার অন্তরে বাহিরে যেন একটা নূতন প্রাণের রঙ্ লাগিল।

অন্যদিকে মধুসূদন মহাসমারোহে নিজের লোকজন দিয়া এক মধুপুরী নির্মাণ করাইয়া ঐশ্বর্যের রাজসিক আড়ম্বরে চাটুজ্জেদের উপর টেক্কা দিতে লাগিয়া গেল।

সে যতই বিপ্রদাসকে খাটো করিয়া নিজের বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কুমুদিনীর ততই কষ্ট হইতে লাগিল। চাটুজ্জেরা যখন মধুসূদনের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তখন তাহারা মধুসূদনের বংশমর্যাদার হীনতা লইয়া তাহাকে খোঁটা দিতে লাগিল। তবু কি পরাজয়ের গ্লানি মিটিতে চায়?

মধুসূদনের জাতকুলের কথাটাকে কুমুদিনী তাহার ভক্তি দিয়া চাপা দিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের ধনের বড়াই করিয়া শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখিয়া তাহার মন বিষাদে ভরিয়া উঠিল। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যেন উহারই সব চেয়ে বেশি লজ্জা।

এমনি সময়ে একদিন কুমুদিনী দাদার সামনে আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। বিপ্রদাস বলিলেন— 'কুমুদিনীর মনে যদি কোনও খট্‌কা থাকে তবে তিনি বিয়ে এখনও ভেঙে দিতে পারেন।' কুমুদিনী বলিল—'ছি ছি সে কি হয়!' এখন থেকে কুমুদিনী মনে মনে জোরের সঙ্গে জপিতে লাগিল,—তিনি ভালই হোন, মন্দই হোন তিনি আমার পরম গতি।

কিন্তু মধুসূদনের ব্যবহার ক্রমশই অভদ্র উদ্ধত হইয়া উঠিতে লাগিল। কুমুদিনীর ভাবে আর বাস্তবে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বাল্যকালে যখন সে পতি-কামনায় শিবের পূজা করিয়াছে, তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী শিবকেই দেখিয়াছে। সাধ্বী নারীর আদর্শ রূপে সে আপন মাকেই জানিত—কি স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য; যদিও তাঁহার স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি ছিল, চরিত্রের স্খলন ছিল। দময়ন্তীর মত তাহারও মনের মধ্যে কি নিশ্চিত বার্তা আসিয়া পৌঁছে নাই যে মধুসূদনকেই তাহার বরণ করিতে হইবে? বরণের আয়োজন সব প্রস্তুতই ছিল, রাজাও আসিলেন কিন্তু মনের মানুষের সঙ্গে বাহিরের মানুষের মিল হইল কই? রূপেতেও বাধে না, বয়সেও বাধে না, কিন্তু সত্যকার রাজা কোথায়?

বিবাহ হইয়া গেল। কুমুদিনী শুভদৃষ্টির সময় ভাল করিয়া বরের দিকে চাহিতেই পারিল না। মধুসূদনের ব্যবহারে তাহার কেমন ভয় ধরিয়া গিয়াছে।

মধুসূদন দেখিতে কুশ্রী নয়, কিন্তু বড় কঠিন। কালো মুখের মধ্যে মস্ত বড় বাঁকা নাক। প্রশস্ত কপাল, ঘন ভ্রূ। গোঁপদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী, কড়া চুল কাফ্রিদের মত কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁষিয়া ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরিয়াছে। বেঁটে, মাথায়

প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটা রোমশ, দেহের তুলনায় খাটো। সবশুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট, মাথা হইতে পা পর্যন্ত সর্বত্রই কি একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকাইয়া আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া একাগ্রভাবে চলিয়াছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখিলেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দিবার উহার একটুও অবকাশ নাই। মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকরদাসীরা অভিভূত হইবে এমনতর বেশ—ডোরাকাটা বিলিতি শার্টের উপর একটা রঙীন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েষ্ট-কোট, কাঁধের উপর পাটকরা চাদর, যত্নে কোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্নিশ করা কালো দরবারী জুতো, বড় বড় হীরে পান্নাওয়ালা আঙটিতে আঙুল ঝলমল করিতেছে। হাতে একটি সৌখীন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতীর মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত।

প্রথম মিলনেই বরবধূর বিচ্ছেদ সুরু হইল। ফুলশয্যার রাত্রে কুমুদিনী লজ্জাকম্পিত কণ্ঠে স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানাইল তাহার দাদার অসুখ, আর দুটো দিন সে বাপের বাড়ী থাকিয়া যাইতে চায়। তাহার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হইল। কলিকাতায় নামিয়াই এক গাড়ীতে যাইতে যাইতে মধুসূদন দেখিল কুমুদিনীর হাতে একটা নীলার আঙটি। অমনি সে হুকুম করিল, এ আঙটি তাহার আর পরা চলিবে না। মধুসূদন কেবল কুমুদিনীর আঙটি খুলাইয়াই নিরস্ত হইল না, তাহার দাদার দেওয়া আঙটিটাকেও সে কাড়িয়া লইল।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে কেবলই হুকুম শোনে, প্রীতির পরিচয় পায় না। আর সে ভাবে—যেমন ক'রে অভিসারে বেরোয় তেমনি ক'রেই বেরিয়েছি, অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার বলেই মনে হয় নি। আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কি দেখলুম, বাইরেই বা কি দেখ্ছি? এখন বছরের পর বছর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটবে কি ক'রে? এতদিন কুমুদিনী স্বামীর বয়স বা রূপ লইয়া কোনও চিন্তাই করে নাই। সাধারণত যে ভালবাসা লইয়া স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যাহার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলিয়া আছে, তাহার যে প্রয়োজন আছে একথা কুমুদিনী ভাবেও নাই। এখন সে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিতেছে না তাহা মনে হইতেছে মহাপাপ, কিন্তু সে পাপেও তাহার তেমন ভয় হইতেছে না, যেমন হইতেছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করিয়া।

মধুসূদনের বাড়ির মেয়েদের কাছ হইতেও কুমুদিনী বিশেষ কোনও মমতা

পাইল না, তাহারা সবাই তাহার কেবল সমালোচনাই করে। এই মেয়েলী সমালোচনার বিবরণটি চমৎকার। তাহা আর উদ্ধার করিলাম না। সেই বাড়িতে কেবল মধুসূদনের ছোট ভাই নবীন, আর তাহার স্ত্রী মোতির মা কুমুদিনীর প্রকৃত মর্যাদা বুঝিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা যত্ন করিতে লাগিল।

মোতির মা কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারে না যে স্ত্রী হইয়া স্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গ করার মধ্যে বাধা কোথায় থাকিতে পারে! সে সেকেলে ধারণার বশীভূতা গৃহস্থ বধূ।

মধুসূদনের পক্ষে কুমু হইল একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রী-জাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষটির অল্পই ছিল। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখিয়াছে ঘরের বউ ঝি-দের মধ্যে। উহার স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাইবে এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হইয়া কর্তাদের কটাক্ষ-চালিত মেয়েলী জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিবে, ইহার বেশি সে কিছুই ভাবে নাই। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করিবারও যে একটা কলা-নৈপুণ্য আছে, তাহার মধ্যেও যে একটা পাওয়ার বা হারাইবার কঠিন সমস্যা থাকিতে পারে, এ কথা তাহার হিসাব-দক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের কোনো কোণে স্থান পায় নাই; মধুসূদন তাহার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুদিনীকে এক-রকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে লাগিল। স্বামীগিরির সেকেলে ধারণাই সে মনে মনে পুষিয়া আসিয়াছে, আর তাহার উপরে আবার সে সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া অভ্যস্ত,—সে স্বামী, সকলের উপরে,—এ বোধ তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে। তাই সে ভাবিল—আমিই যে উহার একমাত্র, একথাটা যত শীঘ্র হউক কুমুদিনীকে জানান দেওয়া চাই।

স্বামীর ব্যবহারে কুমুদিনীর যে পরিমাণ কষ্ট না হইতেছিল, তাহার চেয়ে বেশি কষ্ট বোধ হইতেছিল তাহার নিজের কাছে নিজের অপমানে। এই কষ্টটা বুঝিতে পারিতেছিল মোতির মা। সে ভাবিল—আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন আমরা ত' কচি খুকী ছিলাম, মন বলিয়া একটা বালাই ছিল না। কিন্তু কুমুদিনী বেশি বয়সে লেখাপড়া শিখিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে। এ মেয়ের পক্ষে অপরিচিত একজন পুরুষকে অকস্মাৎ স্বামী বলিয়া মানিয়া লওয়া বিড়ম্বনা। বড়ঠাকুর এখনও উহার পর। আপন হইতে অনেক সময় লাগে। ধন পাইতে বড়ঠাকুরের কতকাল লাগিল, আর মন পাইতে দু-দিন সবুর সহিবে

না ? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করিয়া মরিতে হইয়াছে। আর এই লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাতিতে হইবে না ?

কুমুদিনী স্বামীর ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া মনে করিল, এ বাড়িতে আমার যদি বধূর অধিকার না-ই থাকে, তবে আমি এ বাড়িতে থাকি কিসের সম্পর্কে ? তাই সে বাড়ির দাসীপনা করিতে নিযুক্ত হইল। সে আলো-বাতি রাখার ময়লা ঘরের এক কোণে নিজের বাসস্থান করিয়া লইল।

মধুসূদন কিন্তু মনে মনে কুমুদিনীর জন্য প্রতীক্ষা করে। রাত্রে উঠিয়া চুপি চুপি যায় কুমুদিনীব ঘরে, সে কি করিতেছে দেখিতে। একদিন সে দেখিল কুমুদিনী দিব্য নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। মধুসূদনের মনে হইল যে তাহার যেমন ঘুম নাই, কুমুদিনীরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল। কুমুদিনীর মুখে লণ্ঠনের আলো পড়িতেই সে একটু নড়িল। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখিয়া চোর যেমন করিয়া পালায়, মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালাইল। তাহার ভয় হইল, পাছে কুমুদিনী উহার পরাভব দেখিয়া মনে মনে হাসে। মধুসূদন বুঝিতে লাগিল যে তাহার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ ঘটিতেছে। এই রাত্রি দুটার সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি বলিয়া যখন কিছুই নাই, তখন কুমুদিনীর কাছে মনে মনে হার মানা তাহার কাছে অস্বীকৃত রহিল না। কুমুদিনীকে কঠিনভাবে শাসন করার শক্তি মধুসূদন হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহার নিজের তরফে যে অপূর্ণতা তাহাই তাহাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়েকে সে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল চাটুজ্জেদের পরাজিত করিবে বলিয়া। কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাইবে বিধাতা আগে থাকিতেই যাহার কাছে হার মানাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন, ইহা সে মনেও ভাবে নাই। অথচ এখন সে একথা বলিবারও জোর মনে পাইতেছে না যে, তাহার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হইলেই ভাল হইত যাহার উপর তাহার শাসন খাটিত।

একদিন সে কুমুদিনীর সামনে নবীন আর মোতির মাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল,—'কাল থেকে বড়বৌয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করলুম।' মধুসূদন কুমুকে বুঝাইয়া দিল, তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচে হার মানিতেছি।

এইবার আবার কুমুদিনীর পালা আরম্ভ হইল। সে ভাবিতে লাগিল— ইহার বদলে কি আছে তাহার দিবার ? বাহির হইতে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করিবার জোর পাওয়া যায়, তখন দেবতাই হন সহায়।

হঠাৎ সেই বাহিরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হইলে যুদ্ধ থামে, কিন্তু সন্ধি হইতে চায় না।

মধুসূদন যেদিন কুমুদিনীর আঙটি হরণ করিয়াছিল সেদিন উহার সাহস ছিল। সে মনে করিয়াছিল কুমুদিনী সাধারণ মেয়েদের মতন সহজেই শাসনের অধীন হইবে। কিন্তু সে এখন দেখিতেছে কুমুদিনী সহজ মেয়ে মোটেই নয়। এখন মধুসূদনের মনে হইতে লাগিল—কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াইবার একটি মাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই এখন তাহার মন ব্যগ্র।

কুমুদিনী যাহাকে ভালবাসে নাই তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে, হোক না সে তাহার বিবাহের মন্ত্রপড়া স্বামী। কুমু করে বিদ্রোহ, আর দোষ পড়ে মোতির মার ঘাড়ে। কারণ মধুসূদন মনে করে মোতির মা যেহেতু কুমুদিনীকে আদর যত্ন করে, সেই হেতু কুমুদিনীকে বশ মানানো যাইতেছে না। তাহার শাসন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাই সে মোতির মাকে বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দিবার কল্পনা করে, কিন্তু মনের মধ্যে জোর পায় না। সে জানে যে তাহার সংসারে মোতির মার গৃহিণীপনা নিতান্ত অপরিহার্য। অথচ যে-বিবাহিত স্ত্রীর দেহ-মনের উপর তাহার সম্পূর্ণ দাবী, সে তাহার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম হইয়া থাকে, ইহাও তাহার সহ্য হইতেছিল না। মধুসূদনের সকল কাজে শৈথিল্য আর অবহেলা দেখা দিতে লাগিল। সে নিজে এবং অপর সকলে ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে লাগিল।

কুমুদিনী নিরন্তর তাহার অন্তরের ঠাকুরের কাছে কর্তব্য নির্ধারণের নির্দেশ চায়। মধুসূদন যেদিন ভাবিল, আমি নিজের মান খর্ব করিয়া কুমুর মান ভাঙিব, এবং তাহার হাতে ধরিয়া মিনতি করিল, সেইদিন কুমুদিনী পড়িল মুস্কিলে। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা সহ্য করা কুমুদিনীর পক্ষে তত কঠিন নয়। কিন্তু আজ মধুসূদনের এই নম্রতা, এই তাহার নিজেকে খর্ব করা সম্বন্ধে কুমু যে কি করিবে তাহা সে স্থির করিতে পারে না। হৃদয়ের যে দান লইয়া সে আসিয়াছিল তাহা তো স্খলিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গিয়াছে। তথাপি কুমু স্বামীর হুকুম মানে, কিন্তু তাহার আন্তরিক সতীত্ব তাহাকে ধিক্কার দেয়, সে তাহার ঠাকুরের কাছে নালিশ করে তাহার ঠাকুরেরই বিরুদ্ধে। কেন তিনি তাহাকে এই অশুচিতা হইতে বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিতেছেন না? তাহার মনে হইতেছে একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির হইতে তাহাকে যেন

গ্রাস করিতেছে। যে পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ সুগম্ভীর, মধুসূদনের তাহা নহে; যাহা লালায়িত, যাহার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তাহারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। কুমুদিনী এই অশুচিতা হইতে পালাইবার একমাত্র উপায় দেখে শিশু মোতির সংসর্গে। এই শিশু মোতি তাহার জেঠিমাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে।

কুমুদিনী মোতির সাহচর্যে নিজেব অশুচিতা শোধন করিয়া লইতে চায় বলিয়া মধুসূদন বালকটির উপরও রূঢ় ব্যবহার করে, আর তাহার সকল আঘাত গিয়া লাগে কুমুদিনীকে, আর সে হইয়া উঠে আরও আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ। মধুসূদন বুঝিতে পারে না যে, সে যাহা চায় তাহা পাইবার বিরুদ্ধে উহার স্বভাবের মধ্যেই একটা মস্ত বাধা রহিয়াছে।

মধু যখন হুকুম করিয়া কুমুদিনীর প্রেম আদায় করিতে চাহিতেছিল, তখন একদিন কুমুদিনী দেখিল নবীন আর মোতির মার মধ্যে প্রেমলীলা। তাহাদেব সেই প্রেমলীলা কেমন সহজ আর সুশ্রী, আর তাহার পাশে মধুসূদনের ব্যবহার কি বিশ্রী কুৎসিত বীভৎস।

মধুসূদন দেখিয়াছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নাই, আছে একটা দূরত্ব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে খাটো হইয়া থাকে, তাহাতে তাহার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরেও মধুসূদন জোর করিতে পারিতেছে না—আপন সংসারে যেখানে সবচেয়ে তাহার কর্তৃত্ব করিবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সবচেয়ে হটিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই কুমুর প্রতি তাহার রাগের বদলে আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, আর রাগ বাড়িতেছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের উপর। কারণ মধুসূদনের সন্দেহ যে বিপ্রদাসের আদর্শ আর শিক্ষাতেই কুমুদিনী এমন ভাবে গর্বিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার সন্দেহ অমূলকও নহে।

মধুসূদন হিংস্র হইয়া বিপ্রদাসকে পীড়ন করিতে লাগিল। তাহার মনে মনে এই ছিল যে, বিপ্রদাসকে শাস্তি দিলে কুমুদিনীকেও শাস্তি দেওয়া হইবে। বিপ্রদাস শান্তভাবে মধুসূদনের সব কুব্যবহার সহ্য করিতে লাগিলেন। বিপ্রদাস বনেদী ঘরের অভিজাত ভদ্রলোক, তাঁহার কাছে হীনতা কপটতার লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহার চরিত্র ঔদার্যে মহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তাঁহার ছিল নিজেদের ক্ষতি করিয়াও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহঙ্কার প্রচার নহে।

মধুসূদনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা কুমুকে কেবল যে আঘাত করিয়াছে তাহা নহে, উহাকে গভীর লজ্জা দিয়াছে। উহার মনে হইয়াছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তাহার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহ ভাবেই গরীব ছিল, সেই জন্যই পয়সার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করিত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তাহার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বার বার তুলিত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দিবার জন্য। উহার সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহ-মনের ও উহার সংসারের অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছে। স্বামিপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য উহার চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু তাহার যে কত বড় হার হইয়াছে তাহা ইহার আগে এমন করিয়া সে বোঝে নাই।

মধুসূদন যখন কুমুদিনীর সঙ্গে মিলনটাকে সহজ করিয়া তুলিতে কিছুতেই পারিল না, তখন সে মন দিল অন্যদিকে। মধুসূদনের বাড়ীতে তাহার দাদার এক বিধবা বৌ থাকিত, তাহার নাম শ্যামাসুন্দরী। শ্যামা ধনী ঠাকুরপোকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সদাই ব্যগ্র, কায়মনোবাক্যে সে তাহাকে সেবা করিতে প্রস্তুত। মধুসূদন এতদিন তাহাকে আমল দেয় নাই, প্রশ্রয় দেয় নাই। কিন্তু এখন কুমুকে শাস্তি দিবার জন্য মধু তাহার আরম্ভ হইল। শ্যামা কৃতার্থ হইয়া গেল।

এই শ্যামাসুন্দরী পরিণত বয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা—মোটা নহে কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে যেন বেশ একটু ঘোষণা করিতেছে। একখানি সাদা শাড়ীর বেশি গায়ে কাপড় নাই, কিন্তু দেখিয়া মনে হয় সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে আসিয়াছে, কিন্তু এখনও জরা আক্রমণ করে নাই। তাহার ঘন ভ্রূর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ অল্প একটু দেখিয়াই সমস্তটা দেখিয়া লয়। তাহার টস্‌টসে ঠোঁটদুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চাপিয়া রাখিয়াছে। সংসার তাহাকে বেশি কিছু রস দেয় নাই, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী বলিয়াই জানে, সে কৃপণও নহে। কিন্তু তাহার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগিল না বলিয়া নিজের আশ-পাশের উপর তাহার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা। যৌবনের যাদুমন্ত্রে সে মধুসূদনকে বশ করিয়া লইবে, এমন দুরাশা তাহার অনেক দিন হইতেই ছিল। কিন্তু এতদিন মধুসূদনের মন মাঝে মাঝে টলিলেও হার মানে নাই। শ্যামাও মধুর মনের

ঝোঁকটা ধরিতে পারিয়াছিল, কিন্তু কোনোদিন তাহার মনের ভয় ঘুচিতেছিল না। শ্যামাসুন্দরী মনে মনে মধুসূদনকে ভালবাসিয়াছিল। তাই মধুসূদনের বিবাহের পর হইতে সে আর থাকিতে পারিতেছিল না। মধু যদি কুমুকে অন্য সাধারণ মেয়েরই মত অবজ্ঞা করিত, তবেও বা সেটা একরকম সহ্য হইত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখিল যে এতদিন যে-মধু তাহাকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে, সেই এখন কুমুদিনীর মন পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছে; তখন আর সে সহ্য করিতে পারিল না। সে সাহস করিয়া আগাইয়া আসিয়া দেখিল মধুসূদন তাহাকে প্রশ্রয় দিতেছে।

কিন্তু যখন মধু শ্যামার কাছে থাকে তখনও তাহার মনের মধ্যে জাগে কুমুদিনীর কথা। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তাহার অসীম জোর; আর শ্যামা তাহার এত বেশি আয়ত্তের মধ্যে যে তাহার ব্যবহার আছে, কিন্তু মূল্য নাই। তাই ঈর্ষার পীড়নে শ্যামার মনে মনে একটুও শান্তি নাই। সে মধুর পথ আগলাইয়া আগলাইয়া বেড়ায়, তাহার মনে সদাই আশঙ্কা করে কুমু আপন সিংহাসনে ফিরিয়া আসে।

কুমুদিনী যেদিন প্রথম শ্যামাকে দেখিয়াছিল, সেইদিনই তাহার মনে হইয়াছিল শ্যামা আর মধু যেন একই মাটিতে গড়া একই কুমোরের চাকে। যখন শ্যামার আর মধুর আচরণে আর কোনও অপ্রকাশ্যতা থাকিল না, তখন কুমুদিনী তাহার পীড়িত দাদার কাছে চলিয়া গিয়াছে, এবং শ্যামা ও মধুর সম্পর্কের খবর সেখানে তাহাদের কাছে গিয়াও পৌঁছিয়াছে।

শান্ত গম্ভীর বিপ্রদাস শ্যামার আর মধুর আচরণের সংবাদ পাইয়া ক্রোধে উগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি কুমুদিনীকে বলিলেন—'কুমু, অপমান সহ্য হ'য়ে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হ'য়ে তোমার নিজের সম্মান তোমাকে দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে দুঃখ দিতে পারে দিক।' মোতির মা আর নবীন আসিল কুমুদিনীকে লইয়া যাইতে, সে না যাইলে যে তাহার স্বামী ঘরসংসার সব বেদখল হইয়া যাইতে বসিয়াছে! কিন্তু বিপ্রদাস তাঁহার বোনকে ঐ অশুচি বাড়িতে পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন। কুমুদিনীও যাইতে চাহিল না। বিপ্রদাস মোতির মাকেও বলিলেন—'স্ত্রী যদি সে অপমান মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে ক'রে অন্যায় করা হবে, এমনি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে।'

ইহার পর মধুসূদন নিজে আসিল কুমুকে লইয়া যাইতে। সে শ্যামাকে

হুকুম করে, শাসন করে, কিন্তু তাহাকে একদিনও সম্মান করিতে পারে নাই। সে তাহাকে চাকর দিয়া নিজের শুইবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইতেও দ্বিধা করে নাই। কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যেই মধুর মনে জাগিয়াছে কুমুদিনীর দৃপ্ত নারীত্বের অসামান্য মহিমা। তাই সে তাহার কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া নিজে তাহাকে লইতে আসিল। কিন্তু কুমু কিছুতেই যাইতে সম্মত হইল না। তখন সে ক্রোধান্ধ হইয়া কুমুদিনীকে বলিল—'জানো, তোমাকে আমি পুলিশ দিয়ে ঘাড় ধরে নিয়ে যেতে পারি।' এখানেও তাহার সেই প্রভুত্বের ক্ষমতার দম্ভ।

কুমুদিনী স্বামীর সহিত যাইতে অস্বীকার করিয়াছে জানিয়া বিপ্রদাসের পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী কালু বিষম ভীত হইয়া যখন বলিল—'সর্বনাশ!' তখন বিপ্রদাস বলিলেন—'সর্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।'

মধুসূদন মনে করিল নবীন আর মোতির মার কাছে প্রশ্রয় পাইয়াই কুমুদিনী তাহার বিরুদ্ধতা করিতে সাহস করিয়াছে। তাই সে তাহার ছোটভাই আর ভাইয়ের বৌকে তাড়াইবে। তাহারা আসিল কুমুদিনীর কাছ হইতে বিদায় লইতে; সেই সময় মোতির মা দেখিল যে কুমুদিনী গর্ভবতী। তাহারা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

যখন কুমুদিনীর গর্ভ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না, তখন বিপ্রদাস আর মধু দুজনেই শুনিলেন। বিপ্রদাস কুমুদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—'এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?' কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে কি আমাকে যেতে হবে দাদা?' বিপ্রদাস কুমুকে বলিলেন,—'তোকে নিষেধ করবে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার ঘর ছাড়া করব কোন স্পর্ধায়?'

কুমুদিনী বিনা আহ্বানে এবার নিজে যাচিয়া স্বামীর বাড়ি চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে তাহার দাদাকে বলিয়া গেল—'কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন তোমাকে না দেখ্‌তে হয়। সে আমি সইতে পারব না।'

কুমুদিনী আরও বলিল, যেদিন সে সন্তান প্রসব করিয়া মুক্ত হইবে, সেদিন সে স্বাধীন হইয়া তাহার দাদার কাছেই চলিয়া আসিবে। কারণ মানুষের জীবনে এমন কিছু আছে যাহা ছেলের জন্যও খোয়ান যায় না।

কুমুদিনীকে বিদায় দিয়া বিপ্রদাস নিতান্ত একাকী নিঃস্ব অসহায়। আর

কুমু ? কে জানে তাহার ইহার পরে কি ঘটিয়াছিল। লেখক এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

এই উপন্যাসখানির মধ্যে তিনটি প্রধান, আর তিনটি অপ্রধান চরিত্র আঁকা হইয়াছে, আর কয়েকটি আছে আনুষঙ্গিক চরিত্র। সব কয়টিই জীবন্ত মানুষ হইয়াছে। তাহার মধ্যে সবচেয়ে ফুটিয়াছে মধুসূদন, বিপ্রদাস আর কুমুদিনী। নবীন, মোতির মা আর শ্যামাও অল্পের মধ্যে স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। আনুষঙ্গিক চরিত্রের মধ্যে আমাদের মনে ছাপ রাখে হাবলু বা মোতি, আর কালুদাদা।

মধুসূদনের চেহারা ও চরিত্র সম্বন্ধে পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। কুমুদিনীরও পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ইহাদের দুজনের চরিত্রের বৈপরীত্য লেখক অতি চমৎকার করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রতিদিন যে ব্যক্তি হুকুম করিয়া লোককে অবিশ্বাস করিয়া অভ্যস্ত, সেই মধুসূদনের কাছে কুমুর সহজ অথচ অনমনীয় আত্মমর্যাদাবোধ অবোধ্য হইয়া যত বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছে। বিপ্রদাস আর নবীন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অথচ খাঁটি মানুষ। কুমুদিনী তাহার এই দাদার হাতে তৈরী। বিদায়ের দিন সে তাহার দাদাকে বলিয়াছিল—'সমস্ত গিয়েও তবু বাকী থাকে, সেই আমার অফুরানো—সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝ্‌তুম তাহ'লে সেই গারদে ঢুক্‌তুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে একথা আমি বুঝতে পেরেছি।' বিপ্রদাস ঠিক নাস্তিক ছিলেন একথা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার ধর্ম মনুষ্যত্বের ও ন্যায়নিষ্ঠার, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই উপন্যাসে হঠাৎ ধনী আর বনিয়াদী অভিজাত ব্যক্তির চরিত্রের তারতম্য অতি সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে গত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লার ধনীগৃহের ছবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঁকা হইয়াছে।

সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার, গৃহে তাহার স্থান আর মর্যাদা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রভৃতি বহু সমস্যার সমাধান এই উপন্যাসখানির মধ্যে পাওয়া যায়। একদিকে জোর করিয়া শ্রদ্ধা প্রীতি আদায় করিবার চেষ্টা, আর তাহার পাশেই অনায়াসে উৎসারিত শ্রদ্ধাভক্তির চিত্র চমৎকার হইয়াছে।

বিপ্রদাস যেন গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'গোরা'র পরেশবাবুরই প্রতিচ্ছবি —শান্ত সমাহিত অথচ দৃঢ় বলিষ্ঠ প্রকৃতি। তাঁহাকে জানিলেই শ্রদ্ধা করিতে হয়, তাঁহার কাছে মাথা আপনি নত হয়।

এই উপন্যাসের মূল কথাটি হইতেছে যে লোকের হার-জিত বাহির হইতে দেখা যায় না, তাহার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে। জগতে যাঁহারা 'মার্টার', যাঁহারা বাস্তবিক বড়লোক, তাঁহারা কালে কালে অযোগ্যের হাতে মার খাইয়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা সামান্য সাময়িক পশুশক্তিতে বলবান তাহারা ভিতরে ভিতরে যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, বাহিরে তাহাকেই মারে। এইজন্য মধুসূদনের হাতে কুমুদিনীর লাঞ্ছনা, আর বিপ্রদাসের অপমান।

এই বইখানিকে অসমাপ্ত বলিতে হইবে। কুমুদিনী স্বামীর বাড়ি ফিরিয়া যাইবার পর তাহার অভ্যর্থনা সেখানে কিরকম হইয়াছিল, তাহার সন্তান হইবার পর সে কি করিয়াছিল, আর সুবোধ—বিপ্রদাসের ছোট ভাই, কুমুদিনীর ছোট দাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেই বা তাহাদের পরিবারে কি ঘটিল, এই সব খবর লেখক আমাদের দেন নাই। তাহা ছাড়া বইখানির আরম্ভ হইয়াছে কুমুদিনীর পুত্র অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন উপলক্ষ্য করিয়া। তখন তাহার বয়স হইয়াছে বত্রিশ। এই বত্রিশ বৎসরের ছেলে অবিনাশ পিতামাতার মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের জটপাকানো জীবনের জট কতখানি খুলিয়াছে বা আরও পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহারও খবর আমরা কিছু জানিতে পারি নাই। আরম্ভেরও পূর্বে যে আরম্ভ আছে তাহার কথাতেই এই বই সমাপ্ত হইয়াছে, আসল গল্পের উপসংহার বাকী থাকিয়া গিয়াছে। অবিনাশের বত্রিশ বৎসরের ইতিহাস ব্যক্ত হয় নাই। সেই অপ্রকাশিত ইতিহাস জানিবার জন্য মনের মধ্যে একটা আগ্রহ থাকিয়া যায়, আর বইখানিকে অসমাপ্ত মনে হয়।

এই উপন্যাসের বিষয় হইতেছে দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা। সেইজন্য ইহার মধ্যে নরনারীর সম্পর্কের আর অধিকারের অনেক ব্যাপার উপস্থিত করা হইয়াছে, এবং সেগুলির নিপুণ বিশ্লেষণ ও সমাধান করা হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই আমাদের বাঙলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রথম প্রবর্তন করেন, এবং এই কর্মে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা সর্বজনবিদিত।

নরনারীর আকর্ষণ বিকর্ষণের তত্ত্ব সমাধানের জন্য এই উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীকে আনিতে হইয়াছে। সে যেন কুমুদিনীর চরিত্রের পটভূমিকা হইয়া কুমুর চরিত্র আর শুচিতা আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে, এবং মধুসূদনেরও চরিত্রকে স্পষ্টতর করিয়াছে। কিন্তু শ্যামার আচরণ এমন লালসাময় এবং কুশ্রী যে তাহার কথা পড়িতে গেলে মনে জুগুপ্সা উদিত হয়। এইটি অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও মনে হয় এই দৃশ্যটা না থাকিলেই ভাল হইত।

উপন্যাসের আগাগোড়াই ঘাত-প্রতিঘাত আর সংঘাত, কাজেই মন ক্লান্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু লেখকের স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছ অনাবিল হাস্যরস প্রায় সকল কথোপকথনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া উপন্যাসের নীরসতাকে সরস করিয়াছে। স্বার্থ মান অভিমান মর্যাদা সম্মান বৈষয়িকতা অ-বনিবনা আর ভুল বোঝা-বুঝির মধ্যে বালক হাব্‌লু বা মোতির সরল একাগ্র প্রীতি আর ভালবাসা সমস্ত বইখানিকে বিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সর্বোপরি বিরাজ করিতেছে বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বিপ্রদাসের চরিত্র যেন মধুসূদনের সকল কলুষ ও ক্ষুদ্রতা ডুবাইয়া দিয়া সমস্ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথের উপান্ত উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি নিছক উপন্যাস নহে। এইটি কবিবরের শেষের কবিতাও বটে ; এইটি গদ্যপদ্যময় চম্পূ কাব্য। ইহার গদ্যও কবিতার সহধর্মী, এবং ইহার মধ্যে অনেকগুলি কবিতা প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই হিসাবে এই উপন্যাসখানি একটু নূতন ধরণের। ইহার পূর্বে বাংলাতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভানুমতী উপন্যাস' এইরূপ গদ্যপদ্যসমন্বিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আর কোন উপন্যাস এই ধরণের আছে কি না তাহা আমার জানা নাই।

উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রীগুলি বিলাতী-ভাবাপন্ন ধনী বাঙালী সমাজের এক একটি টাইপ, মূর্তিমান অবতার। বই পড়িতে পড়িতে মনে হয়, তাহারা যেন আমাদের চোখে-দেখা চেনা লোক, যেমন ইহার আগে 'গোরা' উপন্যাসে পানুবাবু বরদাসুন্দরী লাবণ্য ললিতা সুচরিতা আমাদের চেনাশোনা লোকেদেরই ছবি বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহারা সবই সজীব, সংসারের মানুষ।

নায়ক হইতেছে অমিত রায়, কিন্তু তাহাদের সমাজের বিলাতী কায়দায় আর অনুকরণের উচ্চারণে সে হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'অমিট্রায়ে'। সে ধনী ব্যারিষ্টারের ছেলে, নিজে ব্যারিষ্টার। সে স্টাইলের ভক্ত, কাজেই নিজেও বেশ স্টাইলিস্ট্, বাক্যবাগীশ, কথার তুব্‌ড়ী। তাহার দুই বোন সিসি আর লিসি—তাহারাও মূর্তিমতী ফ্যাশান। অমিতের কথায় লোকের চমক লাগে, তাহাতে

বুদ্ধির প্রাচুর্য এত বেশি যে মনে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়। সে কবিত্বে আর দার্শনিকত্বে মিলাইয়া যে খিচুড়ি বানায় তাহা যেমন মুখরোচক তেমনি গুরুপাক। সে বহু মেয়ের সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠ রকমেই মিশে, ভাল লাগার আভাস দেয়, কিন্তু কাহাকেও সে ভালবাসিতে পারে না। সেকথা লিলি গাঙ্গুলী একদিন তাহার মুখের উপর স্পষ্টই শুনাইয়া দিয়াছিল, যখন সে লিলিকে একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাইতে উদ্যত হইয়াছিল। সে রবি-ঠাকুরের লেখার বিরোধী, কারণ রবি-ঠাকুর অনেকদিন বাঁচিয়া অন্য কবিদের পথরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। সকল সভা-সমিতিতে কেবল নিছক রবি-ঠাকুরের কবিতা আর বইয়ের আলোচনা হয়, ইহাতে সে আপত্তি উত্থাপন করে। সে তাঁহাকে লেখা থামাইয়া দিয়া অপরকে আসর অধিকার করিবার সুযোগ করিয়া দিতে বলে, আর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে নিবারণ চক্রবর্তী নামক এক অজ্ঞাত অখ্যাত কবিকে অর্থাৎ নিজেরই বেনামদারকে। নিবারণ চক্রবর্তী যে সে নিজে তাহার পরিচয় ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সে স্বীকার কবুল করিয়াছে যে 'ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী।' আর তাহার জীবনের গিল্‌টি যাহার কাছে সম্পূর্ণ ধরা পড়িয়া খসিয়া মুছিয়া গিয়াছিল, সেই তাহার 'বন্যা' বলিয়াছে—'তুমি কি ভাব্‌চ প্রথম দিন থেকেই আমি জান্‌তে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী?' অমিত কিন্তু অসামান্য,—কথায়-বার্তায়, বেশে-ভূষায়, চাল-চলনে, মতে-ধারণায়। সাধারণের মত ধারণা ও আচরণের বিপরীত কিছু করাতেই তাহার মৌলিকত্বের আনন্দ। কেবল যাহাকে সে নিন্দা করে সেই রবি-ঠাকুরেরই কবিতার মতন তাহার কবিতা, সেই সাদৃশ্য থাকাতেই সে বোধ হয় তাহা লুকাইবার জন্য অত কোমর বাঁধিয়া নিন্দা করে।

অমিত গিয়াছে শিলঙ্‌ পাহাড়ে বেড়াইতে। মোটর ধাক্কা লাগিল লাবণ্যলতার মোটরের সঙ্গে। 'গোরা' উপন্যাসে যেমন গাড়ীর অপঘাতে বিনয়ের সহিত পরেশ বাবু আর সুচরিতার পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, এখানেও তেমনি মোটর-সংঘাতে অমিতের সঙ্গে ঘটিল পরিচয় লাবণ্যলতার,—যে শীঘ্রই অমিতের কাছে হইয়া উঠিল 'বন্যা', আর অমিতও তাহার কাছে হইয়া গেল 'মিতা'। মোটর-সংঘাতে দুজনেই জখম হইল,—দেহে নহে, মনে; মনোভবের আবির্ভাবে। যে অমিত এতদিন প্রণয় লইয়া কেবল ভাববিলাসিতা করিয়াছে, সেই এখন প্রণয়কে জীবনের জীবন রূপে অনুভব করিল। আর লাবণ্যলতাও স্বীকার করিল 'এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি নিতান্তই শুক্‌নো,—

কেবল বই পড়্‌ব আর পাশ কর্‌ব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখ্‌লাম, আমিও ভালবাস্‌তে পারি।...মনে হয় এত দিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি।'

লাবণ্যের একটু পুরাবৃত্ত আছে। সে ধনী অধ্যাপকের একমাত্র কন্যা। তাহার বাবা তাহাকে এমন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, যাহাতে মনের আর সকল দরজার দিকে তাহার নজর দিবার অবসর হয় নাই। সেই অধ্যাপকেরই ছাত্র ছিল শোভনলাল। বেচারা মুগ্ধকুণ্ঠিত পূজারীর মত সকলের অগোচরে লাবণ্যকে ভালবাসিত, আর যেমন করিয়া একলব্য একান্ত মনে দ্রোণাচার্যের মূর্তিকে গুরুর আসনে বসাইয়া সাধনা করিয়াছিল, তেমনি করিয়া শোভনলাল লাবণ্যর একখানি ছবি আঁকাইয়া তাহাকেই ফুল দিয়া ঢাকিয়া নিজের গোপন হৃদয়ের প্রণয় নিবেদন করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সেই গোপন পূজা ধরা পড়িয়া যায়, লাবণ্য তাহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে দূর করিয়া দেয়। শোভনলাল একটি কথাও না বলিয়া অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া চলিয়া গেল।

বিপত্নীক অধ্যাপক এতদিন কন্যার প্রণয় ও পরিণয় অনাবশ্যক মনে করিয়া তাহাকে গঠন করিয়া আসিয়াছেন, এখন নিজেই এক বিধবার প্রণয়ে পড়িয়া তাহাকে পরিণয়ে নিজের করিবার জন্য একটু উৎসুক হইলেন। অথচ কন্যার বিবাহ না হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন না। লাবণ্য বাবার মনের ভাব টের পাইল এবং নিজে উদ্যোগী হইয়া পিতার বিবাহ দিল। তারপর পিতার সকল সম্পত্তি ও সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়া সে নিজে উপার্জন করিতে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অতঃপর সে হইল বিধবা যোগমায়ার কন্যা সুরমার শিক্ষয়িত্রী। যোগমায়ারও একটি ছোট পুরাবৃত্ত আছে। কিন্তু সেটুকু না জানিলেও আমাদের বইখানির উপাখ্যান বুঝিতে বেশি অসুবিধা হইবে না।

অমিত লাবণ্যের বাসায় গিয়া যোগমায়ার সঙ্গেও পরিচিত হইল, আর সহজেই তাঁহার সঙ্গে মাসি-বোনপো সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁহার স্নেহভাজন হইয়া উঠিল। সে যখন তাঁহার কাছে লাবণ্যের পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল, তখন যোগমায়া তাহাকে বলিলেন—'ধরেই নাও লাবণ্যকে তুমি পেয়েচ। তার পরে হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছা প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝবো লাবণ্যের মত মেয়েকে বিয়ে কর্‌বার তুমি যোগ্য।' অমিত বলিল—'ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না,

বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে ব'লেই অমিত রায় মর্ত্যে অবতীর্ণ।'

যোগমায়ার মনে যে ভয় জাগিয়াছিল অমিতের স্বভাব দেখিয়া, লাবণ্য তাহা জানিয়াও ভয় পায় নাই। সে বলিয়াছিল—'মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়্‌ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেবো না।...' লাবণ্যকে অমিতের ভাল লাগিতেছে, সে তাহার বুদ্ধির আর চিন্তার যেন শাণযন্ত্র হইয়াছে বলিয়া। তাহার বুদ্ধিতে শাণ লাগাইবার জন্যই লাবণ্যকে তাহার প্রয়োজন, আর কিছুর জন্য নয়; ঘরসংসার পাতিয়া বন্দী হইবার মানুষ অমিত নহে। একথা লাবণ্য বুঝিতে পারিয়া অমিতকে বলিয়াছিল—'আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে করো না, যেদিন তাজমহল তৈরী শেষ হল, সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে সাজাহান খুশী হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড় প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।'

লাবণ্য জানে যে অমিত চিরপলাতক। তাই লাবণ্য স্থির করিল তাহারা চাহিবে না বিবাহের বন্ধন। চাহিবে প্রেমের মুক্তি; ইহাদের প্রেম সুখের দাবী করিবে না, প্রিয়ের ইচ্ছাকে মুক্ত রাখিয়া দিতে পারার আনন্দ চাহিবে।

বিবাহের বন্ধনে স্বত্ব-স্বামিত্ব-বোধের স্থূলতায় তাহারা পরস্পরের কাছে অতি-পরিচয়ে তুচ্ছ খেলো হইয়া যাইতে পারে এ ভয় অমিতের মনেও ছিল। সে মনে করিত বিবাহের রাত্রে জীবনে যে বাঁশি বাজে, সংসারে প্রবেশ করিলে সে সুর আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তাই তাহার মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠে—"বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য,—বাঁশির দৈববাণীতে এই সব বার্তার আভাস কোথায়?'—(রবীন্দ্রনাথ, বাঁশি।) যদিও সে লাবণ্যকে বিবাহে সম্মত করিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিয়াছে, তবু তাহার ভবিষ্যৎ সংসারের যে-চিত্র আঁকিয়া সে লাবণ্যকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছে তাহাতে ব্যবস্থা হইবে—একটা বাগানবাড়ির মধ্যে কাটা খালের এপারে ওপারে দুটি বাড়িতে হইবে দুজনার বাস। কেহ কাহারও কাছে বিনা

এস্তালায় হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত হইবে না। তাই অমিত লাবণ্যকে বলিতেছে—'ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টির করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামী জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেন-না, শক্ত ক'রে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড় কম নয়।' তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে তাহাদের শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টিক মনভুলানো অবস্থায়। নতুবা কাহারও কোনো ত্রুটি হঠাৎ চোখে পড়িলে মনের আর্স্টিটিক অনুভবে আঘাত লাগিতে পারে, আর তাহাতে মন বিরূপ হইয়া যাইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়াই বহু বহু শতাব্দী আগে মনু বিধান দিয়া গিয়াছিলেন যে —'ভার্যার সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, ভোজন করিতেছে এমন সময় ভার্যাকে অবলোকন করিবে না। হাঁচিতেছে হাই তুলিতেছে বা যথাসুখে অসংযতভাবে বসিয়া আছে—এমন সময়েও ভার্যাকে দেখিবে না। নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈলম্রক্ষণ করিতেছে,···এমন সময়েও ভার্যাকে অবলোকন করিবে না"—(চতুর্থ অধ্যায়)। এই আশঙ্কাতেই ভিকৃতর হুগো তাঁহার প্রণয়িনীকে নিজের আবাসস্থল হইতে চারি মাইল দূরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। উভয়ের বহু দিনের বিচ্ছেদের পর মাঝে মাঝে কাহারও আহ্বানে কেহ নির্দিষ্ট সময়ে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, পাছে কেহ অপরের অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত হইয়া সৌন্দর্য-পিপাসু মনকে বিরক্ত করিয়া তোলেন এই আশঙ্কায়। এই আশঙ্কা করিয়াই থিয়োফিল গতিয়ের মানস-সৃষ্টি মাদ্‌মোয়াজেল মোপাঁ। তাহার প্রিয়তমকে পাইবার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সন্ধান পাইয়া তাহাকে কেবল মাত্র একটি রাত্রে দেখা দিয়া চিরদিনের জন্য পালাইয়া গিয়াছে, পাছে সে অতি-পরিচয়ে পুরাতন অবহেলিত হইয়া যায়।

এই রকম যখন কবিত্বময় কল্পনায় অমিত তাহার বন্যাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া লইবার নেশায় মশ্‌গুল হইয়া আছে, আর অল্পদিন পরেই তাহাদের বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে, এমন সময় আসিল লাবণ্যলতার কাছে তাহার বহুদিন আগে বিতাড়িত অপমানিত অনুরক্ত ভক্ত শোভনলালের একটি কুণ্ঠিত প্রশ্ন— 'তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কি অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোন্‌বার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাইনে। ভয় কোরো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।'

এর অল্পদিন আগেই লাবণ্যকে অমিত বলিয়াছিল—'হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদওয়ালা। এক সময় সে ক্ষেপেছিল আফ্‌গানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। তারপর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখন কাশ্মীরে, কখন কুমায়ুনে।—প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিট্‌কিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানিনে, কিন্তু…বুঝ্‌তে পারলুম ওর জীবনের কোনখানে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চল্‌তে চল্‌তে ও ক্ষইয়ে দিতে চায়।'

লাবণ্য এখন অমিতকে ভালবাসে, কিন্তু অমিতের সরব আর সাহসী ভালবাসার পরিচয় পাইয়া ভীরু শোভনলালের ভালবাসার মর্যাদা আর ব্যথার মর্ম সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। 'যে অঙ্কুরটা বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়্‌তে দেয়নি, তার সেই কচি বেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার ক'রে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব; বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালবাসাকে দুর্বলতা ব'লে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালবাসা আজ তার শোধ নিলো, অভিমান হ'ল ধূলিসাৎ। সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়্‌ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।'

যখন লাবণ্যের মনের এই অবস্থা,তখন অমিতের অজ্ঞাতবাস ও অজ্ঞাতবাসের কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার বোন সিসি আসিল শিলঙ্‌ পাহাড়ে। কাজে কাজেই তাহার সঙ্গে আসিল তাহার অনুরক্ত নরেন মিটার আর নরেনের বোন ও সিসির সখী কেটি মিটার। যখন কেটি মিটার আর অমিত বিলাতে ছিল তখন একদিন অমিত তাহার হাতে একটি আঙ্‌টি পরাইয়া দিয়াছিল। সে আজ সাত বৎসরের আগেকার কথা। কেটি কিন্তু সেই দিনটিকে আর অমিতকে কিছুতেই ভুলে নাই। সে অমিতের চঞ্চল মনকে চিরবন্দী করিতে

পারে নাই, তাই সে ইহার মধ্যে আর কাহারও মনোরঞ্জন করা যায় কি না তাহা দেখিবার জন্য তাহাদের সমাজের উপযুক্ত মেয়ের নকল হইয়া উঠিবার জন্য সাধনা করিয়াছে, তাহার চালচলন এক 'বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্‌স', তাহার কেশ বেশ সবই এখন 'অনুকরণের উল্লম্ফনশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। তারা তিন জনে মিলে আবিষ্কার করলে অমিতের অজ্ঞাতবাসের কারণ, আর অভিমান ক'রে ক'সে অপমান ক'রে দিলে লাবণ্যকে, আর সেই সঙ্গে যোগমায়াকেও। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে।'

এমন সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল অমিত। সে উহাদের ব্যবহার দেখিয়া বিদ্রোহ করিয়াই লাবণ্যের হাতে আঙ্‌টি পরাইয়া দিল এবং কেটিকে উপেক্ষা করিয়াই নিজের বোনকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য।...এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হ'য়ে গেছে, কল্‌কাতায় অঘ্রাণ মাসে।'

কেটি মুখে হাসি টানিয়া যদিও প্রথমটায় বলিল, 'আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌!' কিন্তু অবশেষে তাহাকে বলিতে হইল—স্বীকার করিতেই হইল যে, 'এই আঙ্‌টি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ্‌ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে!...মনে মনে নিজের উপর অহঙ্কার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহঙ্কার ভাঙ্‌ল...আমারি হার।...বাজিতে যদিই হার্‌লুম, তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্‌ অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বল্‌তে দেবো না।'

'কেটি আংটি খুলে রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ধারে চোখের জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগল।' গভর্ণেস্‌ লাবণ্যর হাত হইতে অভিজাত অমিটকে উদ্ধার করার আশা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

লাবণ্য নিজের হৃদয়ের প্রেমের বেদনা দিয়া কেটির বেদনা বুঝিতে পারিল। লাবণ্য আস্তে আস্তে অমিতকে বলিল, 'একদিন একজনকে যে আঙ্‌টি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে আঙ্‌টি খোলালে কেন?'

অমিত বলিল, 'সেদিন যাকে আঙ্‌টি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে, তারা দুজনে কি একই মানুষ?

লাবণ্য বলিল, 'তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরী, আর একজন

তোমার অনাদরে গড়া।···মিতা, একদিন যে নিজেকে সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল, তাকে তুমি আপনার ক'রে রাখলে না কেন? যে কারণেই হোক আগে তোমার মুঠো আল্‌গা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদ্‌লে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে ব'লেই দশের মনের মত ক'রে নিজেকে সাজাতে বস্‌ল।···তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ ক'রে বল্‌ছি না, আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়েই বল্‌ছি, আমাকে তুমি আঙ্‌টি দিয়ো না, কোন চিহ্ন রাখ্‌বার কোন দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়্‌বে না।'

'এই ব'লে সে নিজের আঙুল থেকে আঙ্‌টি খুলে অমিতর আঙুলে পরিয়ে দিলে, অমিত কোন বাধা দিলে না।'

অমিত আর লাবণ্য দুজনেই তাহাদের পরস্পরের ভালবাসার আলোকে অপরের ভালবাসার মর্ম সহজে বুঝিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। তাই অমিত কেটির ভালবাসার মান রক্ষা করিতে, আর লাবণ্য শোভনলালের ভালবাসার মান রক্ষা করিতে সঙ্কল্প স্থির করিল। কেটি মিটার অমিতের ভালবাসা ফিরিয়া পাইয়া আবার হইল কেতকী মিত্র। তারপর লাবণ্যের সঙ্গে শোভনলালের, আর কেতকীর সঙ্গে অমিতের বিবাহ হইবে সবাই জানিল। কিন্তু লাবণ্যের আর অমিতের ভালবাসার হ্রাস হইল না, তাহারা তাহাদের প্রণয় দিয়াই তাহাদের পুরাতন প্রণয় খুঁজিয়া ফিরিয়া পাইল।

অমিত আর লাবণ্য যে কেমন করিয়া একসঙ্গে দুজনকে ভালবাসিতে পারে তাহা লইয়া যোগমায়ার ছেলে যতির মনে সন্দেহ উদয় হইলে অমিত তাহাকে বলিয়াছিল—'অক্‌সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হ'লে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্‌সিজেন আর একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বল্‌তে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার,—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না।···যে ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হ'য়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।···একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব

প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে হ'ল দীঘি, সে ঘরে আন্‌বার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।......কেতকী সম্পূর্ণ বোঝেন কিনা বল্‌তে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাবো যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝ্‌তে হবে যে লাবণ্যর কাছে তিনি ধন্য।'

উপন্যাসের উপাখ্যান অত্যল্প। কিন্তু ইহার মধ্যে নর-নারীর হৃদয়ের একটি গভীর সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে এবং আমাদের মনে হয়, তাহার মীমাংসাও করা হইয়াছে। এই বইয়ের ভাষার প্রশংসা অনেকে মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন। বাস্তবিক এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা কোন উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর কথাবার্তায় আর দেখা যায় নাই। কথায় কথায় রূপক আর উপমা, খুঁটিনাটি বর্ণনার কারিগরী আর বাহাদুরী সমস্ত হৃদয় মন দিয়া উপভোগ করিবার জিনিস হইয়াছে। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আর মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রেমতত্ত্বের একটা রহস্য ও তাহার মীমাংসা, একটি বিশেষ সমাজের নরনারীর চরিত্র-চিত্রণ, যুবক-যুবতীদের হাব-ভাব বেশ-ভূষা সম্বন্ধে নিপুণ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, কথায় কথায় হাস্যরসের আভাস পাঠক-পাঠিকাকে অভিভূত, আশ্চর্য ও মুগ্ধ করিয়া তুলে। অমিতের কথা শুনিয়া লাবণ্য হাসিতেছে দেখিয়া অমিত বলিয়াছিল—'হাস্‌ছেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখ্‌তে পারিনে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ। ঐ গ্রহটি কৃষ্ণাচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচ্‌কে না হেসে মর্‌তেও জানে না।' যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠীর খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে তাঁহার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, আর অমিতের বেনামী কথাটা তাঁহারই নিজের কথা—তাঁহার বেলায় সেটি খুব খাটে। নিবারণ চক্রবর্তীর বেনামী স্বয়ং রবি-ঠাকুরই যে সব কবিতা লিখিয়াছেন সেগুলিও তাঁহার আগের কবিতা হইতে আলাদা ধরণের,—বড় গভীর অর্থভরা। এইজন্যই এই বইয়ের নাম রাখা হইয়াছে শেষের কবিতা।

স মা প্ত

নিদর্শনী

ফ

ব